প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীচুনীলাল বসু

মুদ্রক :
শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত
মডার্ন প্রিন্টার্স
১২, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড
কলিকাতা-৬৭

উৎসর্গ

অষ্টাশী বছর বয়েসেও
যাঁর গলায় অপূর্ব হাসির গানের
ঝরণা বহে যায়,
দাদাঠাকুরের অনুজপ্রতিম
কাজী নজরুলের অগ্রজপ্রতিম
সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয়, সুসাহিত্যিক,
সুরসিক, বহু মূল্যবান প্রাচীন তথ্যের ভাণ্ডারী,
পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম-নিবাসী
শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের
করকমলে—

ভূমিকা

যাঁরা 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থ ও 'সঙ্গীতকলাবিদ্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর' পুস্তিকাখানি পড়েছেন তাঁদের কাছে প্রস্তুত গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুসন্ধিৎসার ও পরিশীলিত পরিবেশনের দক্ষতার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। আশঙ্কা হচ্ছে বই দুটি অনেকেই পড়েন নি। তাই অল্প কথায় এ'র পরিচয় দিই।

সৌম্যেন্দ্রবাবু কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ঘরে নানাবিধ শিল্পচর্চা করেন। আলোকচিত্র গ্রহণে এ'র দক্ষতা অসামান্য। সৌম্যেন্দ্রবাবু ঘরপোষা মানুষ নন। ছুটিছাটাতে ইনি বেরিয়ে পড়েন হিমালয়ের টানে। নগাধিরাজ এ'কে বশ করেছেন।

সৌম্যেন্দ্রবাবু সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ইতিহাসের ছাত্র। সে-ইতিহাস কলেজি সিলেবাসের ইতিহাস নয়—সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার, সমাজগতির ও সংস্কৃতি-পরিণতির ইতিহাস। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মৃগয়ায় ইনি কতটা কৃতকার্য হয়েছেন তা বোঝা যাবে এ'র 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' বইটিতে। প্রস্তুত বইটি কবিতা-গানের সংগ্রহ হলেও এতেও তাঁর অধ্যবসায়ের যথেষ্ট নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। দা'ঠাকুর বা শরৎ পণ্ডিতের নাম অনেকেই শুনেছি। কিন্তু তাঁর রচনা আমরা ক জন পড়েছি। তাঁর রচনা কোথায় সংকলিত হয়েছে? কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্মৃত নাম নয়, কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গ-কবিতার স্বাদ ক জন পেয়েছেন? এমনি অনেক অভাব পূরণ করা হয়েছে সৌম্যেন্দ্রবাবুর 'ব্যঙ্গকবিতা ও গানে স্বাদেশিকতা' গ্রন্থে।

বাঙালী স্বদেশপ্রিয় জাত। কালে-অকালে সে-স্বদেশপ্রিয়তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সেটাও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য এবং তার জন্যে বাঙালী কখনো লজ্জাবোধ করে নি। শিক্ষিত বাঙালীর sense of humour আছে। সৌম্যেন্দ্রবাবুর নির্বাচিত কবিতা ও গানগুলি পড়লে শিক্ষিত বাঙালীর এই দুর্লভ গুণের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। নানা কারণে বাঙালীর চিত্তবৃত্তিতে ভালোলাগার (ও ভালোবাসার) ছিট শুকিয়ে এসেছে। সাহিত্য-স্রষ্টা বাঙালীর প্রাণের হাসি

একদা কবিতায় গানে শ্রোতা-পাঠকের মনে আনন্দের ঢেউ তুলত, কাতুকুতুর হাসির উচ্ছ্বাস নয়। সৌম্যেন্দ্রবাবুর এই সংকলনটিকে তাই আমি বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসের এক পরিশিষ্ট পর্ব বলতে পারি।

যে-কোন বইয়ের মূল্য নির্ভর করে পাঠকের ভালোলাগার উপর। আমার বিশ্বাস এই বই বিদগ্ধ পাঠকের ভালো লাগবে।

নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গরচনা অনেক আছে। কিন্তু দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গরচনা খুব বেশি নেই। যা আছে তার মধ্যে কবিতা ও গানের সংখ্যাই সর্বাধিক।

দেশাত্মবোধক আবেগধর্মী সীরিয়াস্ কবিতা ও গানের সঙ্গে বুদ্ধিধর্মী ব্যঙ্গ-কবিতা ও গানের যেহেতু একটা প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে পাঠক বা শ্রোতার মনের ওপরেও তাই তাদের প্রভাবের চেহারা আলাদা। সে-প্রভাব জাগে ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন পথ ধরে।

ব্যঙ্গরচনা আমাদের বোধ বা চৈতন্যের ওপর আঘাত দেয়। সে-আঘাত উপভোগ্য। কারণ তার মধ্যে হাস্যকর উপাদান থাকে। মোহ জড়তা দুর্নীতি দুর্বুদ্ধি অন্যায় অত্যাচার কুসংস্কার—সমাজ বা জাতীয়-জীবন থেকে এ-সব দূর করার ব্যাপারে এই 'উপভোগ্য আঘাত' একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা বা একজন সমাজ-সংস্কারকের উপদেশের চেয়ে কম উপযোগী নয়।

এই ধরনের আঘাত দিয়ে সামাজিক বা জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার শুভচেষ্টায় কবি ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে বহু কবি ও গীতিকার নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। এ'দের অনেকের রচনায় ইংরেজ সরকারের অত্যাচার শোষণ বিভেদনীতি ও অপশাসনের কথাও আছে। কিন্তু সে-সব রচনা আমরা ক্রমশই ভুলে যাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ, এমন কি আরো নিকটের সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ বা নজরুলের মতো কবিদেরও এই ধরনের রচনার ওপর আমাদের বিস্মৃতির টান ধরেছে। এই সেদিনও বেঁচে ছিলেন 'দাদাঠাকুর'—এক অসাধারণ প্রতিভা ও চরিত্রের মানুষ। তাঁর ব্যঙ্গসঙ্গীত এক সময় বাঙালীকে অফুরন্ত আনন্দ দিয়েছিল। অথচ আজ তাঁর সে-সব গানের মাত্র দু-একটি চরণ প্রৌঢ় বা প্রাচীনদের কণ্ঠ থেকে আবিষ্কার করতে হয়। তাঁকে নিয়ে আমরা সিনেমা করেছি, কিন্তু তাঁর অপূর্ব ব্যঙ্গসঙ্গীতগুলির একটি সংকলন আজো প্রকাশিত হয় নি।

অবশ্য এই ধরনের রচনার ওপর আমাদের আকর্ষণ কমে যাওয়ার একটা কারণও আছে। ব্যঙ্গরচনার বিষয় থাকে কোনো একটি যুগের বিশেষ সামাজিক বা রাষ্ট্রিক অবস্থার মধ্যে। যুগ বদলায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের

চেহারাও বদলায়। এই পরিবর্তনের প্রভাবেই এক যুগের বিশেষ কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রিক অবস্থা অথবা ঘটনার কথা পরের যুগে ইতিহাস হয়ে যায়। তখন আগের যুগের এই ধরনের রচনার সাহিত্যিক মূল্য স্বাভাবিক ভাবেই কমে যায়। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে লেখা কবি ঈশ্বর গুপ্তের গানগুলি বা হেমচন্দ্রের 'বাজীমাৎ', 'নেভার্ নেভার্' ইত্যাদি সেকালের উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকবিতাগুলি এই কারণেই একালে আকর্ষণ হারিয়েছে। সামাজিক বা দেশাত্মবোধক যাই হোক-না কেন ব্যঙ্গরচনা বিশেষভাবে যুগনির্ভর সাহিত্য, একান্তভাবেই সাময়িক।

তবু এমন অনেক সার্থক ব্যঙ্গরচনা আছে সেগুলির রসাবেদন সময়-সম্বন্ধী নয়। কোনো বিশেষ যুগের সাময়িক ঘটনার মধ্যে লেখার প্রেরণা থাকলেও আজো সে-সব রচনা নিজগুণে আমাদের আকর্ষণ করতে পারে। ব্যঙ্গকবিতা ও গান লিখে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের আসল কৃতিত্ব ব্যঙ্গবোধকে শিল্পরূপ দেওয়ার চাতুর্যে। হাসি তো অনেক রকমের আছে। ব্যঙ্গের হাসিকেও ঠিক মতো ফুটিয়ে তোলা সহজ কথা নয়। পরিশীলিত ও শাণিত বুদ্ধি, সুমিত শব্দ ব্যবহারের কৌশল, নিরপেক্ষ ও উত্তেজনাহীন মনোভাব এবং সংযমবোধ না থাকলে ব্যঙ্গরচনা বিশুদ্ধ গালাগালিতে পরিণত হতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত হলেন একালের ব্যঙ্গকবিদের গুরু। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ করে হেমচন্দ্র এ-ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। এঁদের সেকালের ব্যঙ্গরচনাগুলি আজো রচনাগুণে আমাদের কাছে কম উপভোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাস্যরসবোধও ছিল সুমার্জিত। তত্ত্বচিন্তার জগতের মানুষ ছিলেন তিনি। তবু হাসির রচনাও কিছু লিখেছেন। বিষয়বস্তু, ছন্দ ও শব্দপ্রয়োগের দিক থেকে সেগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। ব্যঙ্গসৃষ্টির মানসিকতা তাঁর ছিল না। তাই দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গরচনা তাঁর নেই বললেই চলে। তবে রবীন্দ্রনাথের বিলাতগমন উপলক্ষে লেখা তাঁর এই ধরনের একটি কবিতায় পরোক্ষভাবে সুন্দর ব্যঙ্গবোধ প্রকাশ পেয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি লেখকদের এই জাতীয় বেশ কিছু ব্যঙ্গরচনা এখনো আমাদের পড়তে ভালো লাগে। তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল। এ-ক্ষেত্রে একাই এক শ। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঙালী কত দিন মনে রাখবে জানি না, কিন্তু ভুলবে না 'হাসির গান'-এর স্রষ্টাকে। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী থেকে বিশুদ্ধ হাস্য-কৌতুক যেমন বেরিয়েছে,

তেমনি বেরিয়েছে সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। এ-ক্ষেত্রে সে-যুগে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। ব্যঙ্গরচনা তাঁর হাতে নতুন রূপ নিয়েছে—শিল্প হিসাবে আরো সার্থক হয়ে উঠেছে। আপন প্রতিভায় এই ধরনের রচনার আকৃতি-প্রকৃতি তিনি নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন। এ-স্বীকৃতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। অবশ্য ব্যঙ্গসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের কৃতিত্বও অন্যের চেয়ে কম নয়। কিন্তু তাঁর নির্ভেজাল হাসির রচনার তুলনায় ব্যঙ্গরচনার পরিমাণ অনেক কম। কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত কবিস্বভাবে ব্যঙ্গবোধ দানা বাঁধতে পারে নি। তাঁর রচনার শুভ্র হাসির আলোকে স্নান ক'রে পাঠকের মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। তবু যে-কটি ব্যঙ্গরচনা তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছে সেগুলি ব্যঙ্গসাহিত্যের সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বেণোয়ারীলাল গোস্বামী, রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিকও কিছু কিছু দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গকবিতা বা গান রচনা করে গেছেন। রচনাগুণে সেগুলি এখনো পাঠকচিত্তে আবেদন জাগাতে পারে। বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময় লেখা বিজয়চন্দ্রের কয়েকটি সুন্দর ব্যঙ্গকবিতা এবং রজনীকান্তের কয়েকটি অপূর্ব ব্যঙ্গসঙ্গীতে জাতীয়তা-বোধের দিক থেকে এখনো কিছু চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে। বিশ শতকের প্রথম চার দশকে কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও গীতিকারের দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গরচনায় নতুন প্রেরণার পরিচয় ফুটে ওঠে। এঁদের মধ্যে মুকুন্দ দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র ঘটক, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কাজী নজরুল ইসলাম এবং বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় প্যারডি রচনার ব্যাপারেও অনেকের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় এবং অনেকগুলি সুন্দর প্যারডি রচিত হয়। মনে রাখা দরকার বঙ্গভঙ্গের পর থেকে কবি ও গীতিকারদের অন্তরে ব্যঙ্গরচনা সৃষ্টির এক নতুন প্রেরণা জাগে। এ-প্রেরণা আগের চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ এবং বাস্তবধর্মী। এই সময় থেকেই বাঙালী ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ ক'রে সক্রিয় স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে। এই মন্ত্রশক্তির প্রভাবেই দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গরচনা—বিশেষ ক'রে কবিতা ও গানের চেহারা এবং চরিত্রে একটা পরিবর্তন দেখা যায়। অত্যাচার অবিচার মূঢ়তা ও অন্ধতার বুকে সোজাসুজি কঠিন আঘাত হানার কাজে কবি ও গীতিকাররা এখন থেকে একেবারে নিঃশঙ্ক। একদিকে বিদেশী সরকারের শোষণ ও নির্যাতন এবং অপরদিকে স্বজাতির দুর্বলতা ভণ্ডামী মোহ ও আত্মবিস্মৃতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ

সংগ্রামী মনোভাব এ'দের ব্যঙ্গাস্ত্রগুলিকে ভাষার দৃঢ়তায় ও প্রকাশভঙ্গির চাতুর্যে আগের চেয়ে অনেক ধারালো ও সূক্ষ্মাগ্র করে তুলেছে।

এই সংকলনে এমন কয়েকজনের রচনার নিদর্শন আছে যাঁরা কবি বা গীতিকার হিসাবে কোনো দিনই খ্যাতি অর্জন করেন নি। বাংলা সাহিত্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা ঔপন্যাসিক হিসাবে: শিক্ষাবিদ্ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাম করেছিলেন সরস প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে। অথচ কেদারনাথ একসময় কিছু ভালো ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন। সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হয়েছিল। ললিতকুমারের এই ধরনের লেখার একটি নিদর্শন পেয়েছি যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের একটি গান আছে যেটি 'করালী' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এ-ছাড়া আরো কয়েকজনের দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গরচনার নিদর্শন পুরানো দুষ্প্রাপ্য বই এবং সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা থেকে আবিষ্কার করেছি। বাঙালী পাঠক আজ যাঁদের প্রায় বা সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন এমন কয়েকজন কবিরও এই ধরনের লেখার সঙ্গে আবার নতুন করে তাঁদের পরিচয় করে দিয়েছি।

সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্যে কবি ও গীতিকারদের রচনা সম্পর্কে গ্রন্থারম্ভে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এই প্রসঙ্গে এখানে একটি ত্রুটির কথা দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে। অনিবার্য কারণে শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বনফুল) সম্পর্কে আলোচনা এই অংশে সন্নিবেশ করা সম্ভব হয় নি। এর জন্যে তাঁর কাছে এবং সহৃদয় পাঠকদের কাছে মার্জনা চাইছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'বনফুল' একটি অবিস্মরণীয় নাম। ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার হিসাবে যদিও তিনি আজ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত তবু কবি হিসাবেও তাঁর একটি নিজস্ব পরিচয় আছে এ-কথা অনেক পাঠকই জানেন। বিশেষ ক'রে ব্যঙ্গকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতার কথা আমরা ভুলতে পারি না। বনফুলের এমন অনেক ব্যঙ্গকবিতা আছে যেগুলিতে তাঁর আন্তরিক স্বদেশপ্রেমের পরিচয় সুস্পষ্ট। ভাষা ও রচনাভঙ্গির দিক থেকেও সেগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। স্থানাভাবের জন্যে এই গ্রন্থে তাঁর এই ধরনের একটি কবিতাই সংকলিত হয়েছে।

সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থেই আর একটি ব্যাপারেও শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। অনেক কবিতায় বা গানে এমন কিছু কিছু চরণ বা চরণাংশ আছে যে-গুলির সঙ্গে সে-যুগের সাময়িক ঘটনা, প্রচলিত প্রথা বা জাতীয় আন্দোলনের

ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গের সংযোগ রয়েছে ; তা ছাড়া কিছু কিছু অধুনা-অপ্রচলিত শব্দও সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। অথচ এই সব অংশের ঘটনা- বা ইতিহাস-প্রসঙ্গ এবং শব্দগুলির অর্থ না বুঝলে ব্যঙ্গের তাৎপর্য বা তীক্ষ্ণতা সম্যক্ বোঝা যাবে না। এই অসুবিধা যথাসম্ভব দূর করার জন্যে প্রয়োজনবোধে অনেক রচনার শেষে সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজিত হয়েছে। অনেকগুলি কবিতা বা গানের বিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় সাধারণ তথ্য সেগুলির শুরুতেই পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছি।

আর একটি কথা। আজকের পরিবর্তিত সামাজিক বা জাতীয় জীবনে যে-সব আধি-ব্যাধির আধিপত্য দেখা যাচ্ছে সেগুলির কয়েকটি যে পুরানো রোগ, দীর্ঘকাল চেপে রাখার চেষ্টা হয়েছিল ব'লে আজ তারা আবার নবোদ্যমে আত্ম-প্রকাশ করছে—এ-কথা যদি বুঝতে পারি তাহলে সে-যুগের অনেকগুলি ব্যঙ্গরচনা বর্তমানেও আমাদের কাছে আবেদনশীল হয়ে উঠবে।

এই ধরনের একটি সংকলন প্রকাশের কথা চিন্তা করি প্রায় চার বছর আগে। প্রথমে ভেবেছিলাম ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন কবি ও গীতিকারের দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গকবিতা ও গানগুলি সংগ্রহ ও নির্বাচন ক'রে সংকলনটি প্রকাশ করব। পরে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সীমারেখা না টেনে যদি স্বাধীনতালাভের আগে পর্যন্ত আরো কয়েকজন কবি ও গীতি-কারের রচনা সংকলনে গ্রহণ করা যায় তা হলে মোটামুটি মধ্য-উনিশ থেকে মধ্য-বিশ শতক পর্যন্ত প্রায় এক শ বছরের এই ধরনের রচনার একটা পরিচয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়। এই সিদ্ধান্ত মতো রবীন্দ্রনাথে না থেমে নলিনীকান্তে এসে থেমেছি। কিন্তু গ্রন্থের শেষের দিকে নজরুল এবং বনফুলের রচনা আছে। কারণ বিভিন্ন ঘটনাধারার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে রচনাগুলিকে কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানো সম্ভব হয় নি : কবি ও গীতিকারদের স্থাননির্ণয়ের ব্যাপারে প্রচলিত পদ্ধতিকেই অবলম্বন করতে হয়েছে—অর্থাৎ তাঁদের জন্মের কালানুক্রম। এই জন্যেই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে লেখা নলিনীকান্তের 'দোসরা জুন, উনিশ শ' সাতচল্লিশ' এবং 'ভাবী বিরহ' নজরুলের 'সাইমন কমিশনের রিপোর্ট' বা 'ডমিনিয়ন ষ্টেটাস' গান দুটির আগে স্থান পেয়েছে। কারণ বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে নলিনীকান্তের স্থান নজরুলের আগে। ফলে এই ধরনের রচনার ভাবগত বিবর্তন বা পরিণতিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি। নীল বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। ঈশ্বর গুপ্ত সে-বিদ্রোহের চেহারা দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু

তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই রায়তদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল। তাই এই বিদ্রোহের আগেই লেখা ঈশ্বর গুপ্তের গানগুলি বাঙালীর স্বদেশ-চেতনার অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। বইখানিকে আকর্ষণীয় করার জন্যে কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গচিত্রও এতে সংযোজিত হয়েছে।

সম্পাদনার কাজে আমার শিক্ষাগুরু পূজ্যবর ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ের সাহায্যের কথা প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি আমাকে এ-ব্যাপারে যে শুধু উৎসাহই দিয়েছেন তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে নানা উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, এমন কি তাঁর মূল্যবান ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে একখানি দুষ্প্রাপ্য বই এনে দিয়েও সাহায্য করেছেন। তারপর ছাপার কাজ শুরু হলে অনুগ্রহ ক'রে ভূমিকাটিও লিখে দিয়েছেন। তাঁর ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। আজ তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের কাছেও আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তিনি বহু মূল্যবান তথ্যের ভাণ্ডারী, জ্ঞানী-গুণী এবং এই অষ্টাশী বছর বয়েসেও নিরলস কর্মী। পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে তিনি নানা সময়ে চিঠি দিয়ে আমাকে যে সাহায্য করেছেন এ-যুগে তা খুব কম লোকের কাছ থেকেই প্রত্যাশা করা যায়। বইটি তাঁকে উৎসর্গ করার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি।

কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান পরমাত্মীয় ডক্টর গোপিকামোহন ভট্টাচার্যের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কথা চিরকাল মনে থাকবে। বন্ধুবর ডক্টর অরুণকুমার মিত্র, বাল্যবন্ধু শ্রীঅপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক বন্ধুবর কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ নানা সময়ে নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থে কয়েকজন কবি ও গীতিকারের রচনা ছাপার ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীরণজিৎ রায়, কাজী সব্যসাচী, শ্রীমতী সুনীতি দেবী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘটক, শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার রায়, শ্রীশক্তি ভাদুড়ী এবং শ্রীপ্রীতিভূষণ বসু। এঁদের সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থে আর একটি ত্রুটি রয়ে গেছে। স্বগত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য সংকলনের কাজে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি পরলোক গমন

করেন ১৪ মার্চ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর নামের পাশে অনবধানবশত শুধু জন্ম-সনটি উল্লিখিত হয়েছে। এর জন্যেও পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইছি।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের পক্ষ থেকে শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে এক অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মডার্ন প্রিণ্টার্সের শ্রীসুরেশ দত্ত এবং তাঁর সুযোগ্য কর্মিবৃন্দের কাছ থেকেও অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি। এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

চেষ্টা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও বইটিকে মুদ্রণপ্রমাদমুক্ত করা সম্ভব হয় নি। এর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর তো কিছু করার নেই। বাঙালী পাঠকদের সহৃদয়তার ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। শুধু আর একটি কথা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করি। এই গ্রন্থে সে-কালের কিছু কিছু শব্দ ও ক্রিয়াপদের বানান অপরিবর্তিতই রাখা হয়েছে, যেমন—'রৈলে', 'নীলকরেরদের', 'ধোচ্চে', 'বাঁদন', 'তুল্লে', 'আধুনী', 'হল্যো' ইত্যাদি।

বইটি পাঠকদের ভালো লাগলে পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

কবি ও গীতিকারদের প্রসঙ্গে দু-চার কথা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [১৮১২-১৮৫৯]—ঈশ্বর গুপ্তের আগে কোনো ক্ষমতাবান কবিই সামাজিক সমষ্টিচেতনার প্রভাব অথবা ভাবনা-ধারণার ক্ষেত্রে পরবশ্যতাকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কারণ যুগের মধ্যে কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার কোনো প্রেরণা তখন ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বাধীন কবি। তাঁর স্বাধীন কবিসত্তাই তাঁকে যথার্থ ব্যঙ্গকবি হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনিই "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম হাস্যরসিক লেখক।"[১] তাঁর হাসির রচনাগুলিতে যেমন আছে সাধারণ রঙ্গ-রসিকতা বা নির্ভেজাল কৌতুক, তেমনি আছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। ব্যঙ্গের বিষয় নির্বাচনেও তিনি স্বাধীন। ভগবানকেও বাদ দেন নি। তবে তাঁর ব্যঙ্গে ব্যক্তিগত আঘাতের পরিচয় কোথাও নেই। অনেকগুলি ব্যঙ্গরচনায় ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশচেতনা বা স্বদেশভক্তির পরিচয়ও সুস্পষ্ট। এই ধরনের দুটি ব্যঙ্গসঙ্গীত 'নীলকর—প্রথম গীত' এবং 'দুর্ভিক্ষ'।

মনোমোহন বসু [১৮৩১-১৯১২]—ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এবং তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর'-এর আশ্রয়ে সে-দিনের যে-কজন কবি-সাহিত্যিক পরবর্তীকালে স্বনামধন্য হয়েছিলেন মনোমোহন বসুও তাঁদের মধ্যে একজন। নাট্যকার হিসাবে প্রাচীনপন্থী হলেও সে-যুগে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আন্তরিক স্বদেশভক্তির পরিচয়ও তাঁর অনেক রচনাতেই পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে 'হিন্দুমেলা'-র সক্রিয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের "দিনের দিন সবে দীন পরাধীন" গানটি স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকের মুখেই শোনা যেত। মনোমোহন হাসির লেখা সামান্যই লিখেছেন ; তার মধ্যে ব্যঙ্গ অতি সামান্য। এই ধরনের বিরল রচনার একটি নিদর্শন—'ভিক্টোরিয়া গীতি'।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩]—হেমচন্দ্র কয়েকটি সুন্দর ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করেছিলেন। তাঁর কবিপ্রতিভার মূল্যাবিচার প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয়

১। অজিত দত্ত—'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস', পৃ-৫১।

ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন—"সাময়িক ঘটনামূলক সরল ও ব্যঙ্গাত্মক এই কবিতাগুলিতেই হেমচন্দ্রের রচনাশক্তির বিশেষ প্রকাশ!"[২] 'বৃত্রসংহার' তাঁকে যথার্থ মহাকবির সম্মান দিতে পেরেছে কিনা সে-বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু সে-যুগের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে লেখা হলেও তাঁর ব্যঙ্গকবিতাগুলি আজো আমাদের পড়তে ভালো লাগে। শুধু যে ভালো লাগে তাই নয়, কোনো কোনো কবিতার অংশবিশেষ এ-যুগেও যেন আমাদের আঘাত দিয়ে সচেতন করতে চায়—

"হায় কি হলো দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে!
পার্টি-খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত-রাজ্য পরে।
সবাই 'লীডার'—কর্ত্তা স্বয়ং আপনি বাহাদুর
কতই দিকে তুলছে কত কতই-তর সুর!"

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটিও অত্যন্ত সমীচীন বলে মনে হয়—"তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা সেইগুলি যা সোজাসুজি সাময়িক বা স্যাটায়ার। ...হেমচন্দ্র যদি নিজের প্রতিভাধর্ম বিচারে ভুল করে না বসতেন তাহলে তাঁর লিখিত ব্যঙ্গকবিতার পরিমাণ আরো অনেক বেশী হতো আর উৎকর্ষেও উন্নতমান লাভ করত।"[৩] সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে হেমচন্দ্রের স্বদেশচেতনা চারটি ব্যঙ্গকবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট—'সাবাস হুজুক আজব সহরে' 'হায় কি হলো' 'নেভার্ নেভার্' ও 'বাজীমাৎ'।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪০-১৯২৬]—রবীন্দ্রনাথের বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উপরেই ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ। হাসির রচনা তিনি কম লিখেছেন। কিন্তু যা লিখেছেন তার মধ্যেই তাঁর কৌতুক সৃষ্টির অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। 'গুম্ফ আক্রমণ কাব্য' এবং অন্যান্য কয়েকটি কবিতায় সুনির্মল হাস্যের ভাণ্ডারী দ্বিজেন্দ্রনাথকে চিনতে পারি। রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রা উপলক্ষ্যে সেকালের নব্যযুবকদের বিলাতগমণকে ব্যঙ্গ করে তিনি যে-কবিতাটি লিখেছিলেন সেটিই তাঁর এই ধরনের একমাত্র কবিতা।

২। ডঃ সুকুমার সেন—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সং, পৃ-৩৯০।
৩। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—'হেমচন্দ্র রচনা-সম্ভার', ভূমিকা।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪—১৯১২]—নট ও নাট্যকার হিসাবেই গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি। এবং নাটকের প্রয়োজনেই কিছু গানও তাঁকে লিখতে হয়েছিল। ভক্তি এবং রোমান্টিক মনোধর্ম তাঁর অধিকাংশ রচনাকেই আশ্রয় করে আছে। হাস্যরস তাঁর স্বভাবে তেমন দানা বাঁধতে পারেনি। কয়েকটি প্রহসন ও নকসা-জাতীয় লেখায় তিনি যে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন তার ধরনটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের। দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গকবিতা বা গান তাঁর বিশেষ নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বহুৎ আচ্ছা' প্রহসনের জন্যে লেখা তাঁর একটি গান এই ধরনের রচনার নিদর্শন হিসাবে এই গ্রন্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

হারাণচন্দ্র রাহা [?—?]—এ'র জন্ম-মৃত্যুর সময় জানা যায় নি। তবে এ'র গ্রন্থগুলির প্রকাশকালের ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র বা অক্ষয়চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। বাঙালী খ্রীষ্টান। কিন্তু স্বভাবে কোনো গোঁড়ামির ছায়া পড়েনি। লিখেছেন নানা ধরনের লেখা। পরিমাণে অল্প। (দ্রঃ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংস্করণ)। 'অবকাশরঞ্জন' নামে হারাণচন্দ্রের একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল (২য় সং ১৮৮০ খ্রীঃ)। কিছু সরস কবিতাও ইনি লিখেছিলেন এবং এ-ক্ষেত্রে সে-যুগের অন্যান্যদের মতো হারাণচন্দ্রেরও আদর্শ ছিলেন হেমচন্দ্র। এই গ্রন্থে তাঁর যে কবিতাটি সংকলিত হল তাতে তাঁর স্বদেশপ্রীতির, এবং খ্রীষ্টান হলেও ব্যাস-বাল্মীকির প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় সুস্পষ্ট।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার [১৮৪৬—১৯১৭]—সাপ্তাহিক 'সাধারণী' ও মাসিক 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমানুসারী লেখকদের মধ্যে অন্যতম। প্রধানত সরস গদ্য লেখাতেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দুটি রচনা কমলাকান্তের দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। অক্ষয়চন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলির বেশির ভাগ 'চনকচূর্ণ' নামে ঐ পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত হত। নিজের এই ধরনের লেখা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

"রহস্য লিখিনু মাত্র, রহস্য বুঝিবে।
বিদ্রূপে বিরূপ করি কোপ না করিবে॥"

তবু এ-সব লেখায় সর্বত্রই যে তাঁর অসূয়াহীন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে

সেকথা বলা যায় না। কিন্তু ব্যঙ্গকবিতাও তিনি লিখেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের সরস রচনার দুটি সংকলন 'সমাজ সমালোচনা' ও 'সনাতনী' তাঁর জীবিতাবস্থায় এবং 'মোতিকুমারী' ও 'রূপক ও রহস্য' মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সংকলিত ব্যঙ্গকবিতাটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। এ-ধরনের কবিতা তিনি আর লেখেন নি।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৯—১৯১১]—ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব পরিচয় আছে। অক্ষয়চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইন্দ্রনাথ চুঁচুড়া থেকে 'পঞ্চানন্দ' নামে ব্যঙ্গরচনার একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৭৮ খ্রীঃ)। চার বছর পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে ব্যঙ্গরচনা লিখতে শুরু করেন। এই লেখাগুলি 'পাঁচুঠাকুর' নামে প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রনাথেরও এই ধরনের লেখা বেশির ভাগ গদ্যে। কাব্য-কবিতাও কিছু লিখেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ পাঁচ সর্গে বিভক্ত 'ভারত-উদ্ধার'—ব্যঙ্গকাব্য (১৮৭৭ খ্রীঃ)। এই রচনাটির জন্যেই ইন্দ্রনাথ সেদিন বাঙালী পাঠকদের কাছে বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। কাব্যটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন ‑"ভারত-উদ্ধার কাব্যে তখনকার দিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের হাস্যজনক দিকটা বেশ ফুটিয়াছে।"[৪]

রাজকৃষ্ণ রায় [১৮৪৯—১৮৯৪]—কবিতা গান গল্প নাটক উপন্যাস—সব রকমের লেখাই লিখেছিলেন রাজকৃষ্ণ। পুরাণাশ্রিত বিভিন্ন কাহিনী তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। সীরিয়াস্ বিষয়বস্তুর জন্যে এবং কিছুটা স্বভাবগত কারণে ব্যঙ্গ বা অন্য ধরনের হাস্যরস তাঁর লেখায় বিশেষ প্রকাশ পায় নি। তবে দেশাত্মবোধক যে গানগুলি তিনি রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক। দুটি গ্রন্থে তাঁর গানগুলি পাওয়া যায়—'ভারত গান' (১৮৭৮ খ্রীঃ) এবং 'গান' (১৮৮৮ খ্রীঃ)। 'ভারত-গান'-এ একশ'টি দেশাত্মবোধক গান আছে।

অমৃতলাল বসু [১৮৫৩—১৯২৯]—গিরিশচন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে অমৃতলালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিও ছিলেন একাধারে

৪। ডঃ সুকুমার সেন—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—২য় খণ্ড, ষষ্ঠ সং. পৃঃ ৪৩২।

নট ও নাট্যকার। বিশেষ ক'রে সরস বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলির জন্যে সে-দিন তিনি বাঙালীর কাছে 'রসরাজ'-এর আসন পেয়েছিলেন। একজন সমালোচক তাঁর প্রতিভার বিশ্লেষণে বিরূপ মন্তব্য ক'রে বলেছেন—"অমৃতলালের নট-প্রতিভা যতটাই থাকুক সাহিত্যিক-প্রতিভা কিছুমাত্র ছিল বলে আমি মনে করি না।"[৫] সমালোচক মশায়ের এই অনুদার মন্তব্য সম্পূর্ণ অসমীচীন। অমৃতলালের সাহিত্য-প্রতিভার যথার্থ মূল্যবিচার পণ্ডিত-গবেষকরা করেছেন এবং তাঁর প্রাপ্য সম্মানও দিয়েছেন। (দ্রঃ 'অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য'— ডঃ অরুণকুমার মিত্র।) নাটক রচনায় তেমন কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও প্রহসনের ও নাট্যরূপদানের ক্ষেত্রে তিনি যথার্থই বৈচিত্র্য এনেছিলেন। এ-সব রচনার অনেক জায়গাতেই তিনি বাঙালীর নানা দুর্বলতা, অসংযম ও আত্মম্ভরিতার পিঠে কড়া ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন। অবশ্য এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে মাঝে মাঝে তাঁর ব্যঙ্গের আঘাতটা এমন জায়গায় পড়েছে যা থেকে তাঁর গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অমৃতলালের নাটকের চেয়ে প্রহসনে বেশি গান আছে। সেগুলি থেকে কয়েকটি গান এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, এবং একটি কবিতা বঙ্গভঙ্গের সময় লেখা। নাটক-প্রহসনের তুলনায় কবিতা অমৃতলাল বেশি লেখেন নি।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু [১৮৫৪—১৯০৫]—সেকালের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্রও ছিলেন একান্তভাবেই রক্ষণশীল। ব্যঙ্গরচনার ব্যাপারে তিনি ইন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেকালের কয়েকজন ব্যঙ্গলেখক 'বঙ্গবাসী'তে লিখতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনার সাহিত্যিক মূল্য তেমন উঁচু দরের না হলেও কিছু লেখা সুখপাঠ্য। 'মডেল ভগিনী' 'কালাচাঁদ' 'চিনিবাস চরিতামৃত' 'নেড়া হরিদাস' 'মহীরাবণের আত্মকথা' এবং 'বাঙালী চরিত'—তিন ভাগ তাঁর ব্যঙ্গরচনা। কিছু ব্যঙ্গসঙ্গীতও তিনি লিখেছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র দাস [১৮৫৫—১৯১৮]—পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্রের সব কবিতাই সীরিয়াস এবং প্রেম-বিষয়ক। তবে ব্যঙ্গকবিতাও যে তিনি ভালোই লিখতেন তার প্রমাণ 'মগের মুলুক' (১৮৯২ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থটি। নানা কারণে কবির জীবনে অনেক দুঃখ

৫। অজিত দত্ত—'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস', পৃঃ—১৫০।

জমাট বেঁধেছিল এবং অনেকের কাছ থেকে দুর্ব্যবহারও তিনি পেয়েছিলেন, বিশেষ ক'রে 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের চক্রান্ত ও শত্রুতার জন্যে ভাওয়ালের রাজ-পরিবারের সঙ্গেও তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, এবং তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই দুঃখানুভূতি এবং দুর্ব্যবহার-জনিত মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল 'মগের মুলুক'। সামাজিক অনাচার, কুসংস্কার, কুপ্রথা এবং মেকি স্বদেশভক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গও তাঁর কয়েকটি কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে!

অশ্বিনীকুমার দত্ত [১৮৫৬—১৯২৩]—বরিশাল জেলার ব্রজমোহন দত্তের পুত্র অশ্বিনীকুমার বলিষ্ঠ স্বদেশভক্তি সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান যথেষ্ট! তবে সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাপারে তেমন কোনো প্রতিভার পরিচয় তিনি রেখে যান নি। যা লিখেছেন তার বেশির ভাগই ধর্ম ও নীতিমূলক রচনা—যেমন 'ভক্তিযোগ' 'কর্মযোগ' 'প্রেম' ইত্যাদি। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে গান লেখার একটা সহজ প্রবণতা ছিল। তাঁর স্নেহের পাত্র কবি মুকুন্দ দাসের যাত্রার জন্যেও তিনি গান লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর গানগুলির মধ্যে কয়েকটি স্বদেশচিন্তামূলক ব্যঙ্গসঙ্গীতেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

বেণোয়ারীলাল গোস্বামী [১৮৬০—১৯৩৮]—রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক লেখক বেণোয়ারীলাল এক সময় 'নব্যভারত', 'প্রবাসী' এবং 'সাহিত্য' পত্রিকায় গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখতেন। কবিতাও কিছু লিখেছেন, এবং হাসির কবিতাও। 'খিচুড়ী' (১৯০১ খ্রীঃ) এবং 'পোলাও' (১৯২৩ খ্রীঃ) নামে তাঁর দুখানি হাসির কবিতার বই আছে। দ্বিতীয়টিতে কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক রচনাও আছে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় [১৮৬১—১৯১০]—স্বদেশী যুগের বিখ্যাত 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধবের আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী বন্ধু এবং স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ। এঁ'র জীবন ছিল অসাধারণ বৈচিত্র্যময়। প্রথমে গ্রহণ করেন ব্রাহ্ম ধর্ম, পরে হন খ্রীষ্টান এবং পরিশেষে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের ছ'মাস পরে ইনিও প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বিলাতে গিয়ে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এঁ'র সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষণগুলি প্রয়োগ করেছিলেন—"তেজস্বী, নির্ভীক,

ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রতিভাশালী।"[৬] দৈনিক 'সন্ধ্যা' ছাড়া তিনি সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' ও অর্ধ-সাপ্তাহিক 'করালী' পত্রিকা দুটিও পরিচালনা করতেন। 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি' 'ব্রহ্মামৃত' 'সমাজতত্ত্ব' 'পাল-পার্বণ' এবং 'আমার ভারত-উদ্ধার' তাঁর রচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ইংরেজ সরকারকে সমালোচনা ক'রে ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় কিছু ব্যঙ্গ-প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'করালী' ছদ্মনামেও তাঁর এই জাতীয় রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এই নামে প্রকাশিত তাঁর একটি দুষ্প্রাপ্য ব্যঙ্গসঙ্গীত এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১—১৯৪১]—হাস্যরসের যে একটা নির্মল শুভ্র রূপ আছে এবং গভীর ভাবের বিষয়ের সঙ্গেও যে তার সম্পর্ক থাকতে পারে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই তার প্রথম সার্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। এ-কথা রবীন্দ্রনাথই বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যের এই রসমূল্য যে ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যময় স্বীকৃতি পেয়েছে প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যে তার কোন পরিচয় নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ প্রধানত হাস্যরসের লেখক ছিলেন না। কবিতা ছড়া গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ—সব লেখাতেই নানা ধরনের হাস্যরস তিনি নানাভাবে পরিবেশন করে গেছেন। আর গদ্যে-পদ্যে যেগুলি তাঁর বিশুদ্ধ হাস্যরসের লেখা, যেমন—'গোড়ায় গলদ' 'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'হাস্য কৌতুক' 'ব্যঙ্গকৌতুক' 'সে' 'গল্পসল্প' 'খাপছাড়া' 'ছড়ার ছবি' 'প্রহাসিনী' এবং 'ছড়া'—সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথ হাস্যরস সৃষ্টিতে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এ-সব লেখায় স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গও যথেষ্ট আছে—বিশেষ ক'রে প্রথম দিকের লেখাগুলিতে। 'কল্পনা'-র যুগ পর্যন্ত এই ব্যঙ্গের চেহারাটা ছিল বর্শার শাণিত ফলার মতো। পরবর্তীকালে এমন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-কবিতা রবীন্দ্রনাথ আর লেখেন নি। এক সময় আর্যত্বের গর্বে বুক ভরে ভ্রান্ত জাতীয়তা-বোধের আশ্রয়ে যারা নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছিল, যারা প্রচার করেছিল পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো নতুন কথা নেই—আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যরা নাকি সে-সব কথা অনেক আগেই বলে গেছেন, অজ্ঞান আর আলস্যকে আঁকড়ে ধরে যারা দেশের উন্নতি আনতে চেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'-র তিনটি এবং 'কল্পনা'-র একটি কবিতায় তাদের উপর সাংঘাতিক

[৬] 'চার অধ্যায়': ১ম সংস্করণের ভূমিকা।

ব্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করেছেন। সেই চারটি কবিতাই এখানে সংকলিত হয়েছে।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১–১৯৪২)—বিজয়চন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী অনুরাগীদের মধ্যে অন্যতম। ওকালতি ছেড়ে জীবনের শেষের দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। অধ্যাপনার বিষয় ছিল ভাষা-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব। কিন্তু সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবেও বিজয়চন্দ্রের একটি বিশিষ্ট পরিচয় আছে—বিশেষ করে কবি হিসাবে। অধ্যাপনার বিষয় দুটির নিরসতায় সে-পরিচয় হারিয়ে যায় নি। 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়), 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'প্রবাসী', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজয়চন্দ্রের বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনিই ছিলেন 'বঙ্গবাণী'-র সম্পাদক। তাঁর সাতখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'ফুলশর' (১৯০৪ খ্রীঃ) 'যজ্ঞভস্ম' (১৯০৪ খ্রীঃ) এবং 'হেঁয়ালী' (১৯১৫ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজয়চন্দ্রের কয়েকটি সুন্দর দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গকবিতা আছে। সব ক'টি কবিতাই স্বদেশী আন্দোলনের সময় লেখা। তাঁর এই ধরনের যে ছ'টি কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে চারটি সে-সময়ের 'নব্যভারত' ও 'প্রবাসী'-র পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত —কবির কোনো কাব্যগ্রন্থে নেই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)—দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি কবি হিসাবে নয়, নাট্যকার হিসাবে। প্রকৃতই কাব্যক্ষেত্রে তিনি উচ্চমানের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি। অথচ আজ আমাদের কাছে তাঁর নাটকের আবেদন কিছুটা কমে গেলেও ব্যঙ্গকবিতা ও হাসির গানগুলির আবেদন একটুও কমে নি। হাস্যরসের স্রষ্টা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ সেদিন আর কেউ ছিলেন না। শুধু তাই নয়, বক্তব্য অনুযায়ী ব্যঙ্গ-কবিতার ভাষা ও ছন্দের নতুন রূপ দেবার চেষ্টায় তিনি যে সার্থকতা অর্জন করেছিলেন সে পরিচয়ও সে দিন আর কারো রচনায় পাওয়া যায় নি। তবে কোনো কোনো কবিতায় কবির ক্ষোভ এত উগ্র এবং আঘাত এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে সে-সব ক্ষেত্রে হাস্যরস দানাবাঁধার অবকাশ পায় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখায় হাস্যরস সর্বত্রই ব্যঙ্গাশ্রয়ী নয়। নিছক কৌতুক বা হাসির কবিতাও তিনি লিখেছেন। অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তি ও সাহেবিয়ানা, সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর্যত্বের অর্থহীন অহংকার, ইংরেজ

শাসকদের স্বার্থপরতা ও অত্যাচার, ভণ্ড রাজনৈতিক নেতার স্বরূপ—এই-সব বিষয়ে লেখা দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গকবিতা ও গান সে-সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেগুলি আছে তাঁর 'আষাঢ়ে' (১৩০৫ বঙ্গাব্দ), 'হাসির গান' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ), 'মন্দ্র' (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) এবং 'আলেখ্য' (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে। এগুলির মধ্যে 'হাসির গান' ছাড়া অন্যগুলি কবিতার বই। 'হাসির গান'-এর গানগুলিও আকৃতি-প্রকৃতির দিক থেকে কবিতা। 'আষাঢ়ে' এবং 'হাসির গান' বিশেষ ক'রে এই দুটি বইতে ব্যঙ্গ-কৌতুক রচনার ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় আছে।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬৩—১৯৪৯]—এক সময় কনিষ্ঠ সাহিত্যিক-দের কাছে 'দাদামশায়' নামে সুপরিচিত কেদারনাথ গদ্য-লেখক হিসাবেই পাঠক-সমাজে খ্যাতিলাভ করেছেন। বিশেষ করে হাস্যরসাত্মক গল্প ও উপন্যাস রচনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী। এ ছাড়া চীন দেশে কয়েক বছর অবস্থানের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছিলেন 'চীন যাত্রী' ভ্রমণ কাহিনী, একটি নাটক এবং স্মৃতিকথা। কিন্তু এক সময় কেদারনাথও যে কিছু সুন্দর হাসির কবিতা লিখেছিলেন সে-কথা আজ আমরা প্রায় অনেকেই ভুলে গিয়েছি। তাঁর এই ধরনের প্রথম কবিতার বই 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (১৩২২ বঙ্গাব্দ) কাশী-প্রবাসকালে লেখা। এটি 'নন্দি শর্মা' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। কেদারনাথের স্বনামে প্রকাশিত হাসির কবিতার অপর বইটির নাম 'উড়ো খৈ' (১৩৪১ বঙ্গাব্দ)। উৎসর্গ-পত্রে লেখা আছে—'গোবিন্দায় নমঃ'। গ্রন্থটির সূচনায় কবির বক্তব্য থেকে জানা যায় কবিতাগুলি—"বাইশ বছর পূর্বের লেখা", অর্থাৎ ১৩১৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে। সুতরাং 'কাশীর কিঞ্চিৎ' প্রকাশিত হবার আগেই 'উড়ো খৈ'-এর কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল। মনে রাখা দরকার স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সে-সময় যেমন দেশাত্মবোধের একটা সক্রিয় বলিষ্ঠ রূপ গড়ে উঠেছিল তেমনি ভণ্ডামি ভ্রান্তি আর আদর্শহীনতার উদাহরণও কম ছিল না। 'উড়ো খৈ'-এর কয়েকটি ব্যঙ্গকবিতায় কেদারনাথ দেশের স্বার্থপর বিলাসী অলস ও ভণ্ডদের ওপর কঠিন আঘাত হেনেছেন।

রজনীকান্ত সেন—[১৮৬৫-১৯১০]—ভক্তিমূলক ও স্বদেশী গানের রচয়িতা হিসাবে রজনীকান্ত বিশেষভাবে পরিচিত। এঁর দেশাত্মবোধক গান-

গুলি এক সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। হাসির গানও তিনি কিছু লিখেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর ওপর যে দ্বিজেন্দ্রলালের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। রজনীকান্তের 'বাণী' (১৯০২ খ্রীঃ) এবং 'কল্যাণী' (১৯০৫ খ্রীঃ) গ্রন্থ দুটিতে কয়েকটি সুন্দর দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গসঙ্গীত আছে। স্বদেশী যুগে লেখা এই গান-গুলিতে রজনীকান্ত দেশবাসীর বিজাতীয় আচার-আচরণ ও ভাববিলাস এবং দেশাত্মবোধের প্রতি মর্মান্তিক অবজ্ঞার মনোভাবকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আঘাতে আহত করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় রজনীকান্তের কতকগুলি দেশাত্মবোধক গান ইংরেজ সরকার কর্তৃক সে-যুগে গাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল ; সেগুলির মধ্যে 'বঙ্গবিভাগ' 'কিচার' 'মাভৈঃ' 'হুকুম' প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬৮-১৯২৯]—খ্যাতিমান শিক্ষাব্রতী এবং সমালোচক ললিতকুমার প্রধানত প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সীরিয়াস্‌কে সরস ক'রে প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। 'ফোয়ারা' 'পাগলা ঝোরা' ইত্যাদি বইগুলিতে তাঁর এ-ক্ষমতার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। কিন্তু কবিতা বা গান ললিত কুমার বিশেষ লিখেছেন বলে জানা যায় না। তবে লিখতে যে পারতেন তার একটি প্রমাণ এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে—স্বদেশী আন্দোলনের সময় লেখা একটি ব্যঙ্গসঙ্গীত, 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

মুকুন্দ দাস [১৮৭৮-১৯৩৪]—স্বদেশী যুগে মুকুন্দ দাসের গানগুলিও অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ'র পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে বা 'যজ্ঞা'। জন্ম বিক্রমপুরে হলেও থাকতেন বরিশালে। মুকুন্দ দাস মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন : শুধু গান নয়, যাত্রাভিনয়ের মধ্যে দিয়েও তিনি দেশবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগানোর চেষ্টা করতেন। 'মাতৃপূজা' যাত্রাভিনয় লিখে ইনি আড়াই বছর হাজত-বাস করেন। ব্যঙ্গসঙ্গীতগুলির মধ্যে দিয়ে মুকুন্দদাস দেশবাসীর দুর্বলতা জড়তা ও কাপুরুষতাকে কঠিন আঘাত হেনেছেন।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত [১৮৮১-১৯৬৮]—'দাদাঠাকুর' নামে ইনি দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিখ্যাত হয়েছিলেন , এবং বয়স, শ্রেণী, অবস্থা

ও ধর্মনির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা-ভালোবাসা পেয়েছিলেন। স্বভাব-চরিত্র, বেশ-ভূষা, কাজ-কর্ম, বিদ্যাবুদ্ধি সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। খালি পা, খালি গা, কখনো-বা গায়ে একটা চাদর আর পরনে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি—এই চেহারাতেই চিরকাল তাঁকে সবাই দেখেছে, সাধারণ গ্রামবাসী থেকে ইংরেজ সরকারের বড় বড় কর্তাব্যক্তি পর্যন্ত। হাসির গান শুনিয়ে জাঁদরেল পুলিশ অফিসারদের মুগ্ধ করতেন অথচ তাঁর কাছেই স্বদেশী বিপ্লবীরা পেতেন নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল দাদাঠাকুরকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করতেন। এই শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ তাঁর 'চন্দ্রবিন্দু' গানের বইটি (নজরুলের অন্য কয়েকখানি বইয়ের মতো এটিকেও ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন) দাদাঠাকুরকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন—"হে হাসির অবতার, / লহ গো চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।" বহু হাসির কবিতা ও গান দাদাঠাকুর রচনা করে গেছেন। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে মুখে মুখে ব্যঙ্গকবিতা বা গান রচনার বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল তাঁর। দাদাঠাকুরের লেখা ছাপা হত তাঁর নিজের পত্রিকা 'বিদূষক'-এ এবং 'বিজলী' 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি সেকালের অন্যান্য বিখ্যাত পত্রিকায়। তিনি সুন্দর রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-কবিতা ও গানও অনেকগুলি লিখেছেন। সেগুলি এখনো পুরানো পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই ছড়িয়ে আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [১৮৮২-১৯২২]—এক সময় কাব্যে নীতির প্রশ্ন তুলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন। অন্যান্য রবীন্দ্র-ভক্ত লেখকদের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথও তখন দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁর 'মরাল ও পেচক' ব্যঙ্গকবিতাটি এই সময়েই 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিক হয়। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ অনেক ব্যঙ্গ-কবিতা লিখেছেন। এই ধরনের কবিতায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে 'নবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। বিশুদ্ধ হাস্যরসের কবিতার চেয়ে ব্যঙ্গকবিতাই তাঁর কলম থেকে বেশি বেরিয়েছে। এবং সেগুলির বেশির ভাগই তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের এক-একটি তূণীর। কবির স্বদেশচিন্তা ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় তাঁর অনেক রচনাতেই অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। স্বদেশীযুগের নানা প্রসঙ্গ তাঁর অনেক কবিতারই উপাদান। দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গকবিতাও সত্যেন্দ্রনাথ কয়েকটি লিখেছেন। বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গ, জাতীয় দুর্বলতা, চরকার কথা,

গান্ধীজী প্রশস্তি—সবই তাঁর কবিতায় আছে। কবির জীবৎকালে তাঁর হাসির কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়—'হসন্তিকা' (১৯১৭ খ্রীঃ)। তবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে লেখা তাঁর ব্যঙ্গকবিতাগুলি এতে নেই। দু একটি আছে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'বেলা শেষের গান' (১৯২৩ খ্রীঃ) এবং 'বিদায় আরতি' (১৯২৪ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থে।

সতীশচন্দ্র ঘটক (১৮৮৫-১৯৩২)—সত্যেন্দ্রনাথের সমসাময়িক লেখক সতীশচন্দ্রও গদ্যে ও পদ্যে হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। তবে এ'র রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব সুস্পষ্ট এবং লেখকও সজ্ঞানে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। সে-সময় প্যারডি-লেখক হিসাবে সতীশচন্দ্রের সুনাম ছিল। এ'র প্রথম বই 'রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' (১৯১৫ খ্রীঃ) হাস্যরসাত্মক গদ্য ও পদ্য রচনার সংগ্রহ। সতীশচন্দ্রের আরো দু'খানি হাসির কবিতার বই আছে--'ঝলক' ও 'লালিকাগুচ্ছ'। এ-ছাড়া তাঁর কয়েকটি ছোটগল্পের বই ও নাটক প্রহসনও আছে।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৬৫)—বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে বনবিহারীর অবদানের যথার্থ মূল্য বিচার এখনো হয় নি। হওয়া উচিত। না হলে এমন একজন অসাধারণ মানুষের পরিচয় হারিয়ে যাবে বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্যকে যিনি বিশেষভাবে ঋদ্ধিমান করে গেছেন। এ-ব্যাপারে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রদ্ধাস্পদ্ স্বর্গত পরিমল গোস্বামী। তাঁর 'স্মৃতিচারণ'-এ এবং ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ'-এ তিনি বনবিহারীর জীবন ও স্বভাবের বিভিন্ন দিক এবং বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বনবিহারী পেশায় ছিলেন ডাক্তার। বিখ্যাত সাহিত্যিক ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ('বনফুল') গুরু। তাঁর স্বভাব-চরিত্রে ছিল অতুলনীয় বলিষ্ঠতা এবং স্বাতন্ত্র্য। আর তাঁর সমস্ত সত্তায় মিশে ছিল সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবোধ। পরিমলবাবু লিখেছেন—"এক এক সময় তাঁর প্রখর ব্যঙ্গ যেন তড়িৎগতি সাপের মতো তাঁর সমগ্র দেহে এ'কে বেঁকে খেলে বেড়াত, কাছে থাকতে ভয় হত ! কিন্তু পরক্ষণেই মধুর হাসিতে সকল ভয় দূর করতেন।" (দ্রষ্টব্য—দেশ, সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)। অথচ বনবিহারীর এই প্রখর ব্যঙ্গবোধ কখনো কোনো ব্যক্তিমানুষকে আঘাত করে নি। কারণ তাঁর ব্যঙ্গাস্ত্রগুলির মুখ ফেরানো থাকতো সমাজে ও জাতির জীবনে জমে-

ওঠা যণ্ডামি ভণ্ডামি ন্যাকামি ও নোংরামির দিকে। 'দশচক্র', 'যোগভ্রষ্ট', 'সিরাজির পেয়ালা' এ-সব গদ্যরচনা ছাড়া বনবিহারী লিখেছিলেন অনেক ব্যঙ্গকবিতা। 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গবাণী', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রিকায় সেগুলি ছাপা হয়েছিল। কবিতাগুলির সঙ্গে থাকতো তাঁর নিজেরই আঁকা অপূর্ব ব্যঙ্গচিত্র। শুধু লেখায় নয় রেখাতেও তাঁর ব্যঙ্গবোধ ছিল সমান ধারালো। এ-সম্পর্কে পরিমলবাবুর মন্তব্যই উদ্ধার করি—"তিনি কৌতুক সৃষ্টিতে হাসানোর চেষ্টা করেন নি, ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে ভাবাতে ও কাঁদাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর আঁকা কার্টুন ছবি যদি কেউ দেখে থাকেন তবে এ-ব্যাপারেও তিনি যে অদ্বিতীয় ছিলেন তা বোঝা যাবে।" (দ্রঃ—দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ)। 'বেপরোয়া' নামে একটি পত্রিকার (১৯২৩ খ্রীঃ) তিনিই ছিলেন কেন্দ্রশক্তি ও প্রধান লেখক। সম্পাদনা করতেন 'বেপরোয়া দল'-এর অন্যতম বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য। এই গ্রন্থে তাঁর যে তিনটি ব্যঙ্গকবিতা ছাপা হল সেগুলি পুরানো 'ভারতবর্ষ'-এর পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত [১৮৮৭-১৯৫৪]—রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁরা বাংলা কবিতায় নতুন জীবনভাবনা ও কাব্যচিন্তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলেন যতীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর অনুভূতির রাজ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে দুঃখবাদ। এ-দুঃখবাদ কোনো নেগেটিভ্ মনোধর্ম নয়, কারণ এর অন্তরে আছে বলিষ্ঠ ও সুস্থ জীবনকামনা। হাস্যরস এই কারণেই তাঁকে বিশেষ লুব্ধ করতে পারে নি! কিন্তু যন্ত্রণাময় বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল সূক্ষ্ম ব্যঙ্গবোধ। এই বোধকে তিনি কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝে কাজে লাগিয়েছেন। দেশপ্রেমের নামে ভণ্ডামি এবং দেশের অবস্থা নিয়ে লেখা যতীন্দ্রনাথের দুটি সার্থক ব্যঙ্গ-কবিতা এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

হেমেন্দ্র কুমার রায় [১৮৮৮-১৯৬৩]—শেষের দিকে হেমেন্দ্রকুমার শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও এঁর গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয়। প্রবন্ধ, গান এবং কবিতাও ইনি কিছু লিখেছেন। এঁর কয়েকটি কবিতায় ভাব ও ভাষাগত যে বলিষ্ঠতা আছে মনে হয় তা কাজী নজরুলের প্রভাবজাত। নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আর হেমেন্দ্রকুমারের একমাত্র কবিতার বই 'যৌবনের

গান' ছাপা হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। শাস্ত্রের নামে অনাচার কুসংস্কার আর জড়তাকে নজরুলের মতো হেমেন্দ্রকুমারও প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। কিন্তু এর জন্যে তিনি ব্যঙ্গের সাহায্য বিশেষ নেন নি। তবে মাঝে মাঝে নিয়েছেন। এবং কবিতার সে-সব অংশে ব্যঙ্গও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। 'কালাপাহাড়ের উদ্বোধন' এই রকমের একটি কবিতা।

নলিনীকান্ত সরকার [জন্ম—১৮৮৯] দাদাঠাকুরের অনুজপ্রতিম, বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহচর শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সেকালের 'ভারতী'-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল 'বিজলী' পত্রিকার সঙ্গে। সে-যুগের এই বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বলিষ্ঠ বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করত। নবীন-প্রবীণ বিখ্যাত-অখ্যাত অনেকেই এই পত্রিকায় লিখতেন। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর অনেকের লেখাও এতে ছাপা হত। সকলের সঙ্গেই নলিনীকান্তের ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ স্নেহ ও সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। নলিনীকান্তের অনেক রচনা 'বিজলী'-তে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য পত্রিকাতেও তিনি লিখতেন, এবং এখনো—এই অষ্টাশী বছর বয়সেও পঠন-পাঠন ও সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। দাদাঠাকুরের মতো নলিনীকান্তের জীবনও বৈচিত্র্যময় এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে হাসির গানের রচয়িতা ও গায়ক হিসাবে ইনিও এক সময় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' 'হাসির অন্তরালে' এবং 'দাদাঠাকুর' নলিনীকান্তের এই তিনখানি গদ্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে শেষের দুখানিতে তাঁর সুন্দর সরস রচনাভঙ্গির পরিচয় আছে। গান বা কবিতার কোনো সংকলন এখনো প্রকাশিত হয় নি।

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য [জন্ম-১৮৯০]—এখনকার বাঙালী পাঠকদের কাছে সুপরিচিত না হলেও কবি হিসাবে যতীন্দ্রপ্রসাদের খ্যাতি আছে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনটি সম্পাদনা ক'রে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বাঙালী পাঠকদের সামনে কবিকে আবার নতুন করে উপস্থিত করেছেন। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিদের সগোত্র হলেও যতীন্দ্রপ্রসাদের কাব্যরচনায় স্বকীয়তার পরিচয় আছে—বিশেষ করে হাস্যরস সৃষ্টিতে; এবং দেশাত্মবোধক হাসির রচনাও তাঁর অনেক আছে। প্যারডি বা লালিকা রচনাতেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব

দেখিয়েছেন। তাঁর লেখা রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গানের অপূর্ব দেশাত্মবোধক প্যারডি এই গ্রন্থে সংকলিত হল। প্রসঙ্গত আর একটি কথা : রুশ বিপ্লবের মহান নায়ক লেনিনের মৃত্যুর দু মাস পরে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত যতীন্দ্রপ্রসাদের 'লেনিন' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি (চৈত্র ১৩৩০ বঙ্গাব্দ) লেনিন সম্পর্কে বাংলায় প্রথম কবিতা।[৭] এটি রচনার জন্যে ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টি থেকে কবি কৌশলে মুক্তি লাভ করেন। মনে রাখা দরকার তখনো ভারতের কমিউনিস্ট্ পার্টির জন্ম হয় নি, পার্টি গঠনের প্রস্তুতি চলছে মাত্র এবং ইংরেজদের চোখে লেনিন ছিলেন —'notorious Bolshevik leader.'

এ-প্রর্যন্ত যতীন্দ্রনাথের পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে—'মর্মগাথা' (১৯১৪ খ্রীঃ), 'হাসির হল্লা' (১৯২৩ খ্রীঃ), 'ছায়াপথ' (১৯২৫ খ্রীঃ), 'রামধনু' (১৯২৬ খ্রীঃ), 'নভোরেণু' (১৯২৭ খ্রীঃ) এবং শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬৩ খ্রীঃ)। 'হাসির হল্লা'-র দুটি অংশ—'রঙ্গ-ইঙ্গিত' ও 'ব্যঙ্গসঙ্গীত'। এই গ্রন্থের কোনো কোনো রচনায় ব্যঙ্গের আঘাত চাবুকের মতো মনে হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম [জন্ম—১৮৯৯]—নজরুলকে আমরা বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা দিয়েছি। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে? কবি নিজেই উত্তর দিয়েছেন—"শুধু রাজার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই—সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।" (দ্রঃ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী')। এ-যে কবির মিথ্যা দম্ভোক্তি নয় তার অজস্র প্রমাণ নজরুল সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। এক দিকে ইংরেজ শাসকদের শোষণ ও অত্যাচার অপরদিকে স্বজাতির ভণ্ডামি, অনাচার, মোহ ও স্বার্থবুদ্ধির বিরুদ্ধে কবি তাঁর লেখনীকে সত্যই খড়্গের মতো ব্যবহার করেছেন। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্যে তিনি এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন সানন্দে। সাহিত্য সৃষ্টির অপরাধে বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে নজরুলই প্রথম কবি-রাজবন্দী। জেলের বন্দীদশার চরম দুর্ভোগকে অদম্য স্ফূর্তির ঝড়ে উড়িয়ে দিয়ে জেলের মধ্যেই মুখে-মুখে গান বেঁধেছেন জেল-পরিচালককে ব্যঙ্গ করে। কয়েকখানা বই ইংরেজ

৭। দ্রঃ 'কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা'—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ; ভূমিকা পৃ—(ঠ)।

সরকার বাজেয়াপ্ত করেছেন। কোনো পরোয়া করেন নি। লেখনীও নিস্তেজ হয় নি একটুও। তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতা—বিশেষ করে গানগুলি সেদিন তরুণ রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল ; তাঁর মতো রক্তলিখায় শোষকের সর্বনাশ ডাকতে আর কেউ পারেন নি, আর এমন গভীর সহমর্মিতায় কেউ বাণী দিতে পারেন নি শোষিতের বেদনাকে। নজরুল বাংলা সাহিত্যে নিপীড়িত মানবাত্মার প্রথম সার্থক কবি। এই দিক থেকে এবং তাঁর অসংখ্য গানের মধ্যে দিয়ে নজরুল বাঙালীর কাছে চিরপ্রিয় হয়ে থাকবেন।

নজরুলের সদানন্দময় প্রকৃতিতে হাসি ছিল সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত। সে-হাসি তাঁর রচনার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এবং এ-কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না যে দ্বিজেন্দ্রলালের পর 'দাদাঠাকুর' ও নজরুলের মতো হাসির গান আর কারো লেখনী থেকে পাওয়া যায় নি। নজরুলের হাসি যখন ব্যঙ্গের চেহারায় শোষণ অত্যাচার অনাচার ও ভণ্ডামিকে আঘাত করেছে তখন সে-হাসিও কোষমুক্ত ঝকঝকে তলোয়ার। পূর্ববর্তী ব্যঙ্গকবিদের রচনার সঙ্গে তাঁর রচনার আকৃতি-প্রকৃতিগত পার্থক্যও সুস্পষ্ট।

এই গ্রন্থে নজরুলের যে-কটি ব্যঙ্গ রচনা সংকলিত হয়েছে সেগুলি তাঁর 'বিষের বাঁশী' (১ম সং ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ২য় মুদ্রণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ) 'ভাঙার গান' (১ম সং ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, ২য় মুদ্রণ ১৯৪৯ খ্রীঃ), 'চন্দ্রবিন্দু' (১ম সং –?, ২য় মুদ্রণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ) এবং 'গীতি-শতদল' (১ম সং ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ২য় মুদ্রণ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ) থেকে গ্রহণ করেছি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [১৮১২-১৮৫৯]

নীলকর

[নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে কবি পাঁচটি গান লিখেছিলেন। এটি প্রথম গীত। এতে কবি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যে প্রশস্তি রচনা করেছেন তার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে তাঁর গভীর দেশাত্মবোধ এবং তখনকার আন্দোলনকারীদের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ।]

প্রথম গীত

(কবির সুর)

মহড়া

কোথা রৈলে মা বিক্টোরিয়া, মা গো মা,
কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখ আর নাহি স্পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে।
এমন সোণার বর্ষে, খাষের বর্ষে,
কেবল বর্ষে যাতনা।
"আসিয়া" আসিয়া মা গো করুণাময়ী
করুণাচক্ষে দেখ না॥

নামেতে নীলের কুটি, হতেছে কুটি কুটি,
দুখী লোক প্রাণে মারা যায়।
পেটে খেতে নাহি পায়।
কুটেল সব সাহেবজাদা, ধপ্ ধপে বাইরে সাদা,
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,
পেঁকো গন্ধ তায়।
ওমা একে মনসার ফোঁস-ফুঁসুনি
ধুনোর গন্ধ তায়।
হোলে চোরের কাছে ধর্মকথা
মর্ম কভু বোঝে না॥

চিত্তেন

হোলো নীলকরেরদের অনরারি
মেজেষ্টারি ভার,
কুইন্ মা, মা, মা গো
হোলো নীলকরেরদের অনরারি
মেজেষ্টারি ভার।
পড়েচে সব পাতর বক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে
বিচারে রক্ষে নাইকো আর।
নীলকরের হদ্দ লীলে, নীলে নিলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্বনাশ।
কুটিয়াল বিচারকারী লাটিয়াল সরকারী
বানরের হাতে হোলো কালের খোন্তা,
লোন্তা জলে চাষ,
হোলো ডাইনের কোলে ছেলে সোপা,
চীলের বাসায় মাচ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে
শুনেনি কেউ শুনবে না॥

অন্তরা

প্রজা ধোর্চ্ছে আর সার্চ্ছে তারা এককালে,
পিটেতে মার্চ্ছে খুব কোঁড়া।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, পোড়ার ওপর পোড়া,
যেন গোদের উপর বিষ ফোঁড়া॥

চিত্তেন

হোলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ।
কাল সাপ কি কোন কালে দয়াতে ভেকে পালে
টপাটপ্ অমনি করে গ্রাস॥

বাঙালী তোমার কেনা একথা জানে কে না ?
হয়েছি চিরকেলে দাস ।
করি শুভ অভিলাষ ।
তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচালি ঘাস ॥
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না ।
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥

অন্তরা

জমি চুনচে দিন গুণচে, কেবল বনচে বীজ,
দেহাই না শুনচে একটি বার ।
নীলের দাদন, ঠেঙ্গার গাদন, বাঁদন চমৎকার
করে ভিটে মাটি চাটি সার ॥

চিতেন

তোমার সাধের বাংলা হোলো কাংলা,
সয় না অত্যাচার ।
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মারা,
লাটের দিন খাজনা হয় না আর ॥
কাঙালী বাঙালী যত চিরদিন অনুগত,
জানি নে মন্দ আচরণ,
পূজি তোমার শ্রীচরণ ।
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো,
মনেতে রাঙা আলো,
টুকটুকে টুক্ সিঁদুরে বরণ ।
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে স্বপ্নে জানি নে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি
তোমার জয়ের বাসনা ॥

['কবিতা-সংগ্রহ'—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ।]

দুর্ভিক্ষ

বাউলচাদী সুর

রাগিণী দেশমল্লার—তাল আড়-খেমটা।

[কবিতাটিতে তখনকার নবাবঙ্গসম্প্রদায়ের উগ্র ইংরেজপ্রীতি এবং অন্ধ অনুকরণ প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় বিদ্রূপ করা হয়েছে।]

হয় দুনিয়া ওলট-পালট
আর কিসে ভাই রক্ষে হবে
আর কিসে ভাই রক্ষে হবে।
পোড়া আকালেতে নাকাল করে
ডামাডোল পড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া শিক্ষে ধোরে
ভিক্ষে কোরে বেড়াই সবে।
হোলো সকল ঘরে ভিক্ষে মাগা
কে এখন আর ভিক্ষে দেবে।
যত কালের যুবো যেন সুবো
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধরে গুরু পুরুত মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে।
যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়
ঘুঁসি ধরে ওঠেন তবে।
বলে গতর আছে খেটে খেগে
তোর পেটের ভার কেটা ববে।
যাদের পেটে হেড়া মেজাজ টেড়া
তাদের কাছে কেটা চাবে.
বলে জো বাঙালি ড্যাম্. গো টু হেল
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা
অধঃপাতে সবাই যাবে।
হোয়ে হিঁদুর ছেলে ট্যাসের চেলে
টেবিল পেতে খানা খাবে।

এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না
খেদ করে আর কে বোঝাবে।
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে
জুতা পায়ে দেখতে পাবে।
হোলো কর্মকাণ্ড লণ্ডভণ্ড
হিঁদুয়ানি কিসে রবে।
যত দুধের শিশু ভোজে ঈশু
ডুবে মোলো ভবে টবে[১]।
আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রত ধর্ম কোত্তো সবে।
একা "বেথুন"[২] এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ বি শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে,
সব কাঁটা চামচে ধরবে শেষে
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।
ও ভাই আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী[৩]
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
আছে গোটা কত বুড়ো যদ্দিন
তদ্দিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই তারা মলেই দফা রফা
এককালে সব ফুরিয়ে যাবে।
যখন আসবে শমন কোরবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।

ঘোর পাপে ভরা হোলো ধরা
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে[৪]।
তাই নীলকরেরদের মেজেষ্টারি
কেমন কোরে ধর্মে সবে।
ও ভাই তত্তদিন তো খেতে হবে
যত দিন এ দেহ রবে.
এখন কেমন কোরে পেট চালাবো
মোরে গেলেম ভেবে ভেবে।
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে
ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।
তায় তেল জোড়ে তো লুণ জোড়ে না
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটা কাল মাচ খেয়েছে
কেমনে সে শুক্‌নো খাবে।

['কবিতা-সংগ্রহ'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।]

টীকা—১ ডবের টবে—ডব—Alexander Duff. ডিরোজিওর সমসাময়িক খ্রীষ্টান পাদরি। নব্যবঙ্গসম্প্রদায়ের ইংরেজ-প্রীতির সুযোগ নিয়ে ইনি তখন যুবকদের খ্রীষ্টান করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।

২ বেথুন—বড়লাটের তদানীন্তন আইনসচিব জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন—বেথুন স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (বেথুন কলেজটি পরে হয়েছে)।

৩ বগী—**Buggy**—হালকা চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি।

৪ 'রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে'—বিধবা-বিবাহের হুকুম অর্থাৎ আইন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই আইন পাস হয়।

মনোমোহন বসু [১৮৩১—১৯১২]

ভিক্‌টোরিয়া-গীতি

(বাউলের সুর)

কোথায় মা ভিক্টোরিয়া, দেখ্ আসিয়া,
ইণ্ডিয়া তোর চলছে কেমন !

(অন্তরা)

ছিল মা সুখের রাজ্য, ধরা পূজ্য,
আর্যধাম এই ভারত-ভুবন ।
বাণিজ্য ধন ঐশ্বর্য, শৌর্য-বীর্য
আশ্চর্য সব ছিল তখন ! ১ ।

তার পরে জোর প্রভুত্ব, ঘোর দৌরাত্ম্য,
সত্য বটে কর্ত্তো যবন ;
কিন্তু মা এমন ক'রে অন্নের তরে
কাঁদতো না লোক এখন যেমন ! ২ ।

সে দায়ে ঠেকতো তারা, ধনী যারা—
আমীর ওমরা জমীদারগণ ;
যারা মা সাধারণ লোক, পেতো না শোক,
সুখে কাট্‌তো তাদের জীবন । ৩ ।

মা লক্ষ্মী অবতীর্ণ—চিন্তাশূন্য—
ধান্যপূর্ণ থাক্তো ভবন ;
কে কখন্ রাজত্ব পায়, তাদের কি দায়—
হলেই হল উদর পূরণ ! ৪ ।

কর্ত্তো যে লড়াই ঝগড়া, রাজা রাজড়া,
রাজ্য নিয়ে হিঁদু যবন ;
না হ'লে ফসল নষ্ট চাষের কষ্ট
তাদের তাতে দায় কি এমন ! ৫ ।

জান্তো না উকীল মোক্তার, জজ ব্যারিষ্টার,
আইন কানুন রসুন সমন ;
ছিল না ছল্ চাতুরী জুয়াচুরী,
পাজুরি ফোর্জারি এমন ! ৬।
প্রবীণ লোক গাঁয়ে গাঁয়ে পঞ্চাৎ হ'য়ে
বিচার-দণ্ড কর্ত্তো ধারণ ;
নিখর্চায় ঘরে বসে অনায়াসে,
মিট্‌তো বিবাদ মনের মতন ! ৭।
এখন এই পোড়া দেশে কপাল দোষে
হয়েছে সব উল্টো ঘটন—
ছারপোকার বিয়েন্ মতন নিত্য-নূতন
আইনে দেশ হয় জ্বালাতন ! ৮।
জেলাতে রন্ মাজিষ্টর, ইনস্পেক্টর,
পুলিশের চর সাক্ষাৎ শমন,
জোরে কেউ হাইটি তুল্লে, গানটি ধর্লে,
ঢোলটি পিটলেও করে বন্ধন ! ৯।
পেনাল্‌কোড কথায় কথায় বেত লাগায় গায়,
ঘানি টানায় গরুর মতন,
বংশ-মান যার যা যেমন, জন্মের মতন
দাগ চড়ে তায়—হয় না মোচন ! ১০।
দেওয়ানি বিচার বিক্রী পেতে ডিক্রী
খরচাতেই যায় সর্ব্বস্ব ধন !
আবার তায় রাক্ষস আমলা, বাঁধলে মামলা,
সামলানো ভার ভিটে আপন ! ১১।
তাই বলি সোণার দেশে শাসন দোষে
ধনে মানে প্রজার মরণ—
একে তো রোগে জরা—ট্যাক্সে মরা—
মামলায় সারা সারা জীবন ! ১২।
দেশে নাই লাঠালাঠি কাটাকাটি
চোর-ডাকাতি আগের মতন ;
শাসক জাত করেন গর্ব—"তাঁরা সভ্য" !—
তবু পর্ব কেন এমন ? ১৩।

বলতে মা শঙ্কা করে—পাছে ধ'রে
জেলে পোরে চোরের মতন !
কিন্তু মা তোরে ভিন্ন কারে অন্য
বলবো মোদের হিদের বেদন ? ১৪ ।
দিশী লুট[১] গেছে উঠে সত্য বটে,
তার বদলে ইংলিশ্ ফ্যাসন্—
অসাড়ে জোঁকের মতন রক্ত শোষণ,
বিলিতি লুট্ চলছে এখন ! ১৫ ।
দিশী লুট্ চলতো যখন ভুগতো তখন
বড় জোর তায় বাছা কজন ;
বিলিতি জালের কাটি, কাংলা পুঁটি
সব বাঁধে—নাই কারোর মোচন ! ১৬ ।
প্রধান লুট্ দম্‌কা[২] কলে[৩]—যারে বলে
"হোম্‌চার্জ"[৪] আর "কণ্টি্‌বিউসন্ ।"[৫]
তা ছাড়া যোজন-যোড়া লম্বা তোড়া[৬]
সাহেব পাড়ার পেন্সন্ বেতন ! ১৭ ।
ম্যাঞ্চেষ্টার ধর্লে আবদার কাপড় সূতার
ডিউটি অমি হয় রেমিসন্ !
তাদের পেট পুরিয়ে তখন দেখছি এখন
আয়-করের দায় মোদের মরণ ! ১৮ ।
দুঃখী লোক নীল দাদনে জোর বাঁধনে,
ঘোর রোদনে কাটছে জীবন !
খাটছে মা, চা'র বাগানে আকুল প্রাণে
কুলিগণে দাসের মতন ! ১৯ ।
ফুরসৎ নাই হাঁফ্ ছাড়তে, ঘাম মুছতে—
প্যায়দা ফেরে পেছন পেছন ;
আ মরি ঘাড় ঘাড় মার্চ্ছে ছড়ি,
গরু তাড়ায় রাখাল যেমন ! ২০ ।
পাঁচ টাকা মাস মাইনা, তাও পায় না,
জরিমানায় অর্ধহরণ !
রোজের যে কাজ নিশানা, অসুর বিনা
কেউ পারে না মানুষে তেমন । ২১ ।

বলতে গা শিউরে ওঠে, ঘর্ম ছুটে—
পতির সামনেই পত্নী হরণ !
ক'রে এই ভীষণ কাণ্ড তবু ষণ্ড
পায়না দণ্ড পাপের মতন ! ২২ ।
হাকিম তার ফ্রেণ্ড ডিয়ার—হোয়াট্ ফিয়ার !
ডোণ্ট্ কেয়ার্ ড্যাম্ নিগারগণ !
স্বজাতি- পক্ষপাতী বিচারপতি
ধর্মের প্রতি অন্ধ-নয়ন ! ২৩ ।
ডিসিসন্ আগেই ধার্য—ফল্‌সো চার্জ—
ডিস্‌চার্জ তাই ডিয়ার বুল্‌জন্ ![৭]
বাদিনীর সব ফিরিবি[৮]—বেয়াদবী—
উল্টে তাই তার বেড়ি খাটন্ ! ২৪ ।
ধলো পা'র লাথির চোটে রক্ত ওঠে
কালো আদমি মরে যখন,
ব'লে মা পীলে ফাটা, চুকোয় ল্যাটা,
সাক্ষী স্বয়ং সিবিল্ সার্জন্ ! ২৫ ।
আবার মা, কথায় কথায়, ছুতোয় নতায়
গুলি চালায় যখন তখন—
নেটিভ্‌কে পশুজ্ঞানে ট্রিগার্ টানে,
তিলেক প্রাণে হয় না বেদন ! ২৬ ।
বিচারে বহ্বারম্ভ অশ্ব ডিম্ব,
দণ্ড পেয়ে হাস্য-বদন !
খুনের প্রুফ্ ধুনে ফেলে[৯] জুরির কলে,
য়্যাক্সিডেন্ট্ হয় নিরূপণ ! ২৭ ।
নয়তো হয় সাফাই জারি—"টেম্পোরারি
ইন্‌স্যানিটির ঝোঁকে তখন,
ছিল সে ইন্‌সেন্সিবল্—রেসপন্সিবল্
আইন মতে নয় তো সে জন !" ২৮ ।
অপূর্ব এই বিচারে, জামাই-আদরে
করে তারে ঘরে প্রেরণ ;
সরকারী খরচায় রঙ্গে, সেবক সঙ্গে
দেশে যায় সে রাজার মতন ! ২৯ ।

দিন কতক ম্যাড্‌হাউসে রেখে শেষে
ছেড়ে দেয় তায় দিয়ে পেন্সন !
এইরূপে ক্রীশ্চ্যান ধর্ম—বিচার-মর্ম—
দয়ার কর্ম্ম হয় সমাপন ! ৩০ ।
একচোকো এমন কার্য অনিবার্য
রাজ্যময় মা নিত্য ঘটন !
আর যে মা হয় না সহ্য, রয় না ধৈর্য—
যে কদর্য হচ্ছে শাসন ! ৩১ !
পক্ষপাত জবরদস্তি—লজ্জা নাস্তি—
মত্ত হস্তির মতন ধরন !
মানীর মান খামখেয়ালে, পায়ে দলে—
ধরা দেখে সরার মতন ! ৩২ ।
এমন যে অসামান্য, দয়া পূর্ণ,
তোর আটান্ন সালের ঘোষণ,[১০]
জনকত ষণ্ডা মিলে খ'ণ্ডে দিলে—
স্বজাত-স্বার্থ করতে সাধন ! ৩৩ ।
ভেবো না এই সব কীর্তি কর্চ্ছে নিত্য
ছুট্‌লে দলের বিট্‌লে কজন ;
দেখতে পাই তারাই কানাই তারাই বলাই,
তারাই গোঠে চরায় গোধন ! ৩৪ ।
যাঁরা তোর প্রধান নায়েব—কর্তা সাহেব—
কে দেখতে পায় তাদের বদন ?
কেবল মা, রিপণ ছাড়া তাঁদের সাড়া
কখনই মা পাইনি তেমন ! ৩৫ ।
তাই বলি, রাজ্যের মাথা হয়ে হেথা
আসেন যাঁরা কর্তে পালন,
কৈতে মা তাঁদের কথা পাই গো ব্যথা,
মুণ্ড মাথা যেরূপ শাসন ! ৩৬ ।
কেবল মা, স্বার্থ-পোরা সুখের পায়রা !
সখের ফয়রা[১১] তাঁদের জীবন !
কলকাতায় নামে ত্যক্ত, পাহাড়-ভক্ত
প্রজার দুখ্‌ আর দেখবেন কখন ! ৩৭ ।

একটু যেই গর্মি ফুটে অগ্নি ছুটে
সবাই জুটে সিমলে গমন ;
সঙ্গে লোক হাজার হাজার, উর্দু বাজার[১২]
ব্যাপার যেন বাদ্‌শার মতন ! ৩৮ ।

প্রজাদের রক্ত শুষে রঙ্গ রসে
ঘোর বিলাসে তথায় মগন !
এদিগে "দে কর দে কর" রব ভয়ঙ্কর
কর্‌ নিরন্তর কলেক্টরগণ ! ৩৯ ।

অষ্ট মাস কৃষ্ণলীলায়—রসের খেলায়
সিমলে যেন শ্রীবৃন্দাবন !
সঙ্গে সব বিড়ালাক্ষী, ধবলমুখী
রাসলীলায় মন করেন হরণ ! ৪০ ।

অপূর্ব কুঞ্জকানন বিহার-ভবন—
মর্ত্যে যেন ইন্দ্রভুবন ;
বঁধুয়া বধূ সনে মধুপানে
নিধুবনে মধুর মিলন ! ৪১ ।

হর্স্‌-রেস, ক্রিকেট খেলা দিনের বেলা—
নাটমন্দিরে নিশিযাপন !
ফুঁড়ে এই রং-তামাসা, আর কোয়াশা
উঠতে পায় না মোদের বেদন ! ৪২ ।

উঠলেই বা কি ছাই হবে—কে তা শুনবে ?
শোনবারই বা ফুর্সৎ কখন ?
যদিই বা পান ফুর্সৎ সকল হজরৎ[১৩]
রুস-কেরামৎ[১৪] দেখেন তখন ! ৪৩ ।

রুস যেন ক'রে হোর্মৎ[১৫] লোক জমায়ৎ
হিমাবত পার আসছে তখন ;
এই ভাবে সোর সরাবৎ[১৬] জোর জরাবৎ[১৭]
হয় তরিবৎ[১৮] ফৌজের চালন !* ৪৪ ।

* গানের রচনাকালে রুস-গোল অত্যন্ত বেশী—ফৌজ চালনা পর্যন্ত হইয়াছিল । ['মনোমোহন-গীতাবলী' গ্রন্থের পাদটীকা] ।

যদ্দিন এই মহাপ্রস্থান—সিমলা-পয়ান
সঙ্গে সৈনিক-অফিসারগণ,
তদ্দিন মা, ঘুসের জন্যে তাঁরা হন্যে—
হাইড্রোফোবির রোগীর মতন ! ৪৫ ।
সেই রোগে উঠে ঝোঁকে থেকে থেকে
আফগানিস্থান হয় আক্রমণ !
বৈজ্ঞানিক সীমানার ভান কান্দাহার চান,
হিরাট পক্ষেও বিরাট দমন ! ৪৫ ।
তারা নয় জোর কাঙালী ক্ষীণ বাঙালী—
নীচ্ উমিচাঁদ কুত্তার মতন !
তারা সব বীরের বাচ্ছা—স্বাধীন সাচ্চা—
হয় না তথায় দন্ত-স্ফুটন ! ৪৭ ।
কিন্তু মা, সেই হিড়িকে, লাখে লাখে
ধনে প্রাণে প্রজার পতন !
সে কথা ভাববে বা কে ? ওদিগে যে
রিওয়ার্ড আর পান প্রোমোসন্ ! ৪৮ ।
মাগো আর কত বলবো, কোন্ দিগ ধর্বো—
যেটি তুলবো সেইটিই ভীষণ !
বণিকদল লেলিয়ে দিলে, বর্মা নিলে,
খর্চা জোগায় অভাগাগণ ! ৪৯ ।
ধর্ম নাই বুঝলেম ধরায় নৈলে কি হায়
ভক্তের মর্ম পোড়ায় এমন !
আমরা মা শান্ত শিষ্ট অল্পে তুষ্ট—
অদৃষ্টে তাই কষ্ট লিখন ! ৫০ ।
যারা মা দ্রোহী দুষ্ট, ঘোর অশিষ্ট
স্পষ্ট দেখায় রুষ্ট বদন ;
কর্তে তায় অসন্তুষ্ট দিতে কষ্ট
সাহস পায় না শাসকের মন ! ৫১ ।
তোরে মা ভোগা দিয়ে শুনায় গিয়ে,
"রেলওয়ে আর শান্তিস্থাপন !
বিদ্যালয় কলকারখানা ব্যবসা নানা
তাইতে ভারত স্বর্গের মতন !" ৫২ ।

"ভারতের খুব উন্নতি !"—এই ভারতী
নিতি নিতি করায় শ্রবণ ;
কিন্তু সেই কলকারখানার কে মালিকদার ?
তাই কেন মা কর্‌না স্মরণ ! ৫৩ ।

পঙ্গপাল শ্বেতপুরুষে হেথায় এসে
গ্রাসে দেশের সকল সার ধন ;
প'ড়ে রয় যে খোসা ভূষি—আগড়া[১৯] ঘাসি
তাই খেয়ে রয় মোদের জীবন ! ৫৪ ।

হয় কি নয় সত্য কথা এসে হেথা
একবার কর্‌ মা নিজে দর্শন :
নয় তো কেউ তোর বিশ্বাসী দেখুক আসি
গুপ্ত ভাবে ক'রে ভ্রমণ । ৫৫ ।

"কমিসান্‌" বসাস্‌নে মা ! তার কাঁপে গা !—
লোক ভুলাবার ফাঁদ কমিসান্‌ !
আমরা তোর দুঃখী সন্তান কর্‌ পরিত্রাণ,
অভয় দে মা ধরি চরণ ! ৫৬ ।

['মনোমোহন-গীতাবলী'—১২৯৩ বঙ্গাব্দ]

টীকা

১ লুট্—লোকে যা যথেচ্ছায় গ্রহণ করে ।
২ দস্যকা—শক্তিক্ষয়কারী ।
৩ কল—কৌশল, ফিকির ।
৪ হোমচার্জ—Home Charge : ভারতবাসীদের শোষণ ক'রে সে-সময় ব্রিটিশ সরকার যে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করত তার একটা বড় অংশ হোমচার্জ বলে চলে যেত ইংল্যাণ্ডে । "The huge sums of money the British imperialists extorted in taxes went for both the maintenance of the colonial government and for direct transfers to England. Half of the budget revenue was spent on the colonial army and a third found its way to England in the form of the so-called "Home Charges".

দ্রষ্টব্য : 'Tilak and the Struggle for Indian Freedom' Edited by I. M. Reisner and N. M. Goldberg P. 320.

৫ কন্‌ট্রিবিউশন্—নানা অজুহাতে 'চাঁদা' ব'লে তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর কাছ থেকে বহু টাকা আদায় করত।

৬ লম্বা তোড়া—বিরাট টাকার তোড়া।

৭ বুল্‌জন—John Bull—ইংরেজ জাতি।

৮ ফিরিবি—ফেরেব—প্রবঞ্চনা।

৯ ধুন ফেলে—ছিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ নষ্ট ক'রে।

১০ আটান্ন সালের ঘোষণ—"রাণী ভিক্‌টোরিয়া তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘোষণায় [১ নবেম্বর, ১৮৫৮] জানিয়ে দিলেন যে ভারতবাসীদের ধর্মের উপরে অতঃপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না, এবং রাজ-সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োজিত করা হবে।" যোগেশচন্দ্র বাগল—'মুক্তির সন্ধানে ভারত'—পৃঃ ৬৭।

১১ ফয়্‌রা—ফোয়ারা।

১২ উর্দু বাজার—সেকালে বাদশাহের সৈন্যদলের সঙ্গে যে বাজার থাকত।

১৩ হজরৎ—মহাশয়, প্রভু।

১৪ রুস-কেরামৎ—উনিশ শতকের বিশেষ ক'রে শেষের দিকে ইংরেজদের দারুণ রাশিয়া-ভীতি জেগেছিল; তারা মনে করত আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে রাশিয়া ভারত আক্রমণ করবে। এই ভয়ে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ টাকা সৈন্য বিভাগের জন্যে ব্যয় করত।

১৫ হোর্মৎ—হুর্মৎ—আদেশ, বিশেষ করে অধিনায়কের।

১৬ সোর সরাবৎ—চিৎকার ও চিৎকারকারী লোক (সৈনিক)।

১৭ জোর জরাবৎ—বল ও বলিষ্ঠ লোক।

১৮ তরিবৎ—শিক্ষিত, trained.

১৯ আগড়া—বিভিন্ন বীজের খোসা।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৯০৩]

বাজিমাৎ

[কবিতাটি রচনার ব্যাপারে এই ঘটনাটি স্মরণীয় :—

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ ডিসেম্বর যুবরাজ—যিনি পরে সপ্তম এডওয়ার্ড হয়েছিলেন—কলকাতায় আসেন। সম্ভ্রান্ত বাঙালী ঘরের 'জেনানা' দেখবার জন্যে যুবরাজের ইচ্ছা হয়েছে জেনে তদানীন্তন জুনিয়ার গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাহাদুর যুবরাজকে ভবানীপুরে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁর পরিবারের মহিলারা যুবরাজকে অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার নিয়ে তখন হিন্দু-সমাজে খুব আন্দোলন হয়। তদানীন্তন সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লীডার নিষ্ঠাবান অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্রকে এ-সম্পর্কে কিছু লিখতে অনুরোধ করায় তিনি এই কবিতাটি রচনা করেন। এটি ১২৮২ বঙ্গাব্দের ৭ মাঘ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।]

বেঁচে থাকো মুখুর্যের পো, খেল্লে ভালো চোটে,
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে।
'ফিরু'[১] দানে এক তাড়াতে কল্লে বাজিমাৎ
মাছ[২] কাতুরে ভেকো[৩] হলো—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ!
সাবাস ভবানীপুর, সাবাস তোমায়!
দেখালে অদ্ভুত কীর্তি বকুলতলায়।
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে
পর্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে।
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা?
মুখুর্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা।
হরেন্দ্র[৪] নগেন্দ্র[৫] গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি।
ধন্য মুখুর্যের বেটা বলিহারি যাই
সস্তা দরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই!
ও যতীন্দ্র[৬] কৃষ্ণদাস![৭] একবার দেখো চেয়ে
বকুলতলার পথের ধারে কত শত মেয়ে—
কালো ফিকে গোর সোনা হাতে গুয়া পান
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান।
আসবে রাজা রাজপরিষদ্ লাটসাহেবের মেয়ে—
মারবেল্-মারা গিল্‌টি হলে একবার দেখো চেয়ে।
বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন,
বিষ্ণুপুরে মিন্সের দেখো বোড়ে টেপার গুণ।
ছিঃ রাজেন্দ্র! কাল কাটালে পুঁথি ঘেঁটে ঘেঁটে
শেষে আইনপেসার পেশকারিতে মানটা গেল ঘেটে।
ধন্য হে মুখুর্যে ভায়া বলিহারি যাই.
বড় সাপ্টা দরে সাং করিলে খেতাব সি-এস্-আই।

হেদে ও সহরবাসি, আর কি হাসি হাসাবো রেড়ো[৮] বলে
দেখ্‌না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রানীর ছেলে।
চৌঘুড়িতে[৯] সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব—
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বারটেল নায়েব।
আর কেনো লো, ঘোমটা খোলো, কবির কথা রাখো,
'লাইট' পেয়ে 'রাইট্' হয়ে পার হও লো সাঁকো।
ভয় কি তাতে, লজ্জা কি তায়, কালো বদন খানি
দেখবে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি।
কব্‌জা তুলে দেখবে বাজু, দেখবে কানের দুল,
দেখবে কণ্ঠী কণ্ঠহার পিঠের ঝাপা ফুল।
আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণচাপ—
শিবের বিয়ে নয় লো ইহা ধরবে নাকো সাপ।
এগিয়ে এসো বড় ঠাকরুণ সাত পোয়াতির মা,
তত্ত্ব পাবেন তোমার তিনি তাও কি জানো না?
সোনার থালে হীরের মালা তাতে ঢাকাই ধুতি,
নজর দিয়ে দেখাও খুলে বৌ বিননো পুঁতি।
বাহবা বুক,[১০] বুড়ো বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে
রাজ-পূজাটি কল্লে ভালো ফুলের মালা নিয়ে।
কোন্ শাস্ত্রে লেখে বলো বামনের মেয়ে হয়ে
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে।
(এখন) দাঁড়াও সরে বুড়ো দিদি হাসিল হলো কাজ,
দেখবো আমি ভালো করে আর এয়োদের সাজ।
আয় না লো সব একে একে গোলাপী কাঞ্চন
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘটকালী কেমন।
ভয় কোরো না একলা আমি দেখতে নাহি চাই,
রাজার ছেলের আব্‌ডালেতে উঁকি মারবো ভাই।
(আমি)—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে,
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে?
বলতে কথা বাছা বাছা কদম ফুলের ঝাড়
ঘেঁষে আসি রাজ কুমারে, ভাঙ্গলো কবির ঘাড়।
হীরার ঝলস সোনার কলস হাত ঝুমকার বোল
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি শাঁখের গণ্ডগোল।

বারানসীর খস্‌খসানি উঠলো মহা ধূমে,
বায়ুবেলেতে মজের ঠমক্ বাজলো ঝুমে ঝুমে।
কবি হৈল হতভোম্বা হিঁদুর পর্দা ফাঁক,
পালিয়ে যেতে পথ পায় না ঘোরে কলুর চাক।
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুন্য দিন,
বাঙ্গালী-কুলকামিনী হইল স্বাধীন।

সে নিশিতে কি সহরে কিবা পল্লিগ্রামে
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে।
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাহাটি
সারানিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি।
কহে কোন রাজনারী বিনায়ে বিনায়ে
শয়ন গৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে—
"খালি সাটিনের কাজ, ফেটিন্ হাঁকানো,
কেবল ছেলামবাজি[১১] লেবিতে[১২] বেড়ানো।
দিন রাত ঘুরে ঘুরে মরেন কেবল
ঘোড় দৌড়ে টাউন হলে মুড়িয়া মকমল।
ক্লাইব লাটের আমল হতে পেসা খোসামুদি,
তাতেও গলদ্ এতো—কি কবো লো দিদি!
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি,
চাঁদা দিতে চাঁদি ফাটে মনের গুড়ে বালি।"
শুনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান
কর্তাটি জানালা খুলে স্নিগ্ধ বায়ু খান।

অন্য কোন অট্টালিকা ভিতরে আবার
পতি পাশে কোন রামা করেন ঝংকার—
"পর্বটা কি শুনেছ তো, লজ্জা নাই মুখে
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে সুখে।
রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদ-মাখা হাত,
সাত পুরুষে সভা মোরা হলেম গুদামজাৎ।
পড়তে পারি, বলতে পারি ইংরাজী ভাষায়,
খিয়েটার বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায়।

এন্‌লাইটেন্‌ সবার আগে কর্তা বিলেত যান ;
তোমার গুণে, গুণমণি, হারালে সে মান।
পায়ে বুট, জোব্‌বা গায়ে, গলায় সোনার চেন,
তক্‌মাওয়ালা আরদালিতে হয় না শুধু ফেম্‌।
বাপ্‌-পিতামোর নামে খালি হয়নাকো রাজ ভেট,
টাইম্‌ পেয়ে রাইট্‌ নেলে হিট্‌ চাই স্ট্রেট্‌।
ধিক্‌ তোমারে ধিক্‌ সে তোমার হিরাল্‌ডরি বুক।
এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগি দিলে হুক্‌।"
খোঁটা খেয়ে অধো মুখে পতি তার চায়,
এইরূপ গঞ্জনায় সারা নিশি যায়।
বলে কোন ধনাঢ্যের অভিমানী নারী—
"বড় নাম বড় জাঁক বোঝা গেছে জারি।
দূর করে টেনে ফেল—টাকা দিও শয়ে
এ হিঁড়কে দাঁড়ালে না একটা কিছু হয়ে।
বাঁধা রোসনাই আলো সব কি গেল ফেঁসে,
রায়বাহাদুর নামটাও, ছি, না পাইলে শেষে!
সুযোগ বুঝে হুজুকে বামুন নাম কল্লে জারি,
তোমার কেবল আতসবাজি, মন্দ তুমি ভারি।"

জজের গৃহিণী কন—"ভ্যালা জজিয়তি,
নামে শুধু অনারেবল, পদ বিলায়তি।
ছোটলাটের আজ্ঞাকারী তোমা হতে দেখি
লক্ষ গুণ বড় লোক, বলো দেখি একি?
কুঠি নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়,
তোমার কোর্টের উকীল তোমাকে হারায়!
ছিছি ছিছি ছেড়ে দাও এমন চাকরি,
শুদু খালি মার্কা মারা পেয়াদার 'লিবরি'।
ভাবতেম বুঝি কেষ্ট বেষ্ট তুমি একজন,
জরাসন্ধ রাজা কিম্বা লঙ্কার রাবণ!
ওমা ওমা পোড়া ভাগ্য, উকীলের গুঁচা,
হাড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোছা"—

ব'লে ঠোনৃকা[১৩] মেরে জজ-মহিলা বারাণ্ডায় যান ।
মিত্র ভায়ার রাত্র শেষ ভাঙতে তার মান ।

পোনা পুঁটি খয়রা চেলা গিন্নি আর যত
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত ।
কেহ বলে—"আমার সে কর্তাটি মুৎসুদ্দি
ফ্যাটা[১৪] বেঁধে যান খালি এই বিদ্যা বুদ্ধি ।
বাপের কামানো টাকা বিলাতী চাটকে[১৫]
দিয়া নিজে জুজু হয়ে ঢোকেন ফাটকে ।
তাঁর টাকা তাঁর কড়ি তাঁরি লোকজন,
মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল[১৬] যবন ।
শেষে যবে "হোমে" যায় দু বছর পরে
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে ।
এই তো বল্লাম তার বিদ্যার ওজন,
তা হ'তে আমার আর কি হইবে, বোন ?"

বলে দালালের মাগ—"দালালি ব্যাপারে
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ রোজগারে ।
পেটেতে কড়িটি তার কাল আঁচড় নাই,
সে কেমনে রাজপুত্র আনে বলো, ভাই ?"

কাগজের এডিটারি ক'রে মরে যারা
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে কেঁদে সারা ।
"রাত্রি দিন এত খাটে হায় লো স্যাঙাৎ,
হপ্তায় মিনিট পাঁচ হয় না সাক্ষাৎ ।
এত লেখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে,
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে !"
কবি বলে, কামিনীরা কৃষ্ণনাম কর্
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর ।

ডিপুটির ভার্যা কন—"আমাদের তিনি
চৌকিদারি কাজে পটু, মফস্বলে 'গিনি' ।

সহুরে টাকার দরে চল্‌তা দেখি ভার,
বলবো কি লো ও লো দিদি অদৃষ্ট আমার।
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি,
সাত শ টাকা মাইনে হলে হদ্দ ঠাকুরালি।
মন্দ বড় তবু এতে চোখ রাঙানি কত!
ঘুঁটের ঢিপি ভাবে, দিদি, দেখিলে পর্ব্বত।
হতাম যদ্যপি কোন উকীলের মাগ
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ।"

সে রমণী বলে—"বোন এপিট ওপিট,
একই ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট।
যে টাকাটি মাসে মাসে করে উপার্জ্জন
চৌদ্দ ভূতে পড়ে করে অর্দ্ধেক ভোজন।
কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজ্‌লাসে এজ্‌লাসে,
তিন তেরোটি লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে।
বেশ্যার বেহদ্দ পেশা কথা বেচে খায়,
পদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায়।
আমি উকীলের মাগ কথা শোনো, বোন,
মুখুর্য্যের সঙ্গে কারো কোরো না ওজন।"

"বটে বোন, বটে বটে, মানি তোর কথা"—
ব'লে ধীরে ধীরে এক নারী আসে সেথা,—
"আমার কর্ত্তাটি দেখ সরকারি উকীল,
মুখুর্য্যের 'সিনিয়র' উকীল সিবিল্।
বয়েসও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে,
ছোট বড় কর্ম্ম-কাজ অনেক করেছে।
পাকা হিন্দু, প্রতি দিন দুর্গা নাম করে,
তবুও রাণীর ছেলে ঢুকলো না লো ঘরে।"

ডাক্তারের নারী কহে—"ভারি তো মর্দ্দানি
নাড়ী টিপে জারি কত, ঘরেতে শাসানি।
পারেন কেবল পাড়ায় পাড়ায় পিটিতে ধম্বল,[১৭]
মরণকালে শরণ 'চিবর' 'পাটিজ' সম্বল।

মরেন ঘুরে পথে পথে রোদে ধুঁকে ধুঁকে,
ঘরে শুতে এলে এবার খ্যাঙ্‌রা দেবো ঠুকে।"

কেরাণীর নারী যত পাঁদাড়ে[১৮] ফোঁপায়,
মাস্টারের মিস্‌ট্রেস্‌রা গোঁসা ঘরে যায়।
কবির ফিরিতে ঘরে হইল বড় দায়,
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়।
কান্তা আসি হাস্য মুখে বলে—"কই দেখি,
কি পাইলে কাব্য লিখে সোনা কিম্বা মেকি।
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারারাতি,
কালি ফেলে, কাগজ ছিঁড়ে, পুড়িয়ে মোমের বাতি।
শয়নে সোয়াস্তি নাই, বিরাম নিদ্রায়,
সাত রা কাড়ে সাড়া নাই রাত্রি বয়ে যায়।
দেও দেখি গুণমনি কি পেলে শিরোপা,
বুলুরিবন্, চাকি-চাকতি, কিম্বা জরির থোপা।"
"কবি কবে পায় কিবা, কি দেখাবে, ধনি ?"
না বলিতে রাঙ্গা ঠোঁট ফুলায়ে তখনই
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গর্‌গরিয়ে যায়,
ফাঁপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল্ ফ্যাল্ চায়।

[হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী— অশ্বিনীকুমার হালদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত—১৩০৬ বঙ্গাব্দ।]

টীকা—

১ ফিব্‌ —প্রেমারা নামক বিশেষ এক ধরনের তাস খেলার দান।
২ মাছ—প্রেমারার আর একটি দানের নাম।
৩ জেকো—হতবুদ্ধি।
৪ হরেন্দ্র—হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।
৫ নগেন্দ্র—ভারত সভার সভ্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৬ যতীন্দ্র—যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।
৭ কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণদাস পাল।
৮ রেড়ো—রাঢ়দেশবাসী।
৯ চৌঘুড়ি—চার ঘোড়ার গাড়ি।
১০ বুক—দুঃসাহস, উৎসাহ।

১১ ছেলামবাজি—তোষামোদ।
১২ লেবি—Lobby.
১৩ ঠোন্‌কা—আঙুলের ঠোকর, ঠোনা।
১৪ ফ্যাটা—ছোট পাগড়ী।
১৫ চাটকে—প্রতারককে ; চাট—প্রতারক।
১৬ কুঠেল—কুঠিয়াল, বড় কারবারী ; এখানে বিশেষ করে নীলকরদের বোঝানো হচ্ছে।
১৭ ধম্বল—ঢোল বা ঢ্যাড়া।
১৮ পাদাড়—ঘরের পিছন দিক, কানাচ।

সাবাস হুজুক আজব সহরে

[১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার রিচার্ড টেম্পলের সময় কলকাতা মিউনিসিপাল আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের ব্যাপার নিয়েই হেমচন্দ্র এই ব্যঙ্গকবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটির ঐতিহাসিক পটভূমিতে এই তথ্যটি স্মরণীয় ঃ—

"The constitution of the Municipal Government of Calcutta on an elective basis, must however be reckoned the most important of Sir Richard Temple's achievements. By Act IV of the Bengal Council for the year 1876, the justices handed over their administrative functions to a Corporation consisting of seventy-two Commissioners. of whom two-thirds were elected and the remaining third appointed by the Government." —H. E. H. Cotton : 'Calcutta Old and New'.—Calcutta. p. 233.]

ছেলাম টেম্পল্ চাচা[১] আচ্ছা মজা নিলে।
ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে মিউনিসিপাল বিলে।
ফ্যাক্‌ট বলি, সহর যুড়ে ভারি আড়ম্বর
অ্যাক্‌ট জারি হবে নূতন পয়লা সেতম্বর[২]।
বলিহারি সুবেদারি সুসভ্য কেতায়,
ভেল্কিবাজি ইংরেজের হদ্দ মজা হায়!

ফুরায় আগষ্ট নিশি একত্রিশা বাসরে,
সহরে পড়িল চব্ব,[৩] পর্ব ঘরে ঘরে।

শয্যা ছাড়ি রাতারাতি না হইতে ভোর
বাসাড়ে বাসিন্দা বেওয়া[৪] বেশ্যা করে সোর।
প্রাতঃকালে জারি হবে নূতন আইন,
ফ্রেমবাঁধা "ফ্রানচাইসে" নেটিব স্বাধীন।
কেরানী কারিন্দা ক্লার্ক মুৎসুদ্দি দেওয়ান
মোল্লা মুদি মিউনিসিপেল বেঞ্চে পাবে স্থান।
সহর যোড়া কলের কাটি নেটিব প্রজার হাতে,
দেখব জারী বাহাদুরী কল্য দিবা প্রাতে।
দর্প ক'রে দুপুর রেতে "ক্যাণ্ডেডেট্" যত
ব্যস্ত হয়ে বস্তা খুলে সজ্জা করে কত।
বর্নোদ বাবুর বাড়ি, টোটাবাতি[৫] জ্বলে,
গ্যাস-লাইটে ফাইন আলো আধুনী মহলে।
উকিল এটর্নি মুদি পোদ্দারের ঘরে
রেড়ির তেলে আলো জ্বেলে পিরান পোষাক পরে।
খোস পোষাকে সজ্জা করি বহাল তবিয়ৎ
স্বর্ণচাঁপা স্মরণ করেন সভ্য তরিবৎ।
দুর্গা, কালী, শিব নাম শিকেয় তুলে রাখি
সিদ্ধ হল ফুলকুমারী, কিরণময়ী ডাকি।
বিল্বপত্র বিনিময়ে "বটন হোলে" আঁটা
শ্রীমতীর কুন্তলের বাসি ফুলের বোঁটা।
হৃদ্দ জপ পদ্মমুখে গন্ধ শুঁকি সুখে
মন্দ যান "মৌনী শিয়াল" হ'তে, ছাতি ঠুকে।
কোন বা বাবুজী বালা-সহিত বাগানে
চক্ষু রাঙ্গা, উঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে।[৬]
চোগা, ঘড়ি, টুপি, ছড়ি টাঁকিয়া চাপকান
গড়াগড়ি পায়ে ধরি, নাছোড় বিবিজান।
ছাঁদন দড়ি বাহুলতা, ছেদন কঠিন,
বাবুজী ভয়েতে ভেকো, বদন মলিন।
দুঃখ দেখে মায়াবিনী বাঁধন দিল খুলে,
টপ্পা গেয়ে তেরিয়ান[৭] উঠিলেন ফুলে।
রুমালে মুছিয়া মুখ, ঝাড়িয়া চাপকান,
"দেহি পদপল্লব"—বলিয়া প্রস্থান।

কোথাও কর্কশ কথা, বিষম ব্যাপার,
কর্তাটি বলেন,—"খোঁপ, তলব রাজার।
প্রত্যুষে হাজির যদি না হইতে পারি
সর্বনাশ হবে, খোঁপ, পর্ব আজ ভারি।
দয়াল দাদা 'রয়াল' চড়ে যাচ্ছে করে জাঁক,
কম্বকৃতি,[৮] ওকৃত[৯] গেলো, তক্ত[১০] যাবে ফাঁক।"
ব'লে, আঁচল খুলে এক দাপটে পগার হল পার।
ঘোষজা খুড়া অবাক ভেবে ভোটের ব্যাপার।
পীরবক্স্, রাম গোবিন্দ, নব্য ভোটার যত,
"ফ্রান্‌চায়িসের" ফ জানে না, ভয়ে বুদ্ধিহত।
সারা রাত্রি বসে জাগে ভোটের রগড়ে,
হদ্দ তরিবৎ পায় মশার কামড়ে।
হগের হুক্‌ম[১১] শক্ত, সময় যদি বয়
চাবুকে করিবে লাল, সদা প্রাণে ভয়।
পরিবার পুত্র কন্যা হাহাকার করে।
সাবাস হুজুক আজ আজব সহরে!
সবাই তুফান[১২] ভাবে ভয়ে হবু থবু—
কবি বলে, "সাধন বিনে সভ্যতা কি কভু?"

'ভোটিং হলে" মিটিং এবার জোটে কত লোক,
কেহ গোরা, কেহ দুধে, কেহ কৃষ্ণ জোঁক।
বাঁকা টেরি, হাতে ছড়ি, এক মেটে গড়ন,
কামিজ আঁটা নধর বাবু, নাগর কোন জন।
কেহ বা দোমেটে গাঁদা, কেহ ঘেঁটুরাজ,
মাথা ছাঁটা মেইদি কেহ, কেহ সিমুল ভাঁজ।
গাড়ী গাড়ী নামে বাবু বণিক, কেরাণী,
কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাণ্ডিডেট্, ফ্রেণ্ডের কোম্পানি।
কেহ চড়ে জুড়ি ফেটিন, কেহ আপিস যানে,
কেরাঞ্চি[১৩] কাহারো ভাগ্যে কারো বা ঠন্‌ঠনে।
কেহ বা আড়ানি তোলা "ব্লাক বুটের" ছাল,
কারো শিরে "প্যারাসল্" বিবিয়ানা চাল।

"এল্‌বো" ঠেলে হলে ঢোকে সেথো লয়ে সাৎ,
ইংরেজী ধরনে গতি সাবাস্‌ ক্যাবাৎ !
"মার্চ" করে পিছে পিছে "ভোটার" ভায়ারা,
আগে আগে যষ্টিধারী পুলিস্‌ পাহারা।
কেঁদে বলে হুঁসিয়ার ভোটার সে কোনো
ছেড়ে দাও "দণ্ডবিধি", কাণ্ড কি তা শোনো।
ঘরে আছে পাঁচটি ছেলে, একা রোজগারী,
আমার ওপর বিনি দোষে "পওর" কেন জারি ?
"ফরেণ চিজ" চাই না বাবা ছেড়ে দাও যাই,
ঘরের খেয়ে বনের মোষ কি হেতু তাড়াই ?
তার সঙ্গে অন্য কেহ বলে কিন্তু হয়ে,
যমের ঘরে আমাদের কেন যাও লয়ে।
আমীর উজীর ওরা, কেহ বা মনিব,
ওদের সাথে পারবো কিসে আমরা গরিব।
ভোটের লড়াই এমনধারা আগে জানে কেটা,
তা হলে কি ধরা দিয়ে ভুগি এত লেটা।
কান্নাকাটি ঝটাপটি, কত করে সোর
"হগের" পুণ্যে কত পিণ্ড—পুলিসের জোর।
"ব্যাটন" গুঁতোর চোটে তোলে ভোটের কলে !
মর্ম "হীটে" চর্ম ফাটে, ভাসে ঘর্ম জলে।

বার খাড়া দুই দল "হলের" দুধারে।
মধ্যস্থলে মধ্যবর্তী "সাইন" হাঁকারে।[১৪]
"ইলেক্‌টর" "ক্যাণ্ডিডেট্‌" হবে জোঁকাজুঁকি,[১৫]
পল্লীবাসী "ফ্রেণ্ড"-দের গাত্র শোঁকাশুঁকি।
কোথায় ঈশ্বর গুপ্ত তুমি এ সময় !
চতুর রসিকরাজ চির রসময়।
দেখিলে না চর্মচক্ষে হেন চমৎকার
বঙ্গে গোগৃহ রঙ্গ,[১৬] বাঙ্গের বাজার।
কিছুকাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে,
"লিবার্টির" জন্ম দেখে কলম নিতে কেঁচে।

সাজাতে কতই রঙ্গে নব্যতন্ত্র সঙ,
তসর, গরদ, গজে[১৭] ঢালতে কত রঙ।

বলতে, কেমন পাকা গোঁফে কলপ শোভা পায়,
বলিহারি জরির টুপী বুড়োর মাথায়।

ঝুঁটিদার মোড়াসার[১৮] আহা কিবা ঘটা,
বায়াত্তুরে শিরে তাজ, কুরুক্ষেত্র ছটা।

ঘুনধরা বনেদি বুড়ো, শিরে ত্যাড়া টুপী,
লেস্-বসানো "বেলাক্ ক্যাপে" ঝোলে "শিরু" থুপী।[১৯]

অপরূপ শোভা আহা বাব্‌রি-ছাঁটা চুলে,
শ্মশাণশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভুলে।

সাম্‌লার সুকাঁণিস,[২০] মোড়াসার ফের,
মোগলাই ধুনুচির মাথা ভরা ঘের।[২১]

"ব্ল্যাক হ্যাট" "ফেল্ট্" টুপী, বোম্বেয়ে লণ্ঠন,
লাইন বাঁধা সারি সারি "জাইন"[২২] কেমন।

বাঙালী বাবুর সাজ আমার চোখে বালি,
নকলে মজবুৎ বঙ্গ, আসলে কাঙালী।

ফর্দ হাতে মধ্যাস্থলে মধ্যাস্থ দাঁড়ায়,
মেম্বর বাছনি হলে 'ব্যাটন্' হেলায়।

ভোটর ধরে "আস্ক্" করে, তুমি কারে চাও?
কোন জন বলে, সাহেব, ঐটি আমায় দাও।
কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্তি, বগলে যাহার,
এলেমভরা "ডি এল" মারা পছন্দ আমার।[২৩]

"রাহট্" বলে "ব্যাটন" তুলে বাছন্দার চায়,
"ইলেকটর" অন্যজনে ইঙ্গিতে সুধায়।
সে জন বলে, পরিপক্ক খাসা কালো জাম
"নিগর্‌কুলে" কালাচাঁদ ঐটি নেব হাম।
একতুরূপে টেক্কা মেরে "ব্যোম" করে বসেছে
"অম্বল"[২৪] থেকে "অনারেবল" আর কে অমন আছে?
হেসে পুনঃ "আপিসার" "ব্যাটন" ধরে তুলে।

বৈষ্ণব ভোটর বলে মনের কথা খুলে ;
আমি লবো রাঙ্গা ঐ মুরলী রসিক,
রসভরা মুখখানি, হাসি ফিক্ ফিক্ ।

মাথা ঘুরে পড়ে হেরে নয়নের ঠার,
অমন সুন্দর ছেলে কোথা পাবো আর ।

বলিছে ভোটর কোন ঐ যে ও সে রে,
ছাঁটা গোঁফ কাঁচা পাকা ঘটা করে ফেরে ।

দোহারা চেহারা খাসা, চোগা বুটিদার,
টাকার আঁওস উ-টি "ফণ্ডের" ভাঁড়ার ।

দানদার দাতা তবু "পর্স্" নহে "লুস্",[২৭]
ঈশপের উপন্যাসে ঐ যে "গোল্ড্ গুস্" ।

গিনি কাটা খাঁটি সোনা, আছে "টুরু রিং"
দেখে শুনে নিতে হলো "দ্যাট্ ঈজ্ দি থিং" ।

কেহ বলে আমি চাই ঐ সুব্রাহ্মণ,
পাকা দাড়ি সাদা চুল ঋষিটি যেমন ।

বিদ্যের জাহাজ বুড়ো, বৃদ্ধের নবীন,
খ্রীষ্টানের মুখপাৎ, চোখানো সঙ্গিন ।

আমার পছন্দ ঐ খৃষ্টভেকধারী,
সাপোর্টে দিলাম ভোট, জিতি আর হারি ।

"হোরা" দিয়ে হেনকালে ঢোকে দেখি "হল্"
ভঙ্গিতে বুঝিনু তারা উকিলের দল ।

চমকে চমক ভাঙ্গে "টিল্ট্"হতে নামি
"এক্ট্রেস" আটক করে দাঁড়াই গিয়া আমি ।

সকলের আগে এক মর্দ দিল সাড়া
দিগ্‌গজ ২ হাত যেন তালের কাঁড়ি খাড়া ।

আদ্‌পাকা চুলেতে তেড়ি বুরুসে বাগানো,
"পারফিউমে" ভরা কেশ, রুমালে ছড়ানো ।

সখের প্রাণ, সাদাসিদে, বলছে যেন হাসি—
"দেল্‌দারিতে" খ্যাতি আমার, আর সকলই বাসি ।

"সেকেন্" করে ছাড়ি তারে অন্য কথা নাই,
হীরে বাঁধা হৃদয়খানি, ঐটি আমি চাই।

এবার টিকিট হেরে হাসি নাহি ধরে।
লেখা তাতে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে,
গণিত গায়ক গাড়ী "চটকে মসূর",[২৬]
হিঁদুয়ানি হেকুমতে হদ্দ বাহাদুর।
বার মাসে তের পর্ব, বাই, খেম্‌টা নাচ :
"হেল্‌থ্‌" ভালো, চিরকাল ঢালাই করা ছাঁচ।
রাষ্ট্র জুড়ে "ফাস্ট" খ্যাতি, ডঙ্কা মারা নাম,
সর্বঘটে অধিষ্ঠান, বর্ণচোরা আম।

দুই "পাস" একেবারে শূন্যেতে উত্থান ;
এইবার রক্ষা কর মুস্কিলে আসান।
দুই বাঙ্গালে এক সঙ্গে "হলে" যেতে চায়,
কারে রাখি কারে ছাড়ি, পড়ি ঘোর দায়।
এক বাহাদুর "হস্কে" ভারী[২৭] বক্ষ[২৮] ফাঁপা পেট,
হাল্কা দেহ কণ্ঠিকাটী অন্য "ক্যাণ্ডিডেট্"।
ছিপ্‌ছিপে বাঙ্গাল বাবু রাগেতে ফোঁপায়,
নুদো পেটা ভুঁদো দাদা মজবুৎ কথায়।
রাকাড়ে রাকাড়ে ওঠে কন্দলের ঝড়,
হাঁকাহাঁকি চেঁচাচেঁচি, বেহদ্দ বেহড়।
বিদ্‌কুটে বাঙ্গালে গোঁসা বড়ই বালাই,
আহেলা বেলাতি[২৯] বোল্, আনকোরা ঢাকাই।
গরম গরম আচ্ছা রকম ইংরাজী ফোড়ন,
ভাস্‌চে তাতে সাধুভাষা মিষ্ট বিলক্ষণ।
ভোটিং গেল ভ্যাস্তা হয়ে, "ফ্রেন্‌সিপ্ কূল্",[৩০]
কাঁব বলে দুজনাই "ডাউন রাইট্ ফুল্।"
"অনর্" বজায় কত্তে হলে ঘুসি সাফাই চাই,
"ভল্‌গার্" ব্যবস্থা কেন কথার লড়াই ?

আলিপুর খুঁড়ি খুঁড়ি গাড়ীতে ছররাপ,
চোপদার,[৩১] চোপ্‌রাশি, ভৃত্য, কটিকসা ছাপ।[৩২]

পেগম্বর জমিদার খোঙ্ক[৩৩] রদি[৩৪] রাজা,
সিল্ক সাটিন গরদ চোলি চাপকানেতে ভাজা।
গলবস্ত্র সেক্রেটারি সাহেবানে ঘেরে,
"পাইমেণ্ট" পাস[৩৫] পাইতে দ্বারে দ্বারে ফেরে।
কেহ বলে খোদাবন্দ্ দুই লক্ষ আয়,
কেহ বলে "ভারত তারা"[৩৬] আমার গলায়।
কেহ বলে আমার "ফনে"[৩৭] ব্যাঙ্ক খাড়া আছে,
কেহ বলে "ফ্যামিন ফনে"[৩৮] অনেক টাকা গ্যাছে।
"মা বাপ" সাহেব তুমি রক্ষা কর মান,
নৈলে ঘরে ফিরে গেলে বোঁচা হবে কান।
অতি বৃদ্ধ পিতামহের খেলাৎ তুলে কেহ
বলে, সাহেব, সবার আগে আমার "পাস্" দেহ।
কেহ বলে, কৃষ্ণদাস আমার প্রতিবাসী,
খোদাবন্দ, ফেল্ করলে পাড়াশুদ্ধ হাসি।
মৌলভী বলেন, আমি মুসলমানের চাঁই,
হুজুর যেন ইয়াদ্ থাকে, বান্দার দোহাই।
নবাব বলেন, আমি নমুদী[৩৯] উজীর,
হকিয়তে[৪০] আমার হক্ ফিদবি[৪১] হাজির।
ফেসাদ করে, কত সেধে, মাথা কুটে, কেঁদে,
একে একে ফেরেন সবে জয়পত্র বেঁধে।

বাঙ্গালায় বন্দনীয় যত অবতার,
বলিহারি বঙ্গবাসী তারিপ তোমার।

নগর ভিতরে হেথা নাগরীর হাট
নবীন তরঙ্গ তুলে করে কত নাট।
বাছনি, "ভোটিং হলে," নাচনি পাড়ায়,
ব্যঙ্গভরা বামা সুরে শ্রবণ জুড়ায়।
বিবিয়ানা তেরিকাটা তরুণ তরুণী
তেফেরা সাড়ীতে বেড়া, গাজের উড়নি।
"বুজ্" মাথা মুখখানি, পাখা নিয়ে হাতে
গরবে গজেন্দ্রগতি ঘুরিছেন ছাতে।

উদ্দেশে কাহারো বলে ভালো বুকের পাটা,
মিউনিসিপেল কমিসনর হবে আবার সেটা।
মেগের হাতে রাঁড়া বুলি,[৪২] পেগের বড়াই খালি,
বাগিচা, বাগান, বোট নাই একটি মালী ;
সে আবার হইতে চায় ভোটের মেম্বার,
পোড়াকপাল, কালামুখ ধিক্ ধিক্ ছার।
বাড়ীর নিকট ছাতে, সাড়ী কালা পেড়ে,
আঁচলে চাবির থোবা ঝোলে গলা বেড়ে।
বসিয়া জনেক রামা "উলেন্" বিনায়,
সিঁথিতে সিন্দুর ছটা চাঁদের শোভায়।
শুনে কথা, মরালের মতো মাথা তুলে
বলে, হায়, হাসি পায়, যম আছে ভুলে।
কড়িতে কি জোটে মনে, বড়িতে খিচুড়ি,
গুড়েতে কি খাজা হয়, এক আঙ্গুলে তুড়ি ?
আঙ্গটি ঘড়ির চেন বানরে কি সাজে ?
আমার ভাতার হলে আমি পালাতাম লাজে।
হরপের এক অক্ষর যার ঘটে নাই,
সে হবে মেম্বর ! তার মেগের মুখে ছাই !

কোন গবাক্ষের কাছে রমণী আহ্লাদে
লক্ষ্য করি অন্য জনে কথা কহে ছাঁদে,
কিপ্‌টে ভাতার, কেয়া কাঁটা, কুমড়ো বলিদান,
মুখমিষ্ট মধুপর্ক সকলই সমান।

সে বলে তলানি[৪৩] জানি, পুরুষ বড় দাতা,
লম্বা কোঁচা পরের কাছে, ঘরে ছেঁড়া কাঁথা।

(বল্যে) পালটা গেয়ে আলতামাখা পা দুখানি তুলে
আয়না ফেলে জানলা দিয়ে চল্লো খোলা চুলে।

কবি কহে 'ফিমেল' বাছাই হয় যদি কখন,
বাছুনির বাহাদুরী দেখাব তখন।

পোলিং শেষে হাজরে ডাকা পরক ভারী দড়,
বাছাইকরা মেম্বরেরা কাউন্সেলে জড়।

কাগজ হাতে হগ্‌-বাবাজী হাকিম ধরন
একে একে ডাকেন সবে ত্যাড়া উচ্চারণ।
নবাব নমুদ আলি, খানসামা গোলাম,
রায় রাজেন্দ্র, শ্রীরাম ঘুগী :—উত্তর 'সেলাম'।
কুমার ভেকেন্দ্র কৃষ্ট, কানাই নাজির,
সাহেবজাদা সেকেন্দর :—উত্তর 'হাজির'।
নাপিত নদের চাঁদ, পদ্ম বাহাদুর,
ছিদাম মালী, শ্রীধর মুচী :—'হাজির হুজুর'।
রামভদ্র চেতলঙ্গী, নবি বর্কন্দাজ,
অনারেবেল শিষ্টদাস :—'গরি নমাজ।'
প্যাগম্বর সি এস্ আই, পরেশ তৈনৎ,
শ্রীরাম মস্তুফি হ্যায় :—"সাহেব দণ্ডবৎ।"
মৌলভী তালিম মিয়া, ইন্দ্রেন্দ্র পিরালী,
ঘড়েল সাবুই বাগ :—'হাজির হুজুরালি।'
ডিপুটি নফর বক্স, সৈয়দ নবিস্তে,
জো হুকুম শিরপ্যাচা :—আপ্‌কি ওয়াস্তে।

হাজ্‌রে ডেকে সাহেব গেল, যাত্রাভঙ্গ গোল,
হল্লা দিয়ে ছুটলো পাছে তবুই মাঝের 'শোল' ;
কোলাকুলি, গলাগলি, সেকেনের ধূম,[৪৪]
মিউনিসিপেল মঙ্ক দেখে আক্কেল গুড়ুম।

[হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—অশ্বিনীকুমার হালদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত—১৩০৬ বঙ্গাব্দ]

টীকা—

১ টেম্পল চাচা—স্যার রিচার্ড টেম্পল।
২ একট জারি…সেভম্বর—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের বেঙ্গল কাউন্সিলের ৪র্থ আইন। উপরের তথ্যটি দ্রষ্টব্য।
৩ চব্ব—ঢোল-শোহরৎ।
৪ বেওয়া—সন্তানহীনা বিধবা।
৫ টোটাবাতি—জ্বলিত বাতির শেষাংশ বা টুকরা।
৬ উঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে—সে-সময় ভোরে তোপ পড়ত।
৭ তোরিয়ান—তোরিয়া অর্থাৎ উগ্র মেজাজের লোক : উপহাসে—মর্দ।

৮ কম্‌বক্‌তি—হতভাগিনী।
৯ ওক্‌ত—সুযোগ।
১০ তক্ত—আসন।
১১ হগের হুকুম—Sir Stuert Hogg যিনি তখন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।
১২ তুফান—সংকট, বিপদ।
১৩ কেরাঞ্চি—মালপত্র বহার জন্য দুই বা চার চাকার গরুর, ঘোড়ার বা উটের গাড়ি।
১৪ 'সাইন হাঁকোরে'—যে ব্যক্তি মাঝখানে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ভোটারদের আহ্বান করত। হাঁকার—উচ্চৈস্বরে আহ্বান (<হুঙ্কার)।
১৫ জোঁকাজুঁকি—পরস্পরের শক্তির পরিমাপ। জোঁকা—মাপা।
১৬ গোগৃহ রঙ্গ—মহাভারতের কাহিনী, বিরাটপর্ব।
১৭ গজ—এক প্রকার পাতলা কাপড়।
১৮ মোড়াসা—সল্‌মা-চুম্‌কির কাজকরা কাপড়।
১৯ শিল্ক থুপী—সিল্কের থোপা বা গোছা।
২০ সুকাঁণিস—কাঁণিসের মতো সুন্দরভাবে ধার মোড়া।
২১ 'মোগলাই ধুনুচির মাথাধরা ঘের'—বড় পাগড়ীর মস্ত ধুনুচির মতো ঘের।
২২ 'জাইন্'—Join (?)
২৩ 'কেঁড়ে কেতাব উড়ে কীর্তি ·····আমার।' —রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। নির্বাচনে ইনিও একজন প্রার্থী ছিলেন। উড়িষ্যার পুরাকীর্তি সম্বন্ধে ইনি একটি বড় বই লিখেছিলেন—The Antiquities of Orissa. ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ নির্বাচনের এই বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকেই প্রথম ডি. এল্. অর্থাৎ ডক্টর অব্ ল উপাধিতে ভূষিত করা হয়।
২৪ অম্বল—Humble.
২৫ লুস্—Loose.
২৬ চটকে মসূর—বাহারী গোল বালিস ; মসূর—গোল বালিস বা তাকিয়া।
২৭ হল্কে ভারি—দেহের পরিধিতে ভারি।
২৮ বল্ক—বিপুল, Bulky.
২৯ আহেল বেলাতি—আহেল-বিলাত বা আহেলি-বিলাত—আসল বিলাতি বা সম্পূর্ণ বিদেশী অর্থাৎ দুর্বোধ। (<আরবি—অহ্‌ল্-ই-বিলায়ত)।
৩০ ফ্রেন্সিপ্ কূল—Friendship cool.
৩১ চোব্‌দার—রাজার বা ধনী ব্যক্তির বিশেষ ভৃত্য।
৩২ কটিকসা ছাপ—কটিতে বদ্ধ বা আঁটা ছাপ বা নিদর্শন, ধনী ব্যক্তিদের ভৃত্যদের কোমরে দেখা যেত।
৩৩ খোঙ্ক
৩৪ রদি
—শব্দ দুটি সমার্থক, অর্থ নগণ্য।
৩৫ পাইমেন্ট পাস—Payment Pass. জমিদাররা খাজনা দিয়ে সরকারের কাছ থেকে যে 'পাস' বা ছাড়পত্র সংগ্রহ করতেন।
৩৬ ভারত-তারা—বিশেষ সম্মানসূচক Star of India.

৩৭ ফন্ড্—Fund.
৩৮ ফ্যামিন ফন্ডে— Famine Fund-এ।
৩৯ নমুদী—সম্মানী, বিখ্যাত।
৪০ হকিয়ৎ—স্বত্ব, অধিকার।
৪১ ফিদ্‌বি—প্রভুভক্ত ভৃত্য।
৪২ রাঁড়া বুলি—কেবল একগাছি বুলি।
৪৩ তজ্জানি—ভিতরের অর্থাৎ আসল কথা।
৪৪ সেকেনের ধুম—সেকেন—Hand shake.

হায় কি হলো?

[সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা এই কবিতাটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়।]

১

হায় কি হলো?—কলম ছুঁতে হাসি এলো দুখে!
ভেবেছিলুম মনের কথা লিখবো ছাতি ঠুকে।
এলো হাসি—হাসিই তবে ঢেউ খেলিয়ে চ'লে
ছড়াক্ খানিক রসের কথা—"হায় কি হলো ব'লে!"

২

হায় কি হলো দেশের দশা রিপণ রাজার ভুরে?[১]
সাদা কালার সমান হবে,—সবার মুণ্ডু ঘুরে।
আসল কথা রইল কোথা, কেউ না সেটা খোঁজে;
কথার লড়াই, কথার বড়াই,—হাওয়ার সঙ্গে যোঝে!
সফেদ্ কালা মিশ্ খাবে না,—সমান হওয়া পরে।
নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুললে উঁচু ক'রে!

৩

হায় কি হলো পেটের কথা বেরিয়ে গেল কত !
ইস্তক সে লাট টম্‌সন্[২]—বেরাল ইঁদুর যত,
"রাষ্ট্র ক'রে ব'লে দিলে গুপ্ত প্রেমের কথা"[৩]
উচ্চ পায়া নেটিভ্‌দিগের সেটা কথার কথা !
ধর্ম্ম ভীতু এদিশীও তাদের ভিতর ছিল,
স্পষ্ট কথা ব'লে দিয়ে "পুরস্কারি" নিল !

৪

হায় কি হলো—কত লোকের ভ্রমটা গেল ঘুচে,
বিলেত ফেরা এদেশীতে প্রভেদ নাইক ছুঁচে ;
যতই বলুন, যতই শিখুন তাদের চলন্ চাল,
ইংরেজেরা ভোলে না তায়, হায় রে কলিকাল !

৫

হায় কি হলো—কপাল পোড়া, উমেদারের পেসা,
পড়লো চাপা জাঁতার তলে—সাহেব বড় গোসা !
অন্ন গেলো বাঙালিরই, আর কি হলো তায় !
এ পোড়া ছাই "ইল্‌বার্ট বিল্"[৪] কেন হায় হায় !

৬

হায় কি হলো দেশের দশা বিলেত গেলে রমা
তিন দিন না যেতে যেতে খ্রীষ্ট ভজে, ওমা !
পুরুষ পাছে মেয়ে আগে, সুফল তাতে ফলবে না,
চাই এদেশে আর কিছুদিন এ দিশী 'জানানা' !

৭

হায় কি হলো কথার দোষে সুরেন গেলো জেলে ![৫]
ইংলিশম্যানে 'কন্‌টেম্পট্' ও 'সিডিশন্' চলে ?
আহেল্ বেলাত নরিস্ সাহেব[৬] ধর্ম্ম অবতার
দেশের ছেলে খেপিয়ে দিয়ে ক'ল্লে একাকার !
ফিন্‌কি ছুটে ভারত জুড়ে আগুন গেল লেগে ;
হায় কি হলো—ছেলেগুলো পুলিস দিলে দেগে !

৮

হায় কি হলো বঙ্গদেশের কপাল গেলো ফিরে
গুলি পুরে গোরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাকপুরে।
আসছে সুরেন ঘরে ফিরে—এই তো কথা সাদা,
এতেই এতো আড়ম্বরি? ইংরেজ কি গাধা!

৯

বোঝে যারা "হায় কি হলো" তাদের কাছেই বলি,
"ন্যাসনেল ফনের" ব্যাপারটা[৭] নয় কি ঢলাঢলি?
পরের অধীন দাসের জাতি "নেসন্" আবার তারা!
তাদের আবার 'এজিটেসন্'—নবুন উঁচু করা!

১০

হায় কি হলো, দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে,
পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারতরাজা পরে।
সবাই 'লীডর'—কর্তা স্বয়ং আপনি বাহাদুর,
কতই দিকে তুলছে কতো কতই-তরো সুর!

১১

হায় কি হলো—আকাল এলো আবার ধ্বজা তুলে,
রাজার পুণ্যে প্রজার কুশল—লেখাই আছে মূলে;
হায় কি হলো তাদের আবার—অন্ন যাদের ঘরে,
জমিদারের গলা টিপে সত্ব চুরি করে!
"টেনেন্সি বিল"[৮] নামে আইন হচ্ছে তৈয়ার করা,
গয়া গঙ্গা গদাধর ভূস্বামী প্রজারা!

১২

হায় কি হলো—বঙ্গদর্শন বঙ্কিম দেছে ছেড়ে,[৯]
হায় কি হলো—দেশটা গেছে সাপ্তাহিকে জুড়ে!
হায় কি হলো—ভুদেব গেলো ছেড়ে গুরুগিরি![১০]
হায় কি হলো—হেম নবীনের নাইকো জারিজুরি!

১৩

সবার চেয়ে হায় কি হলো, ওই যে হাসি পায়,
"হেষ্টি পিগট" মিষ্টিকথা—"মিষ্টেরি" তলায় !
কি কাণ্ডটা ছি ছি ছি ছি 'ন'জ্জার কথা বড়,
পাদরী হয়ে উভয় দলে—রগড় এত দড় ?

১৪

হায় কি হলো—আধখানা মাঠ জুবার্ট নেচে ঘেরে,
বিষয়টা কি বুঝতে নারি কাণ্ডখানা হেরে।
আদ্দেক্ বাড়ি সহর মাঝে হচ্চে মেরামৎ ;
শুনতে ভালো 'এক্‌জিবিসন্' - এক জনার কিসমৎ ![১১]
দেশের শিল্প কারিগুরি শিখবে বিদেশীরা—
অন্নাভাবে দুদিন বাদে মরবে এদেশীরা !
হাসবো কত 'এক্‌জিবিসন্' দেশের ভালো করে !
খেতে অন্ন নাইকো যাদের একি তাদের তরে ?

১৫

হায় কি হলো - দাঁড়াই কোথা ? —ইংরেজে ইংরেজে
তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে – সবাই মল্ল সাজে !
বলছে যত 'কলোনিরা' আমরা হিস্যে চাই,
অষ্ট্রেলিয়া ভাগ বসাবে অন্য কথা নাই।
এদিশী ইংরেজ যত বাঁধছে সবাই দল,
রাখবে ভারত নিজের হাতে দেখিয়ে বাহুবল !
ইংলিশম্যানে ফরেল সাহেব কচ্চে কম্যাণ্ডারি,
পেছন থেকে পাইওনিয়ার হাঁকছে হাওলদারি।
বাপ্‌রে বাপ্ কি চেহারা 'ভলাণ্টিয়ারগণ'
দাঁড়িয়ে গেছে সঙ্গিন হাতে—কাঁপছে কলাবন !
আর কি থাকে রাণীর রাজ্যে ? নীলকর, চা-কর,
সঙ্গিন খাড়া দিচ্চে সাড়া উঁচিয়ে হাতিয়ার !
ছেড়ে দেবে ছর্‌রা-ভরা পাখীমারা 'গন্'—
উড়ে যাবে দু লাখ সেপাই, আর্মি, সেলর্‌গণ !

তাই তো বলি হায় কি হলো—রাজা আলমগির,
একেই বলে দেশোন্নতি—সাবাস বলিহারি!
বুঝবে যদি 'হায় কি হলো' পয়সা কটি দিও,
যত্ন করে বঙ্গদর্শন কাগজখানি নিও।

[হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—অশ্বিনীকুমার হালদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত—১৩০৬ বঙ্গাব্দ]

টীকা—

১ 'রিপণ রাজার ভুরে'—ভুর = চাতুরী, কৌশল। এখানে এই তথ্যটি স্মরণীয়: "১৮৮১ অক্টোবর ও ১৮৮২ মে মাসে সপারিষদ বড়লাট [লর্ড রিপণ] জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার ক'রে এক রেজলিউশন্ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলে ১৮৮৫ সালে বঙ্গে 'লোকাল সেল্ফ্ গভর্ণমেণ্ট অ্যাক্ট্' বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাস হয়ে যায়।" [—যোগেশচন্দ্র বাগল—'মুক্তির সন্ধানে ভারত'—৩য় সং, পৃ-১২৭]। কবিতাটি লেখার সময় সিদ্ধান্তের কথা প্রচারিত হয়; তখনও আইন পাস হয় নি।

২ লাট টম্‌সন্—ছোট লাট স্যার রিভার্স্ অগাস্টাস্ টম্‌সন্ (১৮৮২—৮৭); অন্যান্যদের সঙ্গে ইনিও তখন ইল্‌বার্ট বিলের চরম বিরোধিতা করেন।

৩ 'রাষ্ট্র করে বলে দিলে গুপ্ত প্রেমের কথা।'—ইল্‌বার্ট বিল প্রসঙ্গে তখন অনেক ইংরেজেরই মনের মধ্যে লুকিয়ে-থাকা স্বার্থ ও ভারতীয়-বিদ্বেষ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

৪ ইল্‌বার্ট বিল—সে-সময় দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা সেসন্ জজ্ ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় কোনো ইউরোপীয়ের বিচার করতে পারতেন না। বিচারের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূর করার জন্যে লর্ড রিপণ তদানীন্তন আইন-সচিব স্যার কোর্টনি ইল্‌বার্টকে দিয়ে একটি আইনের খসড়া তৈরি করান। তাই বিল্‌টি ইল্‌বার্ট বিল নামে পরিচিত হয়। ছোটলাট টমসন থেকে শুরু করে অনেক ইংরেজ তখন এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৮৮৩, ২৮ জানুয়ারী যে সংশোধিত রূপ নিয়ে বিল্‌টি পাস হয় তাতে এ-দেশবাসীর বিশেষ কোনো লাভ হয় নি।

৫ 'সুরেন গেল জেলে'—আদালত অবমাননার জন্যে ১৮৮৩, ৫ মে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু মাস কারাদণ্ড হয়।

৬ নরিস সাহেব—হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি। এক মোকদ্দমার বিচারের সময় ইনি আদালতে শালগ্রামশিলা আনিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে দেশবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলী পত্রিকায় এর তীব্র সমালোচনা ক'রে দু মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। বিশেষ করে দেশের

ছাত্র-সমাজ সেদিন দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। বিচারের দিন তারা ধর্মঘট ক'রে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (তখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র) নেতৃত্বে হাইকোর্ট প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়।

৭ 'ন্যাসন্যেল ফনের ব্যাপারটা'—কংগ্রেসের জন্মের আগে ভারতসভা এ দেশ-বাসীর প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তার জন্যে দুটি জিনিষের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়—এক, একটি 'ন্যাসনাল এসেম্ব্লি' এবং দুই একটি 'ন্যাসনাল ফণ্ড' বা জাতীয় ধনভাণ্ডার।

৮ টেনেন্সি বিল্—প্রজাদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার নিবারণের জন্যে এই সময় টেনেন্সি বিল্ তৈরি করা হয়: এটি Tenancy Act নামে পাস হয় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

৯ 'বঙ্গদর্শন বঙ্কিম গেছে ছেড়ে'—এই সময় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হয়েছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১০ 'ভুদেব গেল ছেড়ে গুরুগিরি'—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শিক্ষা-বিভাগের চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে ভুদেব মুখোপাধ্যায় কয়েক বছর কাশীতে কাটান।

১১ 'শুনতে ভালো এক্‌জিবিশন্…' ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

"নেভার্-নেভার্"

[কবিতাটি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইল্‌বার্ট্ বিল্ উপলক্ষ্যে লেখা। ইল্‌বার্ট্ বিল্ প্রসঙ্গে আগের কবিতার ৪নং টীকা দ্রষ্টব্য।]

১

গেল রাজ্য গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,[১]
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌শন্ কেশুয়িক্ মিলার —
"নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার্-নেভার্!"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান্,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা ?
বিবিজান্! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না।

হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে
সয়া ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিবে কাছে হবে ?—"নেভার্ নেভার্" !'
"নেভার্"—সে অপমান, হতমান বিবিজান্,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা :
দেহে প্রাণ, বিবিজান্ ! কখনো তা হবে না।

২

কাঁপিল মেদিনীতল, ধরা যায় রসাতল,
অস্ত্র ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে ভলেণ্টিয়ার ছুটেছে,
কাগজ কলম ধরে কামিনীরা উঠেছে !
হুরে হিপ্ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডাম-এভার্"।

৩

বিলাতি বৃষের রব কামিনী ক্ষেপিল সব,
বল্লভের কাছে গিয়া কানে দিল পাক,
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দ ভরে
ডাকিল বৃটিশ-বৃষ গাঁক গাঁক ডাক।
হুরে হিপ্ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম এভার্"।
"নেভার্"—সে অপমান, হতমান বিবিজান
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা।
দেহে প্রাণ বিবিজান্, কখনো তা হবে না।

৪

আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই সিন্ধুপারে চলে যাই
সেখানে 'লিবার্টি হল' আমাদের সভা,
পাত্র মিত্র যতজন সকলেই গবা।
বুঝাইব খাঁটি হাল্ আছিলাম এত কাল
হিন্দু দেশে ভালোবেসে হিন্দুর সন্তানে,
সিংহ যেন মৃগ কোলে স্বর্গের উদ্যানে !

লাথি কিল পটাপট্, জুতো চড় চটাচট্
লিভার পিলে ফটাফট আপনি যেত ফেটে,
আমরাই করুণায় মলম মাখায়ে গায়
রাখিতাম কোলে ক'রে হিন্দুর সন্তানে—
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের উদ্যানে!
হুরে হিপ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার্" ।

৫

হুঁসিয়ার ইল্‌বার্ট দেখো হে রিপণ লাট—
সাহেব রক্ষণীসভা সংগঠিত হয়েছে ।
দুপেঁচ তেপেঁচ মিলে লক্ষ টাকা দেছে তুলে
চামড়া কটা কতগুলা এম্‌ফিবিয়স্[২] জুটেছে ।—
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে,
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা?
আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই সবরঙা ডাকে সবাই—
সিন্ধু পারে দেখে আসি ইংরেজের সভা ।
পালে ঢুকে মিশে যাবো আন্দ্রু পিন্দ্রু নাহি রবো
সিংহদলে স্থান পাবো বেছে নেবে কেবা!
হুরে হিপ্ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
এদিশী "বৃটন" মোরা গোরাদের ব্যাটা!

৬

"জয় জয় বৃটনের" জগৎ পেয়েছে টের—
ভারত উদ্ধার হবে আমাদের "মিশনে" ।
সে বাসনা যত কাল পূর্ণ নহে, তত কাল
আমরা থাকিব হেথা কি করিবে রিপণে?
ভারত উদ্ধার হবে আমাদেরি "মিশনে"!
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে
বেড়াব শিকার ধরে যেথা পাবো ভুবনে—
কি করিবে আমাদের "টেরেটর্" রিপণে!*

শত্রু যদি করে গোল, ধরিব বৃষভ বোল্
উচ্চ তানে শুনাইব নিছক খেউড় !
সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি,
লাঙ্গুলে বেঁধেছ ভালো সভ্যতা নেবুড় !
হুরে হিপ্ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ,
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম এভার"।
হুরে হিপ্ — হিপ্ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে, তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে ?—"নেভার নেভার্"

৭

কলরবে কুতূহলী নেটিবের দল
জন্বুলে[৪] দেখাইল শিং ভাঙ্গা কল।
দেখাইল বাড়ী গাড়ী জুড়ী বাছা বাছা,
"ম্যাঙ্গো ফিশ্" মনোহর আনন্দের খাঁচা।
ছড়া ছড়া পরিপক্ব তাজা মর্তমান
দেখিলে ইংরেজ যাহে সদা মুগ্ধপ্রাণ।
দেখাইল রত্নগর্ভা বাঙ্গালার সুবা
মাদ্রাজ বোম্বাই দেশ চক্ষু মনোলোভা।
রত্নমঞ্চ 'রেসিডেন্সি'[৫] দেখাইল কত,
জ্বলিছে ভারত জুড়ে মানিক পর্বত,
চলেছে তাহার তলে এদেশী রাজারা
পৃষ্ঠপরে শ্বেতকায় রাণীর প্রজারা !
হুরে হিপ্ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম এভার্"।

৮

হঠাৎ পড়িল ডাক সামাল সামাল।
বলি শোন্ ওরে ভাই ইংরেজ ছাবাল—
এ রাজত্ব ছেড়ে আর কোথা যাবি বল ?
চিরশিক্ষা বৃটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাবো—টুট্ টুট্ টুট্ !

ধূপছায়া ভায়ারা[৬] সবে শোনো তবে বলি,
আরমেনিয়া যাও হে কেহ, কেহ চুনাগোলি।
স্পষ্ট কথা বলা ভালো বিঘ্ন বড় ভারি—
'মিল্চ্ কাউ' ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি।
সবাই মিলে 'অ্যা হেম্' বলে পকেট পানে চায়,
উচ্চ তানে ধীরে ধীরে হাম্বা সুরে গায়—
হুরে হিপ্ হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ,
বৃটন স্বাধীন সদা হেথা "ফরেভার্"।
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হেথা ছেড়ে যাবো ফিরে ?
"ড্যাম্ দি নেটিব বিল্—নেভার্ নেভার্" !

[হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—অশ্বিনীকুমার হালদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত—১৩০৬ বঙ্গাব্দ।]

টীকা—

১ ইংলিশম্যান—সেকালের একটি বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা ; বিভিন্ন ব্যাপারে ইংরেজ-পক্ষ সমর্থন করাই ছিল এর প্রধান কাজ।

২ এম্ফিবিয়াস্—এখানে ফিরিঙ্গিদের amphibious বা উভচর বলা হয়েছে।

৩ 'টেরেটর' রিপণে—ইল্বার্ট্ বিলের মূলে ছিলেন লর্ড রিপণ ; তাই ইংরেজদের কাছে তিনি traitor বা বিশ্বাসঘাতক।

৪ জন্বুল—সেকালের ইংরেজ পক্ষ সমর্থনকারী পত্রিকা,—১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এটি 'ইংলিশম্যান'-এ রূপান্তরিত হয়।

৫ রেসিডেন্সি—ইংরেজ শাসকের বিশেষ ক্ষমতাপন্ন প্রতিনিধির বাসস্থান বা তার শাসিত এলাকা—ভোগবিলাস আর অন্যায়ের স্বর্গ।

৬ ধূপছায়া ভায়ারা—ফিরিঙ্গি-গোষ্ঠী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪০-১৯২৬]

ইঙ্গবঙ্গের বিলাতযাত্রা

[১২৮৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলাত যান তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ এই কবিতাটি তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। শিখরিণী ছন্দে রচিত এই কবিতায় নব্যবাঙালীর বিলাতযাত্রাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই : "এই কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পড়তে পারো, তাহলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে।"]

বিলাতে পালাতে ছটফট্ করে নব্য গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগবিহগপ্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজনবশে কিচ্ছু হয় না—
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহণে মান রয় না।
পিতা মাতা ভ্রাতা নবশিশু অনাথা ছুট কোরে
বিরাজে জাহাজে মসিমলিন কোর্তা বুট পোরে।
সিগারে উদ্গারে মুহু মুহু মহা ধূম-লহরী,
সুখ স্বপ্নে আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি।
ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে—
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।
বিহারে নীহারে বিবিজনসনে স্কেটিং করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিরে এসে দেশে গলকলর (collar)-বেশে হট্‌হটে—
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগতনু দেখে বড় চটে।
মহা আড়ী শাড়ী নিরখি, চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে,
দুটা লাথে ভাতে ছর্‌কট করে আসন পিঁড়ে।

[কবিতাটি প্রথম ছাপা হয় ১২৮৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের 'ভারতী' পত্রিকায়; পরে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর পত্র' এবং সত্যেন্দ্রনাথের 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। এই দুটি গ্রন্থে কবিতাটির পাঠে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। ''য়ুরোপযাত্রীর পত্র'-এর পঞ্চম পত্রে কবিতাটি যে ভাবে ছাপা হয়েছে এখানে সেই ভাবেই উদ্ধৃত হল।]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ [১৮৪৪-১৯১২]

গান

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনের সংশোধিত রূপ 'বহুৎ আচ্ছা'-র জন্য গিরিশচন্দ্র যে পাঁচটি গান লিখে দেন এটি সেগুলির একটি।]

সিন্ধু-ভৈরবী—জলদ একতালা।

স্ত্রী। নাক কাণ ম'লে ছাড়ো সাহেবয়ানা,
চলিতে ব'ল না আর বিবিয়ানা,
রয় সয় যেটা কর যদি তাই,
শুন গুণমণি, তবে ঘরে যাই।
পু। তাই হবে তাই—
দেখো প্রিয়ে নাককানমলা খাই ॥
স্ত্রী। ইংরিজি বুলি যদি না চালাও,
ডাল-ভাত যদি টেবিলে না খাও,
ফিরি ঘরে তবে, নয় তো পালাই,
পু। তাই হবে তাই—
দেখো প্রিয়ে দেখো তোমারি দোহাই ॥
স্ত্রী। শাড়ী প'রে এলে যদি নাহি চটো,
পু। আজ্ঞে না,
স্ত্রী। ছেলে কোলে দেখে যদি নাহি হটো ;
পু। তা-তা-তা-বলছি তা—
স্ত্রী। ধুতি প'রে যদি চাল করো খাটো,
নয় তো উধাও—চরণ চালাই।
পু। ঘুচেছে বালাই—
এই মাপ চাই—এই মাপ চাই ॥
স্ত্রী। বলো নাকো আর হিষ্টিরিয়া হ'তে,
পু। আবার—ঝকমারি !
স্ত্রী। লাভ্ লাভ্ বুলি ছাড়ো দিনে রেতে,
পু। একদম—দিব্যি তোমারি।
স্ত্রী। যদি না শিখাও অধঃপাতে যেতে,
ঘরে যাবো—নয় সট্‌কাবো সাফাই।
পু। নাকে-কাণে খৎ—শিখেছি সবাই ॥

—['গিরিশ-গীতাবলী'—১৩১৪ বঙ্গাব্দ]

হারাণচন্দ্র রাহা [?—?]

আমি ত হব না বিবি এ প্রাণ থাকিতে

"কোন বাঙ্গালী যুবক বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ভার্যাকে বিবি সাজিতে বড় জিদ্ করেন, তাহাতে সেই যুবতী আদর ও খেদ মিশ্রিত স্বরে নিম্নলিখিত ভাবে বলিতেছেন—"

১

আমি ত হব না বিবি এ প্রাণ থাকিতে,
পড়িতে ইংরাজী বই,
আপত্তি করেছি কই ?
শিখেছি তোমার তরে কার্পেট বুনিতে,
শিখিয়াছি চিত্রকার্য তোমারে তুষিতে !

২

আমি ত হব না বিবি থাকিতে এ প্রাণ,
কেমনে হোটেলে যাব,
কেমনে টেবিলে খাব ?
কেমনে সহিব বল পিঁয়াজের ঘ্রাণ ?
হায়, বাবু, তুমি বড় কঠিন পরাণ।

৩

আমি ত হব না বিবি যাবৎ জীবন,
কেমনে ঘোমটা খুলে,
লাজ লজ্জা সব ভুলে,
করিব পরের সনে বাক্য আলাপন ?
শরমে যে মরে যাই ভাবিতে এমন !

৪

আমি ত হব না বিবি তোমার পীড়নে,
আপনি সেজেছ বেশ,
পরেছ ফিরিঙ্গী বেশ,
ফিরিঙ্গিনী আমি কভু হব না জীবনে,
এমন ঢাকাই শাড়ী ভুলিব কেমনে ?

৫

কোন্ দুঃখে বাঙ্গালিনী হবে ফিরিঙ্গিনী ?
ত্যজিয়া শাড়ীর মায়া,
পরিবে চাঁদনীর সায়া ?
কোন্ দুঃখে হবে চুণাগলি নিবাসিনী ?
বঙ্গনারী চিরকাল রবে বাঙ্গালিনী।

৬

জানে নাকি বঙ্গনারী রাঁধিতে ব্যঞ্জন,
যবনের হাতে তবে
কোন্ দুঃখে খেতে হবে ?
কোন্ দুঃখে শুঁটকি মাছ করিব ভোজন ?
বাজারে কি তাজা মাছ মিলে না এখন ?

৭

তুমি বল মাংসাহারী জাতি বলবান।
যে আর্যের বাহুবলে
সসাগরা ধরাতলে
একদা সকলে হয়েছিল কম্পবান
তাঁরা ত ফাউলকারি খান নি কখন !

৮

গরু আর মদ খেয়ে ব্যাস তপোধন –
বদনে চুরুট রাখি
বদরীতলায় থাকি,
নাহি করিলেন বেদ ভারত রচন,
সোলা হ্যাটে তিনি নাহি ঢাকিলা চৈতন !

৯

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ
জানকী উদ্ধার হেতু,
সাগরে বাঁধিলা সেতু,
ঘেরিলা সোনার লঙ্কা বধিতে রাবণ,
করেন নাই সল্ট্ বিফ্ ভোজন কারণ।

১০

খাব না ফাউলকারি কিংবা কট্‌লেট,
যা খেয়েছি চিরকাল,
তা খেয়ে কাটাব কাল,
মাছে ভাতে ভরে বেশ বাঙ্গালীর পেট,
খাব না ফাউলকারি, কিংবা কট্‌লেট।

১১

কোন্ গুণে বিবি ভাল, ওহে প্রাণধন,
পরচুলে নানা ছাঁদে,
শৈলাকার খোঁপা বাঁধে,
তার পরে শোভে টুপি বিচিত্র বরণ
নগেন্দ্র শিখরে যথা খগেন্দ্র শোভন।

১২

সিঁতায় সিন্দুর নাই—অলক্ত চরণে,
টিপশূন্য যে ললাট,
দেখিতে গড়ের মাঠ,
রঞ্জে না সুওষ্ঠ দুটি তাম্বুল রঞ্জনে,
খট্‌মট্ করে৷ চলে সোয়ামীর সনে !

১৩

স্বভাবে সুন্দরী নহে—কাপড়ে বাহার,
বিচিত্র কাপড় পরে,
দেখিলেই ভয় করে,
ব্যাঘ্রচর্ম সম বস্ত্র চিত্রিত তাহার,
ঘসে মেজে রূপ করা তাদের ব্যাভার।

১৪

আমি ত হব না বিবি থাকিতে জীবন,
ইংরাজের গুণ যত,
শিখিব তোমার মত,
ইংরাজের দোষভাগ লব না কখন,
আমি ত হব না বিবি থাকিতে জীবন।

['অবকাশ রঞ্জন' ২য় সংস্করণ—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ]

অক্ষয়চন্দ্র সরকার [১৮৪৬-১৯১৭]

নব মাথুর সংবাদ

[যে ঘটনাটি অবলম্বন ক'রে অক্ষয়চন্দ্র এই কবিতাটি রচনা করেন সে-সম্পর্কে কবিতাটির পাদটীকায় লেখা হয়েছে—"১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে আনন্দমোহন বসু প্রমুখ কয়েকজন সভ্য লর্ড ডাফরিণের নিকটে 'ডেপুটেশনে' গিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সভ্য সাহেবী পোষাকে লাটের সম্মুখে উপস্থিত হন। শুনা যায় লাট-সাহেব তাঁহাদের এই সাহেবী পোষাক লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ পোষাক পরিধান করার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং দেশীয় পোষাক পরিধান করেন নাই বলিয়া রহস্যচ্ছলে তাঁহাদিগকে বিশেষ লজ্জিত করিয়াছিলেন।" কবিতাটির ভাষায় কিছু ব্রজবুলি শব্দের মিশ্রণ লক্ষণীয়।]

রাজা হল শ্যামরায় পড়ি গেল সাড়া,
মথুরায় মহা গণ্ডগোল ;
উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে তানে,
কল্লোলের চারিদিকে উঠিতেছে রোল,
বাজিতেছে শত শত কাড়া।

পতাকা উড়িছে কত পত পত রবে,
বেণুবীণা বাজিছে সানাই ;
দোকানি পসারি যত সাজাইয়া রাজপথ
করে কত বিকিকিনি নাহিক কামাই ;
মনানন্দে সদানন্দে সবে।

নবরাজ নবরাজ্যে সকলই নবীন ;
মত্ত সবে নব অনুরাগে :
"শ্যামরায় জয় জয় !" চারিদিকে ধ্বনি হয়
পুরাণে ভুলিতে বল কয় দিন লাগে ?
মন হতে মুছিবারে চিন্ ?

"যদুরায় শ্যামরায় সে কেমন জন ?"
সকলের মুখে কথা এই ;
কেহ বলে, "বটে বীর," কেহ বলে, "অতি ধীর",
কেহ বলে, "রসিকের শিরোমণি সেই,
রাধাপ্রেমে সদাই মগন !

"রাধা রাধা ব'লে সেই বাজাইতে বাঁশী
গোকুলেতে গোপের নন্দন ;
চতুরালি জনে জনে, নাগরালি বৃন্দাবনে
করিয়া করিত সেই দিবস যাপন :
অধরে মধুর তার হাসি ।

"হাসি মুখে মিষ্ট কথা শিষ্ট ব্যবহার,
চৌদিকে চাহনি তার বটে ;
সকলে সন্তোষ করে, হাসি' আসি হাতে ধরে,
লয়ে যায় ধীরে ধীরে যমুনার তটে,—
যেন চির-সখা আপনার ।"

"যে কথা বলিতে যাও তাহা ভুলি যাবে,
এমনি কুহকী সেই জন :
তাহার কাহিনী শুনি, মুগ্ধ হয় যোগী-মুনি,
ব্যথিত সে ভুলে যায় আপন বেদন ;
শত্রু যেও সেও গুণ গাবে ।"

রাজা হল শ্যামরায় পড়ি গেল সাড়া,
যুবতী-মহলে গণ্ডগোল ;
উল্লাস সবার প্রাণে, হিল্লোল বহিছে তানে
কল্লোলের কল কল উঠিতেছে রোল,
জনরব যায় পাড়া পাড়া ।

"সে নাকি চতুর বড় ব্রজের কানাই
কপট লম্পট শঠরাজ,
তপন-তনয়া-তটে, নীপতরু সুনিকটে
গোপনেতে গোপিনীরে দিয়েছিল লাজ ;
আই আই, লাজে মরি যাই !

"বৃন্দাবনে রাই-রাজা সে ছিল কোটাল,
বহুদিন গেছে কোটালিতে ;
মাথায় বাঁধিয়া পাগ্, ডাকিত সে 'জাগ্ জাগ্',
ঘুমাতে দিত না সেই ঘোর রজনীতে ;
চলিত সে ঝাঁকাইয়া ঢাল।

"আই মা গো হইল কি রাজ্য কোটালের
ধন মান রবে নাহি আর ;
সন্দারি করিবে যেই, ভূপতি হইবে সেই,
কোটালের রাজত্বতে না হয় বিচার,
বিধাতা করিল হেন ফের !"

এত ভাবি যুক্তি ক'রে মিলিয়া সকলে,
কুবজা নুবজা ওঝাইনী,
যত মথুরা-বাসিনী মরি মধুর-হাসিনী
রূপ-রস-বয়সের তরুণী কামিনী,
দশ জনে বসিয়া বিরলে.

শ্যামরায়ে ভেটিবারে শলা হ'ল স্থির।
"বুঝিব তাহার নাগরালি,
যাব সবে দলে বলে, বলিব রে ছলে কলে ;
চতুরের বুঝা যাবে যত চতুরালি,
কেমন রসিক যদুবীর।

"গোপের নন্দন সেই, নিজে গোপরাজ
গোপীসাজে মজিবেক মন ;
নাম গোপিনী-রমণ, বুঝে গোপিনীর মন
গোপনেতে গোপিনীর ব্যথিত সে জন ;
গোপীসাজে ভেটাইব আজ !"

যুকতি যোজনা করি জনে জনে মনে,
গোয়ালিনী সাজে মাথুরিণী ;
ডারিল মথুরা-বেশ, খুলিল কবরী-কেশ,
বিজটা ত্রিজটা হার কঙ্কণ কিঙ্কিণী ;
দূরে দিল কনক-ভূষণে।

বিনাইল কেশ-বেশ গোয়ালিনী ছাঁদে,
বৃন্দাবনী ঘাঘরি আঁটিল.
মাথায় পসরা-ডালা, সাজিয়া গোপের বালা
পঞ্চজনা মাধুরিণী বাহির হইল.
ভেটিবারে সেই শ্যামচাঁদে।

সঙ্গে মথুরাবাসিনী অনেক নাগরী
চলে মাধুরিণী-বেশে.
সোনা-বুটি নীল শাড়ী জরদ-চমক-পাড়ি
গোটাদার পাল্লাদার আঁচরহি শেষে.
তাহে কত আছে কারিগরি।

ঘিরি ফিরি পরিল রে সেই নীল শাড়ী,
বাম পিঠে ঝুলত আঁচল.
কৌতুকে কাঁচুলি আঁটা পাহাড় বুকের পাটা
সুমতি কুমতি তায় করে ঝলমল্.
চলিল রে দুহু বাহু নাড়ি !

কঙ্কণ বলয় তাড় চউরঙ্গ চুড়ী
বাহুতে শোভিল বড় রঙ্গে.
শিরেতে সীমন্ত টৌড় অবধ গুণ্ঠন বেড়ি,
ঝউরি বউরি দুহু ভিন্ ভিন্ ঢঙ্গে
চিকুর কানড় ছাঁদে মুড়ি।

খরল নয়ন-ভঙ্গি, গরল মিশালে,
কাজল ডারল তাহে ঘোরি,
করল মরাল-গতি, বাহিরল রাজপথি
ফিরল ঘুরল সচকিত কত বেরি,
ভয় ভয় চৌদিকে নেহালে।

গোপিনী বেশিনী যত মথুরাবাসিনী
চলিল সবার আগে আগে :
পাতিয়া বেশের ফাঁদ, ধরিব রে শ্যামচাঁদ,
নব ভূপে মজাইব নব অনুরাগে।
পিছে চলে মথুরাবেশিনী।

বার দিয়া বসিয়াছে শ্যামচাঁদ রায়,
ভোজরাজ রত্নসিংহাসনে,
নকীব ফুকারে তায় বন্দীগণে স্তুতি গায়
চোপ্‌দার্ দাঁড়াইয়া যুগল-চরণে :
দিব্যাঙ্গনা চামর ঢুলায় :

দ্বারী করে নিবেদন করি দণ্ডবৎ
মথুরা-বাসিনী আগমন :
সঙ্কেতিল শ্যামরায়, বন্দী আদি দূরে যায়,
"আসতে বলহ" বলি আদেশে তখন :
দ্বারবান ছাড়ি দিল পথ।

পসরা উতারি যত গোপিনী বেশিনী
গোপীচাঁদে করে নমস্কার :
মথুরাবেশিনী সবে প্রণমিয়া সগৌরবে
ধীর ভাষে শ্যামচাঁদে দিল জয়কার,
লাজে ভয়ে মধুর-হাসিনী।

গোয়ালিনী বেশ হেরি নটবর তাহে,
মুচকি মুচকি থোড়ি হাসে :
উচিত ভরম ভর, কহিল হি ততঃপর,—
"নগরবাসিনী ধনি, আগমন কাহে ?
বলয়িবি হামারি সকাশে।"

আগরি আসিল দূতি একবর নারী,
পরবীণা পরিপক্ক মতি,
বলিল গরজ কথা, জানাল আরজ-ব্যথা,—
"কোটালে বিচার ভার না দেয় ভূপতি,
আপনক মনহি বিচারি।"

নব ভূপ উত্তরিল বুঝিয়া সন্ধান,—
"ভয় নহি রঙ্গিণী-সমাজে,—
আমি ত কোটাল-রাজ জান সব ব্রজমাঝ,
নারীর গোলামি করি কোটালের সাজে :
পায়ে ধরি বাড়াইতে মান !"

সিংহাসন ছাড়ি তবে নামে যদুরায়,
ভূমেতে উরিল জনু চাঁদে ;
গোপিনী-বেশিনী পাশে দাঁড়ায়ে মুচকি হাসে,
ঘাঘরি ধরিল তার বৃন্দাবনী ছাঁদে ;
প্রাণ তার উড়ে উভরায় ।

"ছি ছি কি কর কি কর শ্যাম নটবর,
মরি মরি মরি হরি লাজে !
গোপিনী-বেশিনী বটি, নহি বৃন্দাবনী নটী,
মথুরায় বসনহরণ নাহি সাজে ;
ছাড় ছাড় যাই সবে ঘর ।"

বুঝিল চতুর রায় ভীতা বিদেশিনী ;
আশ্বাসি বিশ্বাস দেয় তায় ;
বলে "নহি নহি সখি, কাহে তুহ থকমকি ?
রাজা হাম ঐসা কাম কভি না জুয়ায় ;
কাহে তু রে সাজি গোয়ালিনী ?

"নগর-বাসিনী তুহ নাগরী কামিনী,
কাঁচরি আঁচরি তোরা সাজ ;
তেয়াগিয়া রাজ-বেশ, কাহে তু ধরল শেষ,—
আভিরি ঘাঘরি পরি গোপী-বেশ আজ,—
কাহে তুহ সাজ গোয়ালিনী ?

"হেরত মাথুরী বেশ মর্যাদা মাধুরী,
চমক জমক হের কৈসা !
আঁধার রাতমে জনু নীল নভবর-তনু
লচ্ছ লচ্ছ হি নচ্ছত্রে চমকাতি যৈসা,
উজারা সুন্দর শান্ত ভূরি ।

"পাটরানী-বেশ ছোড়ি কাঠুরানী সাজ
ছিক্ ছি বিষম মতি ভুল !
কাঞ্চনে আদর নাহি, কাঁহা কাচ ঢুঁরতাহি
হাতের কমল ফেলি, লরবি সিমুল ?
ইহ নহ চতুরিক কাজ ।"

প্রবীণা পলিত কেশী দূতি আগুয়ান
যুড়ি কর করে নিবেদন,—
"যত দেখি গোপরায় গোপিনীর বেশ চায়,
সেই লাগি পরিয়াছি গোপিনী-বসন ;
ভূপ তাহে নাহি ভাব আন।"

"আনক গোপক হাম না জানি বিচারি,
কাকর মনমে কিয়া হ্যায় ;
হাম তু গোপল বটি, পহিরহি পীত ধটি,
আভরী ঘাঘরি কিন্তু হামে নাহি ভায়,
ভলিবনি মাথুরিণী শারী।

"হের তার পরিচয় লহ হাতে হাতে"—
কহিল মুচকি হাসি শ্যামে ;
কুবজা কোণেতে ছিল, হাতে ধরি উঠাইল,
সসম্ভ্রমে বসাইল সিংহাসনে বামে ;
আপনি বসিল পরে তাতে।

"জয় জয় শ্যামরায় !" পূরিল অবনী ;
মাথুরীতে মজিল কানাই।
"দ্বাপরে ঘটিল যাহা, কলিতে হইবে তাহা"—
আচম্বিতে দৈববাণী শুনিল সবাই।
হরি হরি কর হরিধ্বনি।

[প্রথম প্রকাশ—'নবজীবন' পত্রিকা, মাঘ ১২৯১ বঙ্গাব্দ ; ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রের 'রূপক ও রহস্য' গ্রন্থে সংকলিত।]

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪৯-১৯১১]

ভারত-উদ্ধার (ব্যঙ্গকাব্য)

['শ্রীরামদাস শর্মা' ছদ্মনামে কাব্যটি লিখে কবি এটি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অর্থাৎ নিজেকেই উৎসর্গ করেছেন ।]

প্রথম সর্গ

গাও মাতঃ সুররমে, বাণী-বিধায়িনি,
কমল-আসনে বসি, বীণা করি করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দান্ত বাঙ্গালী—
ত্যজিয়া বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়া
টানাপাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ার ঠেস
উৎসৃজি সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কোঁচা,—
ভারতের নির্বাপিত গৌরব-প্রদীপ—
তৈলহীন, সল্‌তেহীন, আভাহীন, এবে—
জ্বালাইলা পুনর্বার, উজ্জ্বলিয়া মহী ।
বোনেদি ভারত-কবি মুনি বাল্মীকির
প্রেতাত্মার প্রেতপদে করি নমস্কার,
অথবা প্রাচীন গ্রীসে, নগরে নগরে
ঘুরি, যত গোরস্থান নিষ্কাশিত করি,
হোমর-কঙ্কালে আমি সেলাম ঠুকিয়া,
গীতাইয়া লইতাম ভারত-উদ্ধার-
বার্তা : কিন্তু নব্য কবিদল-উৎপীড়নে
আছে কিনা আছে তাঁ'রা এ সন্দেহ ঘোর
হইয়াছে মম চিতে : (এত অত্যাচারে
জীয়ন্ত মরিয়া যায়, তাঁ'রা তো মা মরা !)
অভিমান আছে তাহে বাঙ্গালী বলিয়া,
পরপদ-ধ্যান মাতঃ বর্দ্দাস্তিতে নারি,
তাই মা তোমারে সাধি । প্রকাশিয়া দয়া,

মূর্তি ধরি, অবতরি স্বাধীন ভারতে,
রাখানি বাঙ্গালী-বীরে, বীরত্ব-রাখানি,
বিস্তারে কৌশল-কাণ্ড বিবরিয়া তার
সফল কর মা জন্ম, তোমার, আমার।

কলেজের পড়াশুনা সব করি শেষ
দু মাস ছ মাস ধরি, আফিসে আফিসে
নিতি নিতি যাই আসি ; কিছুই না হয়।
শুক্ল চন্দ্রকলা যেন বাড়ে দিনে দিনে,
ব্রাহ্মণীর হৃদাকাশে বিরাগ তেমতি
বাড়িতেছে মাত্র। পরিশেষে একদিন,
ধূলি-ধূসরিত জুতা, মলিন বদন,
ফেকো উঠিতেছে মুখে সাধি' জনে জনে,
ব্রাহ্মণীর ক্লান্ত কান্ত ঘরে ফিরে এনু,
"খাবার কি আছে কিছু ?" জিজ্ঞাসা করিনু।
"ভস্ম খাও দগ্ধানন ! তোমার কপালে
পড়িয়া সকল সাধ পুরিয়াছে মোর .
আছে মাত্র ছেলে দুটো—সংসার-বন্ধন—
নহিলে কলস রজ্জু ক্লেশ অবসান
করি' দিত কোন্ কালে ! হে অক্ষম নাথ !
দুধের অভাবে বুঝি সে দুটোও মরে !"
না কহিলে নয় কথা, আপন আশয়,
পরাক্রম, আশা কত, সব বিস্তারিয়া
কহিনু ধনীরে। বুঝি, অসহ্য হইল .
ধরিয়া বিরাট ঝাঁটা প্রহার করিল।

তখন তিলার্ধ তথা তিষ্ঠিতে না পারি'
পলাইনু নিজ ঘরে। অর্গলিয়া দ্বার,
সুরেশ্বরী ছিল ঘরে, ভকতি করিয়া
সেবিলাম যথোচিত। দেবীর কৃপায়
দিব্যচক্ষু লভিলাম, হৈল দিব্য জ্ঞান।

দেখিলাম ভারতের ভবিতব্য যত,
বর্তমান হেন ;—কিসে ভারত-উদ্ধার

কবে হৈল কোন মতে কাহার দ্বারায়
স্মরি স্বরীশ্বরী সরস্বতী সবিনয়ে,
গাইতে কহিনু তাঁরে উপর্যুক্ত মতে।

আকাশসম্ভবা বাণী হইল তখন ;—
"কেন বৎস গুণনিধি, কৃতিকুলমণি,
গীত গাইবারে মোরে কর অনুরোধ ?

হইল বয়স কত, বার্দ্ধক্যে জরায়
অষ্ট অঙ্গ দাঁড় দাঁড়, দেহে নাহি বল,
বীণা ধরিবারে কষ্ট, খসি খসি পড়ে,
অঙ্গুলী কম্পিত হয় ; কণ্ঠ ছাড়ি যদি
শব্দ বাহিরিতে যত্ন করে কোন দিন
স্খলিত-দশন তুণ্ডে হ-দ-দ-দ হয়।

আর কি সে দিন আছে ? এখন তুমিই
বরপুত্র আছ মম, জীও চিরদিন :
যে গীত গাইতে ইচ্ছা গাওরে অবাধে।

ভাষা, ভাব, যতি, মিল, রস, তান, লয়
ফুৎকারে তোমার, সব হয় জড় সড় ;
যাহা লিখ তাই কাব্য, যা গাও সঙ্গীত ;—
আমা হ'তে পুত্র, বড় হইয়াছ তুমি।

দেবের মরণ নাই তাই বেঁচে আছি
নহিলে শঙ্কিতে সদা বাঁচিবারে সাধ
কার চিতে হয় বল ? কবে ফুরাইবে,
দশ দিক্ অন্ধকার করি চলি যাবে,
এই ভেবে দিন দিন হইতেছি ক্ষীণ।

তুমিই গাও রে গীত, ও রে বাছাধন,
গাইতে পার ত ভাল, গাইবেও ভাল,
শুনিয়া ত্রিলোকবাসী কাঁদিয়া মরিবে।"

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে প্রস্তাবনা নাম প্রথমঃ সর্গঃ ॥

———

দ্বিতীয় সর্গ

একদা আষাঢ় মাসে আষাঢ়ান্ত দিন,—
সহজে দুঃখীর দিন যেতে নাহি চায়—
কত কষ্টে গেল, ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এল।
মৃদুল মলয় বায়ু, পরিমল-বহ,
বঙ্গোপসাগর-নীর-শীকরেতে তনু
সিক্ত করি, ধীরি ধীরি মহানগরীতে
আসিয়া পৌঁছিল ; তথা, চতুরঙ্গী পল্লী
ঘর ঘর ফিরি, যথা যত পরিমাণে
শৈত্য কি সুগন্ধ লাগে, বাঁটি বাঁটি দিল।
পরিমল বিতরণে পবনের ভার
লঘু না হইল কিন্তু ; অঙ্গারাম্ল বাষ্পে
পুরিত হইয়া পুনঃ উত্তরে পশিলা :—
হায় যথা গোপবধূ এক কেঁড়ে দুধ
পানা পুকুরের জলে সমান রাখিয়া
যোগাইয়া ফেরে বঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
অন্তরে বাহিরে গ্রীষ্ম সহিতে না পারি
হেন সন্ধ্যাকালে—শীতল হইব. বাঞ্ছা—
বিপিন একাকী ভ্রমে গোলদীঘি তটে ;
—যথা সুরপতি, যবে দৈত্য-অনীকিনী-
বেষ্টিত অমরপুরী, এই যায় যায়,
ভ্রমে একা, চিন্তাযুক্ত, নন্দনকাননে।
ভাবিছে বিপিন ;—"হায় ! গত কত দিন
এই ভাবে : আর কত দিন বা সহিব
দারুণ যন্ত্রণা ; বঙ্গ কত কাল রবে,
বঙ্গবাসি-পেটে অন্ন যদি নাহি পড়ে ?
আমি তো মরিব আগে, ক্রমে বংশ লোপ ;
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ, তার নাম কে করিবে ?
ভারত কি চিরদিন পরাধীন রবে !
সুখের চাকুরী ছিল, তুচ্ছ অপরাধে
দশের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইল,

পাপিষ্ঠ ইংরেজ। পদে পদে প্রবঞ্চনা
যার, সেই কিনা মিথ্যা-বলা দোষ ধরি
ছুতোনাতা ছলে সর্বনাশ সাধিনল !
ছাড়িয়া জননী-স্তনা ধরিয়াছি পুঁথি,
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিশ্রাম,
যথাকালে উপাজিল মাথার ব্যারাম।
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি।

ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে
বিবিধ কল্পনা-খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানা মতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্বোধনে
জাগাইতে গেনু--মা ! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত, ভারত !

সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।
গিয়াছে ধর্মের দিন, এ যে গলাবাজি,
তাও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার।

—উপায় কিছুই নাই ! কুপোষ্য সুপোষ্য
পতিপ্রাণ প্রণয়িনী, দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এ সব ফেলিয়া দূর দেশান্তরে যাই,
তাও তো পারি না, প্রাণ থাকিতে এ দেহে।

ইংরেজে আপত্তি নাই, যদি জনে জনে
"লাট" পদে অভিষেক আহার যোগায়।
ভারতের ভাগ্যদোষে তাহা ঘটিবে না,
আমার দুঃখের নিশি বুঝি পোহাবে না,
অসহ্য হইতেছে ক্রমে রাখিতে পারি না,
নিশ্চিত ইংরেজে দিতে হল রসাতলে।
বুঝ ভাল, যদি খেতে পাই দুই বেলা ;
যবন মাথার মণি, জঠরের জ্বালা
নিবারণ করে যদি ; না হয় স্বাধীন
হউক ভারতবর্ষ, লুটে পুটে খাব।

ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বঁটি করি করে
—হায় রে লজ্জার কথা অন্য অস্ত্র নাই !—
—হায় রে দুঃখের কথা অস্ত্র চালাইতে
শক্তি নাই, জ্ঞান নাই বঙ্গবাসি-দেহে !—
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে।"
স্তম্ভিত বিপিন ! মুখে একমাত্র বোল,
—"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে !"
বাম জুতাতলে ক্ষিতিতল সংঘর্ষণ
করিতেছে বিপিন দ্রৌপদী-পরাক্রমে
—না সম্ভবে বাঙ্গালীর ভীম-পরাক্রম—
সঘনে "বঁটায়" যত "পাষণ্ড ইংরেজে"।
বিপিনকৃষ্ণের বাহু বিষম দুলিছে,
লাটিম ছাড়িছে যেন কল্পনার বলে,
মুখে শুধু "বঁটাইছে পাষণ্ড ইংরেজে"।
বিপিনের তদাতন মুখের ভঙ্গিমা,
অন্ধকার হেতু নাহি পারি বর্ণিবারে
—হায় রে কল্পনা-নেত্র নাহিক আমার—
কিন্তু অনুভবে বুঝি, দন্তকিটিমিটি,
অধর-দংশন আর ললাট-কুঞ্চন
কিছু কিছু ছিল, যবে বলিছে বিপিন
"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজে !"

কামিনীকুমার প্রিয় বন্ধু, বিপিনের
হেন কালে চুপি চুপি তথা উপনীত।
দেখিয়া বন্ধুর ভাব, পশ্চাতে পশ্চাতে
অগ্রসরি সমীপেতে গিয়া বিপিনের
ছুঁইল তাহার স্কন্ধ। চমকি বিপিন,
ভাবিয়া পুলিশ, আর না চাহিয়া ফিরে,
উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িবারে পাইল প্রয়াস।
দৌড়িছে বিপিন ; আর কামিনীকুমার
আশ্বাসিতে বন্ধুবরে দৌড়িছে পশ্চাতে।
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদের শর
—নশ্বর আশুল শর—মৃগেন্দ্র-পশ্চাতে

তাড়া করি ধরে বিন্ধে, জরজরি পাড়ে
মৃগরাজে ভূমে, হায় তেমতি কামিনী
সে করাল সন্ধ্যাকালে গোলদীঘি-ঘাটে
পাড়িলা বিপিনে, আর মড় মড় রড়ে
ধপাৎ করিয়া তার উপরে পড়িলা !

বিপিন, অসিত-কান্তি, হেঁটমুণ্ড, ভূমে
গৌরাঙ্গ কামিনী সহ যায় গড়াগড়ি ;—
কবির উপমা-ক্ষেত্র—মার্গশীর্ষে যেন
দুর্বাদলে শেফালিকা রাশি রাশি পড়ি ;
অথবা পর্বতশৃঙ্গ গোধূলির আগে
স্বর্ণকান্তি তপনের কিরণে মণ্ডিত ;
কিম্বা যথা সুধাকর কৃষ্ণা ত্রয়োদশী-
শিরে দেয় কুতূহলে কৌমুদী ঢালিয়া ।

কবির আমোদ, কিন্তু বিপিনের ক্লেশ,
—লোষ্ট্রক্ষেপী বালকের সুখে যথা ভেক ।
আড়ষ্ট বিপিন, মুখে বাক্য নাহি সরে,
সংশ্লিষ্ট দশন, চক্ষু স্পন্দন-রহিত,
নাশায় নিশ্বাসবায়ু বহে কি না বহে ।

গা ঝাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিলা কামিনী,
চিতাইলা বন্ধুবরে, তীর্থ একদেশে
টানিয়া, তুলিয়া কিংবা, শোয়াইলা তারে,
উড়ুনীর উপাধানে, গলার বোতাম
পিরাণের খুলে দিয়া বাজনিলা তায়,
আনিয়া শীতল বারি খুঁট ভিজাইয়া
সিঞ্চিলা বিপিন-মুখে ; সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ফেলিলা বিপিন তবে, নড়িলা চড়িলা ।

কহিল কামিনী— "কেন ভাই এত ভয় ?
তুমি ত সাহসী বড় বিখ্যাত জগতে,
বাধিলে লড়াই আজি দুশ্‌মনের সনে
তুমি অগ্রবর্তী হবে : দেশের কল্যাণে
মুণ্ড দিতে মুণ্ড নিতে ভয় নাহি পাও ;

তবে এ নগর মাঝে, জাগ্রত সকলে
সিপাই সান্তরী হেথা ইঙ্গিত করিলে,
কেন হেন ভাব তব হৈল আচম্বিতে ?
পড়াশুনা করিয়াছ, ভূত নাহি মান,
কেন তবে, হে বিপিন, বাঙ্গালী-ভরসা,
সাগর লঙ্ঘিতে পার, গোষ্পদে ডুবিলে ?
তবে ত ভারত মাটী, ইংরেজের (ই) জয় !''

আশ্বাসিলা, বিলাপিলা, হেন মতে যদি
কামিনীকুমার, স্বর পরিচিত বুঝি,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জন্মিল ভরসা,
বিপিন-হৃদয়ে পুনঃ জ্বলিল অনল
—ইংরেজনিধন যাহে, ভাগ্যের লিখনে !
সাহসে বিপিনকৃষ্ণ উঠিয়া বসিলা
কামিনীরে বুঝাইলা মাথার ব্যারাম ।
পুনঃ দোঁহে ধরাধরি দোঁহাকার হাতে
চলিলা নিভৃতে সেই দীঘির ভিতর ।
কামিনী বিনয়ে অনুরোধিলা বিপিনে
বিশেষিয়া প্রকাশিতে যত বিবরণ ।—
''কি হেতু একাকী আসা, কি বা সে ভাবনা
হস্তের ঘূর্ণন যাহে, পদ-বিক্ষেপন ;
সহসা আগ্নেয়গিরি কেন উৎপাতিল,
সহসা স্ফুলিঙ্গ আজি কেন বা ছুটিল ;
গভীর জীমূতমন্দ্র হতেছিল কেন ;
ইংরেজ-নিপাত শীঘ্র বুঝিনু নিশ্চিত ।''

বহুক্ষণ দুই জনে হইল কানাকানি,
বহুভাবে বহু কথা বিচার করিলা
বন্ধুদ্বয় ; ভারতের ভাবনা ভাবিয়া
বিসর্জিলা অশ্রুনীর : সিদ্ধান্ত হইল
বাক্যে শুধু কাল ক্ষয়, কার্যহানি তায় ।
কহিলা বিপিন, ''আর বিলম্ব না সহে :
কল্যই সভায় সব করিব নিশ্চয় ।

ভারত-উদ্ধার কিংবা সভার বিলয় ।”
দুই বন্ধু দুই দিকে করিলা প্রয়াণ,
নিজ নিজ ঘরে ভাত খাইলা দুজনে,
“ভারত-উদ্ধার প্রাতে”—ভাবিয়া শুইলা ।

ইতি শ্রীভরতোদ্ধার-কাব্যে সঙ্কল্পো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

তৃতীয় সর্গ

তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত,
এ তিন প্রহর গেল জনমের মত,
অনন্ত কালের সঙ্গে মিশাইল কাল,
আহৃত সিকতা-মুষ্টি স্তূপে মিশাইল !
কোথা পূর্ণবয়া পুত্র, ধার্মিক পণ্ডিত,
ত্রিভুবন আন্ধারিয়া, জননীর ক্রোড়
শূন্য করি, অশ্রুবাণে শিশুরে ফেলিয়া,
পতির চরণ ভিন্ন গতি নাহি যার
এহেন বধূরে করি চির অনাথিনী
ভুলিল সকল মায়া নিষ্ঠুরের প্রায়,
মুছাইতে অশ্রুনীর না চাহিল ফিরে ।
বিচারমন্দিরে কোথা—ধর্মাধিকরণে—
রাজস্ব, পৈতৃক ধনে, হইয়া বঞ্চিত,
ভিক্ষাভাণ্ড ভিক্ষিবারে পশিল সংসারে,
কোন মহাজন,—ন্যায়-কূটের প্রসাদে !
অদোষ, অপাপ, কোথা না জানি না শুনি,
চক্রান্ত-অনলে দিছে জীবন আহুতি,
মূর্তিমান যমরাজ নররাজে দেখি ।
কে বলে নদীর স্রোত কালস্রোত সম ?
ভাসাইয়া জবা ফুল গঙ্গার সলিলে—
একটি একটি করি বহুতর ফুল,—
সারি দিয়া ভেসে যেতে দেখেছি বাহার
তীরে দাঁড়াইয়া, শেষে বহুক্ষণ পরে,
সাঁতারিয়া সবগুলি এনেছি ধরিয়া ।

কিন্তু রে কালের স্রোতে পারিজাত জিনি
অমূল্য কুসুম কত ভাসিয়া গিয়াছে,
দেখেছি নয়নে, হায় ! পারি নি ফিরাতে !
সাগরে সাঁতার দিলে ফিরে যদি পাই
সুখের শৈশব, তবে চাহি না কি আর ?
একবার কালস্রোতে পড়িয়াছে যাহা,
তার তরে হাহাকার ভিন্ন কি উপায় ?
কে বলে নদীর স্রোত কালস্রোত সম ?

তৃতীয় প্রহর দিবা হইল অতীত।
নগরে অফিস-মুখে গাড়ী ঘুড়ী কত
ছুটিল ঘর্ঘর করি, প্রস্তরিত পথে।
"দান ধকা, বাম ধকা, ধাই কুড়" করি,
উড়ে মেড়া ছুটে কত "পাল্কী" লইয়া।
ক্রমে ঠন্ ঠন্ রবে চারিটা বাজিল।

আজীর্ণ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিত,—
লোনা-ধরা, বালি-চুন-কাম স্থানে স্থানে
খসিয়া গিয়াছে, তাই ইট দেখা যায় ;—
শোভিছে সুরম্য, রাজপথের উপরে
আঁকা বাঁকা, উঁচু নীচু কাষ্ঠ-দণ্ড-শ্রেণী,
আবৃত অলিন্দ তার ম্লান ভাবে ঝুলি,
নশ্বর জগৎ তাই প্রমাণিছে যেন।
অবুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট
ক্ষয়িত কোথায়, আর স্খলিত ক্বচিৎ।

উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত,
প্রস্থে, অনুমানি, হবে হাত সাত আট ;
মাদুরিত মেজে, তার উপরে চেয়ার
সারি সারি সুসজ্জিত, পূর্ণ চতুষ্পদ,
ত্রিপদ দু চারি খান ; মধ্যস্থ টেবিল
কালের করাল চিহ্ন দেখাইছে দেহে।
জীর্ণ শীর্ণ ছিন্নরজ্জু আশ্রয় করিয়া
বিলম্বিত টানা-পাখা, চির আবরিত

পড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ
দড়ি আগে ছেঁড়ে কিংবা কড়ি আগে পড়ে।
এ হেন মন্দিরে "আর্য-কার্যকরী সভা"
প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভাগণ!
ধন্য অনুরাগ! যাহে এ প্রাণ-সঙ্কটে
স্বদেশ-বাৎসল্য-পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া,
ভারত কল্যাণে হেথা সশরীরে আসে।
চারিটা বাজিবামাত্র, এক দুই ক্রমে
পঞ্চ সভ্য উপস্থিত সভার মন্দিরে।
আরব্ধ হইল কার্য : গতোপবেশনে
কে কে উপস্থিত ছিল, কি কার্য সম্পন্ন,
কি প্রস্তাব হয়েছিল, কেবা দ্বিতীয়িলে[২]
ঐকমত্যে উঢ়[৩] তাহা হইল কেমনে,—
রীতিমত বিবরিত, হইল দৃঢ়ীকৃত,[৪]
সভ্যদল-সম্মোদনে, অদ্যের সভায়।
উঠিল বিপিন তবে চেয়ার ছাড়িয়া,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ক্যাঁকোচ সুস্বরে
উঠন্ত বিপিনে ধন্যবাদিল চেয়ার।
কহিলা বিপিনকৃষ্ণ সম্বোধিয়া সবে,—
"ভদ্রগণ, বন্ধুগণ, স্বদেশীয়গণ,
যুষ্মদীয় অনুমতি সহকারে আমি
আজি প্রস্তাবিতে এক গভীর প্রস্তাব ;
জীবন মরণ সম যে প্রস্তাব গুরু ;
যে প্রস্তাবে নির্ভরিছে সবার কল্যাণ ;
দেহ প্রাণ নিজ হবে, রবে বা পরের
চিরজন্ম, যে প্রস্তাবে খলু মীমাংসিবে
ভারত আপন ভার পারে কিনা পারে
লইতে আপন স্কন্ধে, সিদ্ধ যে প্রস্তাবে ;
যে প্রস্তাবে, সংক্ষেপতঃ, নির্ভরে সকল—
আমাদের, বাঙ্গালার, ভারতের ভাবী।"
নিস্তব্ধ সকল সভ্য, বিস্ফারিত আঁখি
একভাবে সংগ্রথিত বিপিনের মুখে ;

নিস্তব্ধ যে সভাতল,—নড়িলে গোধিকা
শব্দ তার শোনা যায় বিনা আকর্ণনে।
ত্রিলোকের একমাত্র শ্বাস হয় যদি,
সেই এক শ্বাস রোধি ত্রিলোক-নিবাসী
আরম্ভে কুম্ভক যোগ, একাসনোপরি,
নদ নদী বদ্ধস্রোত, না সঞ্চরে বায়ু
গ্রহ উপগ্রহ নাহি করে চলাচল,
তথাপি না হয় স্তব্ধ সভাতল সম।
বলিল বিপিন—"কিন্তু দুঃখের বিষয়,
নহি বাক্যপটু আমি, নাহিক বাগ্মিতা,
নাহি শব্দে অধিকার প্রকাশিতে ভাব,
উদিত অন্তরে যত ;—যথা পুরাকালে
প্রকাশিলা মুনিগণ দুঃখ, এই বলি,
'হায়রে ধর্মের তত্ত্ব নিহিত গুহায়'—
যা হোক, সৌভাগ্যক্রমে, বিষয়ের গুণে,
বাগ্মিতার প্রয়োজন না হইবে কভু,
মরমে পশিবে বস্তু জরজরি তনু !"
করতালি পদতালি সঘনে সভায়,
বৈশাখের মেঘে যেন করকা-নির্ঘোষ।
পুনশ্চ বিপিনকৃষ্ণ আরম্ভিল কথা,—
"ইংরেজের অত্যাচার নহে অবিদিত
কাহারো এ সভাক্ষেত্রে ; বিস্তার বিফল,
তথাপি, মরম-দুঃখ চরম যাহাতে,
গন্তব্য-উল্লেখ তার না করিয়া আজি
পারি না গ্রহিতে পুনঃ আসন আমার।
বিশাল ভারত-ক্ষেত্র, মাসাবধি যার
নিয়ত হাঁটিলে প্রান্ত দেখা নাহি যায়
লৌহের শৃঙ্খলে তার অষ্ট অঙ্গ বাঁধি,
চালাইছে তদুপরি আগ্নেয় শকট,
সপ্তাহের পথ হেন সংকীর্ণ করেছে।
কি আর লাঘব বল, কোন্ অপমান
এর চেয়ে তীব্রতর বাজিবেক হৃদে,

হৃদয় থাকে হে যদি, শোণিত তাহাতে
জমিয়া না থাকে যদি দধির মতন
—শ্লেষ্মা-বৃদ্ধিকর যাহা দুগ্ধের বিকার !
এ নিগড় খুলিবে না, দুলিতে দেহের
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ ?" পুনঃ করতালি ।
"নিজ নিজ বাহু কাটি, সাগরের জলে
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, ঘৃণা যদি থাকে
নিয়োজিত বাহু যদি নাহি উন্মোচিতে
হায় ! শেল হানিয়াছে বাঙ্গালার বুকে,
চড়ায়েছে যেই শূলে প্রাচীন ভারতে ।
—অসাধ্য বোঁচায় আর না নিন্দিবে কেহ ।
হায় ঘৃণা ! হায় লজ্জা ! হা ধিক্ ! হা ধিক্ !"
হা কষ্ট ! হা দুরদৃষ্ট ! ভাগ্য ভারতের !
চিৎকারিছে দিবানিশি কবি নাট্যকার,
তবু না ভাঙিল ঘুম অকালকুষ্মাণ্ড
কুম্ভকর্ণ বাঙ্গালীর, ভারতের তরে !
বিলম্ব না সহে আর ।" বলিতে বলিতে
ভীমবেগে কটিতটে কোঁচার কাপড়
জড়ায় বিপিনকৃষ্ণ, সমবেদনায়
সকলেই নিজ নিজ কাপড় কসিল ।
হইয়া সহজ পুনঃ কহিলা বিপিন,—
"বঙ্গের সুপুত্র যত পত্র-সম্পাদক,
কবি আর নাট্যকার যেদিন লেখনী
ধরিয়াছে, সেই দিন হইতে তটস্থ
কম্পমান-কলেবর ইংরেজের কুল ।
ভাব ত, ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি !—"
বিপিনের কথা শেষ হইবার আগে
উঠিলা সুরেশ ;—"যদি বাধা দিতে পাই
অনুমতি, প্রশ্ন এক সুধাই এ স্থলে ।
স্বীকার, ইংরেজ-কুল কাপুরুষ বটে ;

স্বীকার, ইংরেজ যেন অত্যাচার করে ;
সম্মত হইনু যেন দূরিতে ইংরেজে ;
নাহি যে শরীরে বল, তার কি উপায় ?
সংখ্যায় ক'জন হবে বিদ্রোহীর দল ?
কিংবা যেন স্বেচ্ছা-বশে ভারতে ত্যজিয়া
ইংরেজ চলিয়া গেল আপনার দেশে,
তখন কোথায় রবে ভারত রাজত্ব ?
হিমালয় কুমারিকা কেন রবে এক ?
কে হবে ভারতপতি হিন্দু কি যবন ?
পঞ্জাবী কি মহারাষ্ট্রী, সিন্ধিয়া নিজাম ?
কে রক্ষিবে বহিঃ-শত্রু-আক্রমণকালে ?
কে রাখিবে ধন, প্রাণ, সতীর সতীত্ব ?
পথ ঘাট বাঁধাইয়া কে দিবে তোমার ?
করকচে মলা মাটী দেখিতে কুৎসিত,
রুচির লবণ কোথা পাইব তখন ?
কি খাইব, কি পরিব, বল দেখি ভাই ?
এ সব ভাবনা আগে ভাবিতে উচিত !
ইংরেজ যাইতে যদি চাহে এই ক্ষণে,
পায়ে ধরি দশ যুগ রাখিবারে হবে,
শিখাতে ভারতে শুধু ঐক্য কারে বলে,
শিখাতে, কেমনে হয় রাজত্ব-বিধান,
শিখাইতে পশুবল, নীতিবলে ভেদ,
শিখাইতে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ কেমন।
তুমিও হবে না রাজা, আমিও হব না,
আমাদের ইহজন্ম প্রজাভাবে যাবে,
তবে কেন নিজপায়ে মারিব কুঠার ?
রাজার কল্যাণ কেন না চিন্তিব সদা ?"

"লজ্জা ! লজ্জা ! ধিক্ ধিক্ !" "দূর করি দাও"
"নিয়ম ! নিয়ম !"[৫] এক মহা গণ্ডগোল
উঠিল সে সভাতলে ; মারিতে চাহিল
সুরেশে কেহ বা তথা। "এস না ? কেমন—"
সুরেশ বক্তারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বানিল।

কেহ না উত্তর দিল, সকলে নীরব,
ক্রমে শান্তি আবির্ভূতা পুনঃ সভাতলে।
আরম্ভিলা বিপিন আবার বক্তৃতারে,
করতালি ঘন ঘন হইল পুনরায়।
"শেষ বক্তা বকিলেন বহু অপ্রলাপ,
উত্তর তাহার কিন্তু চাহি না দানিতে
উপস্থিত ক্ষেত্রে। তবে যাইতে যাইতে
দুই চারি কথা তার সম্বন্ধে বলিব।
শরীরের বলে নাহি দেখি প্রয়োজন,
বুদ্ধিবল থাকে যদি ; কৌশলে কামান
ভোঁতাইতে পারা যায় ; গোলার অনল
কৌশলে বরফ তুল্য শীতলিয়া যায়।
সংখ্যায় পদার্থ কিছু নাহি থাকে কভু,
পঞ্চজন আছি, শূন্যে হইব পঞ্চাশ,
পাঁচ শত, সহস্র বা শূন্যেতে সকল।
মূলেতে প্রধান রাশি একমাত্র যদি
থাকে, তবে শূন্য দিয়া লক্ষ করা যায়।
বৃথা শঙ্কা, শেষ বক্তা, না বুঝিনু কেন
করিলেন ; যাহা হোক সত্বর যাহাতে
পরাস্তি ইংরেজে রণে, বিনা রক্তপাতে
আমাদের পক্ষে, হয় ভারত-উদ্ধার
উপায় তাহার অদ্য হোক বিবেচিত।"
বসিলা বিপিনকৃষ্ণ করতালি-মাঝে।
দাঁড়াইয়া কহিলেন কামিনীকুমার,—
"দণ্ডাইনু, দ্বিতীয়িতে, ভদ্রলোকগণ
সসার প্রস্তাব, যাহা করিলা বিপিন।
না অপেক্ষ সমর্থন দুর্বল আমার,
প্রশংসে সবার কাছে প্রস্তাব আপনা।
কি ছার মিছার ভয় করিলা সুরেশ,
ডরি না তাহাতে আমি ; পারি যদি রণে
পরাভবি দেশবৈরী মৌরুসী দুশ্‌মন্

ইংরেজ-কর্ম্মচুকুলে, যশো-বৈজয়ন্তী
উড়াইতে ফরফরি ভারত-আকাশে,
তবে সে সফল জন্ম। পরাজয় যদি
স্বদেশ উদ্ধার হেতু, নাহি লাজ তায়।
ফাঁসি দিতে চাহে যদি বিজয়ী ইংরেজ,
লইব না গলে ফাঁসি ; কি ভয় হে তবে ?—
করাইতে পারে বলে মুখের ব্যাদান,
কিন্তু গিলাইতে বস্তু নাহি পারে কেহ।
উচ্চে ডাকি, নিদ্রাগত ভারত-সন্তানে
জাগাও হে বঙ্গবাসি, জাগুক সকলে,
উঠ সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
ভারত-উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।"
ঘোর রোলে করতালি হইল আবার
কামিনীকুমার পুনঃ গ্রহিলে আসন।
কোন্ ভাবে কার্যারম্ভ, কি কৌশলে কোথা
কখন করিতে হবে, কিবা আয়োজন,
কোন্ কার্যে কোন্ জন হৈবে নিয়োজিত,
প্রয়াণিবে কোন্ জন কোন্ অভিমুখে,
প্রহরণ কি কি চাহি,—গভীরে মন্ত্রণা,
বিতর্ক, সিদ্ধান্ত, এবে কৈলা সভ্যবৃন্দ।
দংশিল রে কাল ফণী সুষুপ্ত মানবে,
শোণিতে মিশিল বিষ !—কে রক্ষিতে পারে,
ভাঙ্গিল ভুজঙ্গ-সভা, সভ্য-ভুজঙ্গম
যে যার বিবরে গেল গর্জিতে গর্জিতে।

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার-কাব্যে মন্ত্রণা নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কৃতাঞ্জলি, কবি-গুরু-পদে
বার বার ; গাঢ়-ভক্তি-প্রণোদিত চিতে
আকিঞ্চি[৬] তাঁহারে, দাসে না বঞ্চিয়া যাহে,
দয়িয়া[৭] কিঞ্চিৎ, প্রদানেন পদরজঃ,

কবিত্বের চোরাবালি এড়াইয়া যেন
না উঠিতে বিঘ্নকড়, পাড়ি জমি যায়
স্তালয় ভালয়। হায়, সদা সশঙ্কিত
কবিত্ব—প্রবল-পন্থা—তাঁরিব কেমনে।
বিষয়—প্রকাণ্ড, শক্তি—পিপীলিকা সম,
পুত্তলিকা হৈয়া চাহি বাঁধিতে বারণে!
ললিত লবঙ্গলতা, মঞ্জু কুঞ্জবন,
বংশীবরে দাঁড়াইয়া বাঁশরী বাজায়,
গোপিনী মনোমোহন, গোপী-মন হরি,
হায় রে কদম্বকুল মলয়া[৮] অম্বরে
সুস্বন স্বননে উড়ে যথা মধুমাসে,
মধু ভাষে, মধু হাসে, মধুময় সব
—এ হেন মধুর পদ বিন্যাসিতে কভু
নাহি শিখিয়াছি, মূঢ়বুদ্ধি আমি ; কিসে
বর্ণিনিব ভারতের উদ্ধার বারতা ?
কবিগুরু-পদাশ্রয় ব্যতীত বিফল
হৈবে প্রয়াস,—ভয়ে হতেছি বিহ্বল।
তাই ধ্যানি, সকরুণে, কবিগুরু, আমি।

কিন্তু সে কি কবিগুরু, যার ধ্যান করি ?
নহে সে বাল্মীকি, নহে পৌরাণিক কেহ,
সমিল-পদ-সূদন শ্রীমধুসূদন
—মৃত, তবু শ্রী যাহার না যাইবে কভু
—নহে ত এ কবিগুরু, নহে হেমচন্দ্র,
নবীন, প্রবীণ কিংবা, কেহই সে নহে।
বাস্তবিক কবিগুরু বলিয়া জগতে
কাহারেও নাহি মানি। কেন বা মানিব ?
আপনি লিখিব কাব্য পরিশ্রম করি,
সুযশ, অযশ যাহা হইবে আমার,
অনাদৃত কাব্য যদি, মুদ্রাব্যয় মম,
তবে কেন অন্যজনে গুরু হেন মানি ?
তথাপি এ স্তুতি ধ্যান করিলাম কেন ?

সুধাও আমারে যদি, অবশ্য উত্তর
সন্তোষ-জনক তার প্রদানিতে পারি ;
—'গ্রন্থ কলেবর শুধু করিতে বর্দ্ধন।'
এখন (ও) রজনী আছে। নীরব অবনী,
শান্তির কোমল কোলে প্রকৃতি সুন্দরী,—
সুকুমারী চিরবালা দিনের বেলায়
সারাদিন খেলাধূলা নিতি নিতি করি,
ধাতার আদুরে মেয়ে, হাসি মাখা মুখে,
(অলকার পাশে পাশে মুক্তা-বিন্দু হেন
স্বেদ-বিন্দু শোভা করে) শ্রান্তি দূর করে,
গাঢ় ঘুমে অচেতন, আজিও তেমনি
ঘুমাইতেছে। দেবকন্যা তারকার দল,
(ইন্দুদী জিনিয়া রূপে) দিবাভাগে যারা
লোক-লাজ হেতু থাকে অন্তঃপুর-মাঝে,
উন্মোচি গবাক্ষ যত স্বর্গ-নিকেতনে
দেখিতেছে, বাড়াইয়া শ্রীমুখমণ্ডল,
কেমন এ মর্ত্ত্যভূমি—না পড়িতে তোপ,[১]
না ডাকিতে আস্তাবলে কুক্কুট কুক্কুটী,
ভারত-ভরসা যত বাঙ্গালীর চূড়া,
সভার মন্ত্রণা স্মরি, নিদ্রা পরিহরি,
কোঁচান কাপড় কেহ করি পরিধান,
পরিয়া পিরাণ গায় কোঁচান উড়ানী
বুকের উপরে বাঁধি ফুল উঁচু করি,
ইজের চাপকান কেহ কার্পেটের টুপি,
যাহার যেমন ইচ্ছা সাজিয়া উল্লাসে
ভারত-উদ্ধার-ব্রতে উৎসৃজিল তনু,
বাহিরিল গৃহ হৈতে ! হায় রে সে সাজে
কন্দর্প ভুলিয়া যায়, অন্য কোন্ ছার !
ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেশে চলিল সকলে।

সুন্দরবনেতে গেল তিন মহাবীর,
রমণী, মোহিনী আর কিশোরীমোহন।

কাটাইল বহুতর সুন্দরীর গাছ
সেই মহাবনস্থলে, উজাড়িল বন,
ক্রমেতে চালান দিল এ মহানগরে।
সেনানী উমেশ আর অপ্রকাশচন্দ্র
পাণ্ডুয়ার বনে গেল বাঁশ কাটাইতে
দিনাজপুরের অন্ত ছাড়াইয়া তারা
রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ইতি আদি
কত দেশে কত বাঁশ করিয়া সংগ্রহ,
মহানগরীতে শেষে আসিল ফিরিয়া
বহুদিন পরে। হেথা উত্তর-পশ্চিমে
ছাতু আর লঙ্কা যত যেখানেতে মেলে
সমস্ত হইল ক্রীত। লঙ্কা কলিকাতা,
ছাতু সব পেশাওর মুখেতে চলিল।
আপনি বিপিনকৃষ্ণ ছাতুর সহিত।
বস্তা বস্তা ছাতু যায় কে করে গণন,
ভারতের প্রান্তে ক্রমে সব উপনীত।
সীমান্তে ইংরেজ যত, করিয়া সন্দেহ
বিপিনে জিজ্ঞাসে বার্তা, কি আছে বস্তায়,
কোথা হইতে আইল, যাইবে বা কোথা?
বিপিন বলিল, "ছাতু খাইবার বস্তু,
বাণিজ্য উদ্দেশে যাবে আফগান দেশে"।
ইংরেজ না ভুলি তায়, বলিল বিপিনে
পরীক্ষিতে হবে ইহা নতুবা ছাড়িয়া
দিব না একটি বস্তা। তথাস্তু বলিয়া
নিয়ম করিয়া পরে এক মাস কাল
বিপিন চলিয়া গেল আফগানস্থানে।
 সীমান্ত-রক্ষক ছিল মিস্টার ডনল,
সকল বস্তার ছাতু দেখিল খুলিয়া
এক এক করি, তার তথাপি সংশয়
না মিটিল। রসায়ণ পরীক্ষার তরে
প্রধান নগরে যত প্রধান বিজ্ঞানী,
তাদের সমীপে দিল নমুনা প্রেরিয়া।

বন্ধু পরীক্ষার পরে ভনশ-সমীপে
সিদ্ধান্ত উত্তর গেল—"দাহ্যমান নহে"।
বিপিন ইত্যবসরে আমীরের সহ
স্থাপিল সাহায্য-সন্ধি. রক্ষণ পীড়ন
নিয়ম হইল এই—আমীরের রাজ্যে
বিপিন পাইবে পথ বাঙ্গালীর তরে
অবারিত. হৈলে পরে ভারত-উদ্ধার.
ভারতের অর্দ্ধ অংশ আমীর পাইবে।
ঠিক এই মর্ম্মে সন্ধি পারশ্যের সহ
বিপিন করিয়া শেষে. ভারত সীমায়.
ছাতু লইবারে ফিরে আইল. লইল।
আরবের মরুভূমি উত্তরিয়া পরে.
সুএজ-খালের ধারে অযুত গুদাম
ভাড়া করি. ছাতু দিয়া বোঝাই করিল।
স্বদেশে বিপিনকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল।
হেথা কলিকাতা ধামে মহা হুলস্থুল.
ইংরেজ অসন্দিহান কিন্তু বরাবর।
ব্যাপৃত কামার যত বঁটি নিরমাণে.
সুন্দরীর কাঠে বাঁট গাড়িছে ছুতোর
বাঁশ সব কাটিয়া গাড়িছে পিচকারী।
চিতপুর খালধারে কুম্ভকার দল
মাটী তুলিবার ছলে, সুড়ঙ্গ কাটিয়া
চলিল গড়ের মুখে। গড়ের তলায়,
সেই সুড়ঙ্গ অন্তরে, লঙ্কা স্তুপাকৃতি
বোঝিত হইল. চুপি চুপি নিশিযোগে,
কেহ না জানিল বার্ত্তা, না সুধায় কেহ।
বাজারে পটকা যত মিলিল কিনিতে,
সব কিনি, সলতে তার ছিঁড়িয়া লইয়া.
পটকা লঙ্কাস্তুপে মিশাইয়া দিয়া.
রক্ষিত সলৃতের সূত্র সুড়ঙ্গের মুখে।

দিবা নাই, রাত্রি নাই, এ ভাবে উদ্‌যোগ,
শেষ হৈল এক দিন কার্তিক মাসেতে।

ইতি শ্রী ভারতোদ্ধার-কাব্যে উদ্‌যোগো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ

বাঙ্গালার বিভাবরী হইল প্রভাত!
আজি যেন নবোৎসাহে জাগিল বাঙ্গালা,
সমীর বহিল যেন সুনবীন ভাবে,

ভাবী-আনন্দের ভাবে হইয়া বিভোর,
প্রকৃতি পুলক-অশ্রু, শিশিরের ছলে,
সমধিক পরিমাণে ফেলিলেন যেন।

কামিনী বিপিনকৃষ্ণ, বসন্ত, রমণী,
আর যত বঙ্গবীর, গত রজনীতে—
উৎসাহ, আশঙ্কা, আশা, নৈরাশ্য পর্যায়ে
পীড়িয়াছে তাহাদের হৃদয় যেমন,—

উঠিয়াছে চমকিয়া রহিয়া রহিয়া,
নাহি ভুঞ্জিয়াছে তারা নিদ্রার বিলাস।
"সুস্বপ্ন সুস্বপ্ন" বলি প্রণয়িনীকুল
ধরিয়াছে তাহাদের বুক চাপি চাপি।

দুরু দুরু করে হিয়া প্রভাত যখন,
বিপিন বিশুষ্কমুখ, উঠিয়া বসিয়া
প্রণয়িনী পদপ্রান্তে, ধরিয়া চরণ—
"আজি রে সুন্দরি, দেখা জনমের মত
হয় বুঝি। আর বুঝি ও মুখ-কমল
হাসিবে না এ অভাগা-মুখপানে চাহি,
জনমের মত বুঝি হাসি ফুরাইবে;

একমাত্র আমি জানি তুষিতে তোমায়,
কে আর করিবে প্রীতি, সোহাগ, যতন,
আমি যদি যাই, প্রিয়ে, প্রাণের পুত্তলি!"
কান্দিলা বিপিনকৃষ্ণ ঝর ঝর ঝরে।

"সে কি প্রাণনাথ ! দেখি এ কি কুলক্ষণ ?"
উঠিয়া বলিল সতী, পতি-কর ধরি,—
"কোথায় যাইবে তুমি ? কেন হেন ভাব ?
নিবার নয়ন-বারি, রোদন তোমার
কভু নাহি শোভা পায় ; কি দুঃখে বা কান্দ ?
নাহিক চাকুরী, তাই যাবে কি বিদেশে
করিতে অন্নের চেষ্টা, করিয়াছ মনে ?
কাজ কি তোমার গিয়া, এত ক্লেশ যদি
পাও তুমি মনে, নাথ ! কাটনা-কাটিয়া
খাওয়াইব ঘরে বসি, ভাবনা কি তার !
অবশ্যই কোন মতে দিন কেটে যাবে ।"
"তা নয় প্রেয়সি", ব'লে ঈষৎ হাসিয়া
বিপিন, আরুদ্ধ-কণ্ঠ চিত্তের আবেগে,
—সে হাসি কান্নার সনে মিশিয়া সুন্দর,
রৌদ্র-বৃষ্টি এক সঙ্গে, হায় রে যেমতি
নববর্ষা সমাগমে—"তা নয় প্রেয়সি,
স্বদেশ উদ্ধার কল্পে বাহিরিব আজি,
করিব বিচিত্র রণ ইংরেজের সনে,
শেষে পরাস্তিব তারে, সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা-ধন,
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা ।"
"রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়া হইবে না,
কোথায় বাজিবে অঙ্গে"—চমকে বিপিন,
শিহরে, সর্বাঙ্গ তার কাঁটা দিয়া উঠে -
"দেখ দেখি যার নাম করিতে স্মরণ
অস্থির হতেছ হেন, সহিবে কেমনে ?
কে দিল কুবুদ্ধি ঘটে ? তার মাথা খাই,
দেখা যদি পাই এবে । বলি প্রাণনাথ,
দেশ ত দেশেই আছে, কি আর উদ্ধার ?
এতই অমূল্য ধন স্বাধীনতা যদি,
নিতান্তই দিবে যদি সে ধন কাহারে
আমারেই দাও নাথ, লব শিরঃ পাতি,

আমি তব চির দাসী।" "ভয় নাই সতি,
স্বদেশ-বাংসলা, স্বাধীনতা মহাধন,
বুঝিবে না মর্ম তুমি,—দর্শন, বিজ্ঞান
পড়াশুনা না থাকিলে বুঝা নাহি যায়।
তোমারে দিবার বস্তু নহে তা কদাপি,
কৌশলে যুদ্ধে দেহে কভ না বাজিবে ;
নিশ্চিন্ত যাইব রণে, উদাম ভাঙ্গিয়া
হতাশ্বাস, হতবল করিও না মোরে।"
"ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন ?"
"প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়,
যাত্রাকালে নেত্রজল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোন কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কাঁদিবারে হয়।"
"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ,
নিতান্তই দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
(ফুকারি কাঁদিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আজু চাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।"—বিপিন সম্মত।

এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।
তাড়াতাড়ি স্নান করি বঙ্গবীরবৃন্দ,
নাকে মুখে গুঁজিলেন ভাতে-ভাত দুটো।
কাঁপিতে কাঁপিতে, হায় আশ্বিনে যেমতি
শারদীয় মহোৎসবে অষ্টমী তিথিতে,
পূজার প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাঠে
বিল্বপত্র চর্বে, যবে ছেদক আসিতে
বিলম্ব করয়ে কিছু ; অথবা যেমন
মার্গশীর্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
যাত্রা করি একে একে বীর শ্রেষ্ঠ যত
সভাগৃহে উপনীত হইলা সকলে।

আইল তাড়িত বার্তা—"ফেলা হইয়াছে,"—
বুঝিলা সে বীরবৃন্দ, নিরূপিত দিনে

পূর্ব্বের সঙ্কেত মত, সুয়েজে যে ছাতু
বিপিন আসিয়াছিল সঞ্চিত করিয়া
তথাকার কর্মচারী গাঢ় নিশিযোগে
সে সব নিক্ষেপিয়াছে সুয়েজের খালে,
শুষিয়াছে যত জল, খাল বন্ধ এবে,
আনন্দে বিষম রোল হৈল, করতালি,
"জয় ভারতের জয়" শব্দ সভাতলে ;—
ইংরেজের ভবিষ্যৎ পথ রুদ্ধ এবে।

চলিলা সে যোদ্ধৃদল মহাতেজে ভরি।
উড়িতেছে দূর শূন্যে বংশদণ্ডোপরি
রঞ্জিত বাসন্তি রঙ্গে, মদন-মূরতি
সুলাঞ্ছিত, ভারতের নাম আঁকা তাহে,
পতাকার শ্রেণী, আহা পত পত স্বনে,
সঞ্চারি অরাতি-হৃদে কালান্তের ভয়।
বাজিতেছে রণবাদ্য তবলার চাটি,
(কটিতে আবদ্ধ যাহা) মৃদঙ্গ, মন্দিরা,
সেতার, ফ্লুট, বীণ ঘুঙ্গুরের সনে
সুমধুর ভীমরবে, রৌরব চৌদিকে।
প্রত্যেক যোদ্ধার করে ভীম পিচ্‌কারী
কাহার বা বঁটি হাতে,—চলে বীরদর্পে,
কাঁপাইয়া শত্রু হিয়া কাঁপাইয়া মহী।
মুখে জয় জয় শব্দ, আকুলিত দেশ।
বিপিন, কামিনী চলে পশ্চাতে পশ্চাতে
সকলে উৎসাহপূর্ণ, হায় রে যেমতি
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভীদল গোষ্ঠের সময়ে।

গড়ের সম্মুখে গিয়া বীরবৃন্দ এবে
দাঁড়াইলা ব্যূহ রচি, অপূর্ব সে ব্যূহ,
চক্রাকৃতি, চতুষ্কোণ, অর্দ্ধচন্দ্র প্রায়,
অদ্ভুত শ্রবণাকৃতি, শ্রবণ অন্তরে,
করাল কাতার দিয়া দাঁড়াইলা সবে
পটকা এক এক হাতে। বিপিন-আদেশে,
প্রসারি দক্ষিণ বাহু যথাসাধ্য যার,

সবলে নয়ন মুদি মুখ ফিরাইয়া
কলসে পটকা পূরি, সংযোগি অনল
নিক্ষেপিল মহাবেগে গড় অভিমুখে।
ভাবিল তামাসা কিছু হইছে বাহিরে,
ইংরেজ-সৈনিকদল, যত ছিল গড়ে
দৌড়াদৌড়ি বাহিরিল রঙ্গ দেখিবারে,
—হায় রে না জানে তারা, অদৃষ্টের বশে,
কালের করাল রঙ্গ হইতেছে এবে।
সিকতা-মিশ্রিত জলে পূরি পিচ্‌কারী
হানিল বাঙ্গালী-সৈনা ইংরেজের আঁখি
লক্ষ্য করি, কচকচি কাচালি নয়ন
বিষম বিভ্রাট তবে জানিল ইংরেজ।
"জয় ভারতের জয়"—ঘোর জয়ধ্বনি
ছাইল বিমান মাগ, হুড়াহুড়ি করি
পশয় গড়ের মধ্যে ইংরাজের দল।
পুনশ্চ ইংরেজ-সৈনা বাহিরিল বেগে,
সসজ্জ সশস্ত্র এবে, বন্দুক, সঙ্গিন,
ঝকঝকি ঝলসিল বাঙ্গালী-নয়ন,
কোষের ভিতর হ'তে কিরিচ-ঝঞ্ঝনা
বাঙ্গালী-হৃদয়ে ভীতি উপজি ক্ষণেক।
সেনাপতি-আদেশেতে, আরাতির দল
করিল আওয়াজ ফাঁকা ধড় ধড় ধড়,—
বাঙ্গালী অৰ্দ্ধেক সৈনা পড়ে মূর্চ্ছাগত।
তথাপি সে রণে ভঙ্গ না দিয়া বাঙ্গালী,
অর্দ্ধবল, আরম্ভিলা ঘোর যুদ্ধ এবে।
সুড়ঙ্গের মুখে সল্‌তে ছিল সুরক্ষিত,
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন,
পট পট ভীম শব্দে গড়ের ভিতর,
গড়ের বাহিরে তথা, যথায় ইংরেজ
সৈনাশ্রেণী দাঁড়াইয়া, ক্ষিতি বিদারিয়া
গর্জিয়া উঠিল ধূম লক্ষ্য লক্ষ করি,
ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হইল দশ দিক,

প্রবল লঙ্কার ধূম প্রবেশি অরাতি-
নাসারন্ধ্রে, গলে, হায় খক্ খক্ খকে
কাসাইল শত্রুদলে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচে
হাঁচাইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।
তদুপরি বালিজলে প'ড়ে পিচকারী-
কাতর ইংরেজ কুল, স্খলিয়া পড়িল
হস্ত হইতে ভূমিতলে সমস্ত বন্দুক।
কুড়াইয়া সে বন্দুক বাঙালী-সৈনিক
মহাবেগে গঙ্গাজলে নিক্ষেপিল এবে।

সুশিক্ষিতা অশিক্ষিতা বিবিধ রমনী—
কাহারো চশমা চক্ষে, গৌনপরা কেহ,
কাপেট-শিল্পিনী কেহ বুনিছে সুন্দর,
মখমলে উল-ফুল—দাঁড়াইয়া ছাদে
এ উহারে দেখাইয়া বীর্য বাখানিছে,
কেহ বা হেরিয়া মুগ্ধ, দেখিছে নীরবে।
মোহন হাসির ছলে কোন সীমন্তিনী
পুষ্প বরিষণ করে বাঙ্গালী উপরে।
ধন্য রে বাঙ্গালী-শিক্ষা! ধন্য রে কৌশল!
ধন্য রণ বাঙ্গালীর! ধন্য বীরপণা!
বিচিত্র সাহস তার কেমনে বাখানি।
স্তব্ধ দেব দৈত্য, দেখি বাঙ্গালী-বীরতা।
অস্ত্রহীন অরিকুল, ব্যাকুল ভাবিয়া,
পুনঃ প্রবেশিল সবে গড়ের অন্তরে,
করিল মন্ত্রণা ঘোর অর্দ্ধদণ্ড কাল।
পুনঃ জয়-জয় ধ্বনি উঠিল আকাশে,
"জয় ভারতের জয়", কাঁপিল ইংরেজ।
মাচায় আঁজিয়াছিল অলাবুর লতা
পতিপ্রাণা মেমকুল ব্যঞ্জনের তরে,
সেই সব মাচা খুঁজি তন্ন তন্ন করি
অগণ্য অলাবু এবে করিল বাহির,
অলাবুর প্রহরণে সাজিয়া আবার
গদাযুদ্ধে অগ্রসর হইল ইংরেজ।

ইংরেজ-বাঙ্গালী পুনঃ আরম্ভিল রণ,
নির্ভীক বাঙ্গালী-বীর বঁটি ধরি করে
কচ্ কচ্ লাউ কাটি করে খান খান।
অলাবু-প্রহারে কিন্তু বিষম আহবে,
অস্থির বাঙ্গালী-সৈন্য তিষ্ঠিবারে নারে,
পড়িল সৈনিক বহু।—দেখি মিত্রক্ষয়,
সারি দিয়া দাঁড়াইয়া বঙ্গ-বিলাসিনী
নয়নে অজস্র অশ্রু বর্ষিতে লাগিল
অরাতি-বদন লক্ষ্য; অসংখ্য ইংরেজ
পপাত সে ভূমিতলে, মমার চ বহু,
রণে ভঙ্গ দিল যারা ছিল অবশেষে,
মাগিল জীবন ভিক্ষা বিনয়ে, কাতরে।
তথাপি উকীল-সৈন্য বঁটি হস্তে করি,
বাম করে শামলার ঢাল শোভিতেছে,
পড়িল অরাতি মাঝে—পলায়নপর
আপনি যাহারা এবে। জয়-জয় রবে
আচ্ছন্ন করিল দিক, হারিল ইংরেজ!
শান্তির প্রস্তাব যবে করিল অরাতি,
উকীল সম্মতি দিল; হইল নিয়ম
দেশে না যাইবে কেহ ইংরেজ যতেক
অনুমতি না লইয়া; থাকিবে ভারতে
ভৃত্যভাবে, ভারতের করিবেক সেবা।
যে যেমন আছে এবে রহিবে তেমতি।
স্বাধীন বাঙ্গলা এবে, স্বাধীন ভারত,
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙ্গালী ভারত-প্রাণ হইল বিখ্যাত,
ভারত-উদ্ধার যবে হইল হেন মতে।

হউক বা না হউক ভারত-উদ্ধার
চারি আনা পাই, সদ্য এই উপকার।

ভারত-উদ্ধার কথা অমৃত-সমান ।
দ্বিজ রামদাস ভণে শুনে পুণ্যবান ॥

ইতি শ্রীভারতোদ্ধার কাব্যে উদ্ধারো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ।
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ।

[ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী—১৩৩২ বঙ্গাব্দ ; কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ।]

টীকা—

১ অবুবাণ—যে শিশুর কথা ফোটে নি ।
২ দ্বিতীয়িলে—ইংরেজীতে কোনো প্রস্তাব সমর্থন অর্থাৎ second করা অর্থে ।
৩ উট্—কৃতবহন—carry out অর্থে ।
৪ দৃঢ়ীকৃত—সভায় পূর্ব প্রস্তাব confirm করা অর্থে ।
৫ নিয়ম-নিয়ম—'order-order'—অর্থে ।
৬ আর্কাঙ্খ—প্রার্থনা করি ।
৭ দয়িয়া দয়া করিয়া ।
৮ মলম্বা—গিল্টি-করা ।
৯ না পাড়তে তোপ—সে-সময় ভোরে তোপ পড়ত ।

সুরেন্দ্রায়ণ

['পঞ্চানন্দ' বা 'পাঁচুঠাকুর' নামে ইন্দ্রনাথের যে ব্যঙ্গরচনাগুলি 'পঞ্চানন্দ' এবং 'বঙ্গবাসী'-তে প্রকাশিত হয় এটি সেগুলির অন্যতম । ইল্‌বার্ট বিল সংক্রান্ত ব্যাপারে আদালত অবমাননার জন্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু মাস কারাবরণ করতে হয় । এই ঘটনাটি অবলম্বন করেই ইন্দ্রনাথ এটি রচনা করেন । লেখাটি গদ্য-পদ্যের সমন্বয় । কিছুটা গদ্যাংশ সমেত কবিতার মূল অংশটি উদ্ধৃত হল ।]

বিচারক নরেশচন্দ্র [হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি নরিস সাহেব যিনি সুরেন্দ্রনাথকে আদালত-অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন] কাঁদিতে কাঁদিতে কর্তা বিচারকের কাছে উপস্থিত । বলিলেন—"দাদা, ঐ বাঁড়ুযোদের সুরেন, ঐ যে-ছোঁড়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দেশের লোককে ক্ষেপায়, ঐ সুরেন আমায় যাচ্ছেতাই বোলে গালাগাল দেচে, আমায় কত-কি বোলেচে, আমায় বড্ড অপমান করেচে,

ওর একটা কিছু করো, নৈলে এ প্রাণ আমি রাখবো না, এ মুখ আর আমি দেখাবো না। আর আগে কতবার কত কথা বলেচে তা আমি কিছু বোলতে পারি নি। এবার আমার কোনও দোষ ছেলো না, মিচিমিচি আমায় যাচ্ছেতাই বোলেচে, তোমার পায়ে হাত দে বোলচি দাদা, এবার আমার কিছু দোষ নেই। আমি ও ভালো মন্দ কিছু জানি নে, তা সুমুকে যাকে পেয়েচি তাকেই জিজ্ঞেস কোরে তবে কাজ কোরেচি, তা তাদের কিছু না বোলে সুরেন কেন আমায় গাল দেবে? এর বিহিত একটা কোত্তেই হবে: নৈলে দাদা—আঁ্যা আঁ্যা—আমি বুঝি সস্তা হাকিম বোলে উঁ্যা আমি বুঝি কম দরের লোক বলে—আঁ্যা—" বলিতে বলিতে দরবিগলিত নয়ন-ধারায় নরেশের বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

তখন জলদ-গম্ভীর স্বরে দাদার জীমূত-মন্দ্র হইল,

"তবে রে পাষণ্ড যণ্ড দুষ্ট দুরাচার!
বাঙালীকুলের গ্লানি, অ-সিভিলিয়ান,
বাঙালী-ঢাদক তুই বাঙালীর মুখে
দিলি গালি যাচ্ছেতাই বলিয়া নরেশে
কনিষ্ঠ সোদরে মম! নয়নের পানি
নিকালিলি রে নিষ্ঠুর, কঠোর ভাষণে
তার প্রতি। আজি কোপে পড়িলি রে আজ,
রক্ষা নাই, রক্ষা নাই, রোষাগ্নিসম্মুখে
মম তোর। ফর্‌ফরে অগ্নিশিখা যথা
উঠয়ে জ্বলিয়া, চালে টিকার আগুন
ফুৎকারিয়া সংযোজিলে, মধ্যাহ্ন-মরীচে
যে চালের খড় তপ্ত—হায়রে তেমতি
জ্বালাইব তোরে আমি যা থাকে কপালে।
তোয় জ্বালাইতে যদি বঙ্গদেশ জ্বলে,
প্রান্ত হতে প্রান্ত যদি অগ্নিময় হয়,
তবু না ডরিব আমি, ক্ষান্ত না হইব।

পুড়েছিল হাত মুখ, তা ব'লে কি হনু—
তোদেরি রামের দাস, তোদেরি সে হনু—
লঙ্কাচালে লেজানল লাগাইতে কভু
ভুলিয়া ভাবিয়াছিল অগ্র কি পশ্চাৎ?"

কহিলা নরেশে লক্ষ্য,—"যাও ভাই, নিজ
সিংহাসনে উপবেশি,—(বেশি কিছু নয়)—
ফুলবাণ হানো গিয়া মন্ত্রপূত করি,
আত্মসার করি আগে। করিতেছি পণ,
তব শিরস্পর্শ করি, এই বাণে হবে,
অ-সুরেন অ-গার্থ* বা, ব্যর্থ নাহি বলি।
কিন্তু ভাই এক কথা, যা বোলে সুরেন
তোমারে দিয়াছে গালি মিথ্যা ত এবার ?"

উত্তরিলা বিচারেশ নরেশ সুমতি,
শান্ত ভাব পরিগ্রহি, যুড়ি দুই পাণি,—
"পূর্বকৃতি, নিতি নিতি, স্মৃতিপথে আনি,—
গঞ্জ, দাদা, নিজ দাসে ; দোষ কিন্তু আজি
নারিবে বলিতে, সুধাইবে যারে !
কুগ্রহ আমার, তাই নিগ্রহ প্রকাশি,
অবিশ্বাস করো দাদা ! নহিলে, বিগ্রহ
বিরাজে অলিন্দে আজি, তারে স্পর্শ করি
শপথিতে পারি আমি, পারে অন্য লোকে,—
সুরেন যা বলিয়াছে, ঠিক সত্য নহে।"
ধাইল বিষম ফুল শূল সম তেজে,—
আনিল সুরেনে ধরি ভুল ভ্রান্তি কিছু
না মানিয়া না শুনিয়া, ফেলিল সুরেনে।
আপনি আপন মান বজোরে* বাজায়,
করিয়া বিচারিবৃন্দ, আনন্দে অপার,
নিজ মাথে নিজে নিজে পুষ্প বরিষিল ;
নিজ জয় রবে নিজ ঘর ফাটাইল ;
ভাবিল উল্লাসে অতি গৌরব বাড়িল !

(ক্ষুদ্র এক কথা কবি কাতরে কহিবে,
ভরসা, সকলে ইহা স্মরণে রাখিবে।
পাঁচু যবে কবি হয়, চড়ে কল্পনায়,
সত্য মিথ্যা ভেদ তার, তখনি ফুরায় ;

উপরে যা বলা গেল, বিচার-ব্যাপার,
সত্য বলি, এক কথা সত্য নহে তার।
কেবল কল্পনা-লীলা ছন্দের ছাঁদুনি,
ক্ষেপার খেয়াল শুধু আখর-বাঁধুনি,
ইচ্ছা নাই করিবারে কোর্টাবমাননা,
ধর্ম্ম জানে, সাধ নাই যেতে জেলখানা।)

[ইন্দ্রনাথ-গ্রন্থাবলী—১৩০২ বঙ্গাব্দ]

টীকা—

১ অ-গার্থ—গার্থ অর্থাৎ Sir Richard Garth ; ইনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদালত-অবমাননার বিচারের সময় বিচারক-মণ্ডলীর প্রধান ছিলেন।

২ পজোরে— সজোরে।

রাজকৃষ্ণ রায় [১৮৪৯-১৮৯৪]

[গান]

রামপ্রসাদী সুর

খাম্বাজ-জংলা—একতালা।

মিছে আসার অহংকারে,
বুক ফুলিয়ে, চেন্ দুলিয়ে
'হাম্‌বড়া' ভাই ! বল কারে ?
পরের হাতে কলের পুতুল
জেনেও কি তা জানো না রে
ধমক শুনে থমকে দাঁড়াও,
তবু লাফাও কোন্ বিচারে ?
আত্মবলে ঘোড়া গাড়ী
দ্বারে সিপাই পাহারা রে ;
মনিব সেজে নফর খাটাও
নিজে নফর ভাবো না রে !

[গান]

রামপ্রসাদী সুর

খাম্বাজ-জংলা—একতালা।

মন বসে না দেশের হিতে.
বাগান-ভোজে খাও রে মজে—
গরিবগুলি পায় না খেতে।
গেজেটে নাম উঠবে ব'লে
টাকা ঢালো চাঁদার খাতে ;
তেলা মাথায় তেল ঢেলে দাও.
ক্ষুধিত ব'সে খালি পাতে।
হুজুর হুজুর ব'লে দাঁড়াও
হাজার সেলাম ঠুকে মাথে .
কাজের বেলায় কাণা হলে.
দেশটা গেল অধঃপাতে।

['ভারত-গান'—ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একশত গীত। রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত. কলকাতা. ১২৯০ বঙ্গাব্দ]

অমৃতলাল বসু [১৮৫৩-১৯২৯]

[গান

ঘন-ঘন-ঘন-ঘন-ঘনং বাবুদের বিলাত গমনং ॥
ধর্মের বেড়েছে মাত্রা
সমুদ্রে হবে যাত্রা.
বাপের হয় না গঙ্গাযাত্রা গৃহে মরণং ॥
আসছে সব বিধি নিতে.
এমন বিধি হবে দিতে
দেখেন নি যা বিধির পিতে চৌদ্দভুবনং ॥

মহাতীর্থ কলিকালে
পুরাণে লণ্ডনে বলে,
পুঁথি খুলে দিব বলে নাস্তি খণ্ডনং ॥
অয়েদেতে স্পষ্ট উক্তি,
চাহ যদি পরা মুক্তি
ভক্তি ভরে পেটং ভরে মুরগী মারণং ॥
আকণ্ঠ মটনং খেলে,
বৈকুণ্ঠেতে যাবে চলে,
অথাদ্য সংযোগে মদ্য সদ্য শোধনং।
জলযোগে নিশিযোগে শাস্ত্রভোজনং
ইতি শাস্ত্রশাসনং ॥

('কালাপানি' প্রহসন—১২৯৯ বঙ্গাব্দ।)

[গান]

পু। (এই) আজ থেকে দেশের কাজে কর প্রাণপণ।
স্ত্রী। (বলি,) সেইটুকু মন সংসারেতে দাওনা প্রাণধন ॥
পু। দেশে দেশে কমিশনার হবে ইলেক্‌শন।
স্ত্রী। টাকার জোরে লাঠির তোড়ে মোড়ল সিলেক্‌সন্ ॥
পু। ভারতমাতার তরে হবে খুলতে চাঁদার খাতা ;—
(লক্ষ লক্ষ লক্ষ) খুলতে চাঁদার খাতা।
স্ত্রী। আমত মায়ের বিছানাতে দেখছি ছেঁড়া কাঁথা,—
(ইল্লি ঝিল্লি খিল্লি) দেখছি ছেঁড়া কাঁথা ॥
পু। বিধবাদের বিবাহের উপায় করি কি,
(ওহো ওহো ওহো) উপায় করি কি !
স্ত্রী। (ঘরে) ধুবড়ো মেয়ে চুবড়ী-চাপা পাড়ায় ঢি ঢি,—
(ওগো ওগো ওগো) পাড়ায় ঢি ঢি ॥
পু। যত আছে গ্রেডিস্ কর্ব সব অন্ত,—
(পুজো-পার্বণ বামুন-ভোজন) কর্ব সব অন্ত ॥
স্ত্রী। কাল থেকে যে চাল বাড়ন্ত বুঝছো হনুমন্ত,—
(হাঁড়ী ঢন্‌ঢন্—কেঁদে ঠন্‌ঠন্) বুঝছো হনুমন্ত ॥

('গ্রাম্য-বিভ্রাট' প্রহসন—সূচনা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ)

একটি 'চাণক্য-শ্লোক'

[সেল্‌ফ্‌ গভর্ণমেন্ট, মিউনিসিপ্যাল ডিবেট, ভোটিং ইত্যাদি ব্যাপারে জ্ঞান দানের জন্যে গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট একটি পলিটিক্যাল পাঠশালা করেছেন ; সেই পাঠশালায় ইংরেজ পলিটিকাল মাস্টার ও বাঙালি গুরুমশায় ছাত্রদের শিক্ষা দেন। ছাত্ররা একদিন একটি চাণক্য-শ্লোক শুনতে চাইলে গুরুমশায় বললেন]—

গুরু—

সাহেবশ্চ বাঙ্গালীশ্চ নৈবা তুল্য কদাচন।
সাহেব দদাতি থাপ্পড়, বাঙ্গালী হর্ষে খাদতি ॥
শ্বেতচর্ম-বর্ম সাহেবশ্চ রক্ষতে সর্ববিপদে।
কৃষ্ণচর্মাবৃত প্লীহা ফাটাস্তি চ পদে পদে ॥
পর্বতে রাজতে গোরা, পীড়িতং পুষ্প সৌরভে।
ড্রেনাঘ্রাণে বর্দ্ধিতং বঙ্গ, শ্রীমুন্সিপাল[১] গৌরবে ॥

[গুরুমশায়েরই অনুবাদ—]

সাহেবেরা আমাদের তুল্য নহে হক্।
সাহেব থাপ্পড়দাতা বাঙ্গালী খাদক ॥
শ্বেতচর্মে সাহেবের সর্বদোষ কাটে।
কালোচামড়াকা পীলা পদে পদে ফাটে ॥
গিরি-বাসে পুষ্প বাসে সাহেবের রক্ষা।
মুন্সিপাল ড্রেনাঘ্রাণে বঙ্গ স্বাস্থ্য রক্ষা ॥

['গ্রাম্য-বিভ্রাট' প্রহসন—১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য,]

টীকা—

১ শ্রীমুন্সিপাল—মিউনিসিপ্যালিটি।

প্রোক্লামেশন

[১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের সময় লেখা ।]

বিনয়ে শুধাও গিয়া সিংহাসন তলে ।
মহাসভা-সভ্য সেই ইংরাজের দলে ॥
প্রথমে বলেন রাণী যে-সব বচন ।
সম্রাজ্ঞী রূপেতে পরে করান স্মরণ ॥
সু-পুত্র সম্রাট হ'য়ে দিয়াছেন রায় ।
অক্ষরে অক্ষরে যাহা রহিবে বজায় ॥
সেই সব বচনের প্রকৃত কি অর্থ ।
হ'বে কি রক্ষিত তাহা কখনো যথার্থ ॥
মেনে লব রাজ-বাক্য জ্ঞান করি বেদ ।
শ্বেত কৃষ্ণে কিছু মাত্র রবে না প্রভেদ ॥
বাজার গরম এই চাকরীর হাটে ।
কোরা কালো ব'সে যাবে ধলো গোরা-পাটে ॥
করিয়া গোরার কাজ কালোর বেতন ।
হ'বে কি কখনো ঠিক গোরার মতন ॥
মিষ্টার ফুলার' যদি বধে কেষ্টা কুলি ।
সত্য কি মরিবে গোরা ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলি ॥
কেষ্টার ঘুসির-বৃষ্টি নাসিলে ফুলার ।
হবে কি সিদ্ধান্ত পিলে ফেটেছিল তার ॥
জিজ্ঞাসা করিও ভালো ক'রে কসামাজা ।
ইংরাজ-বণিক ছাড়া আর কে কে রাজা ॥
ম্যাঞ্চেষ্টার যদি হয় কেষ্টারে বিরূপ ।
ভূপের ব্যবস্থা তাতে হইবে কিরূপ ॥
মরে যদি কেষ্টা তাঁতি ক'রে কুলিগিরি ।
তার পুত্র সূত্রকর্ম পাবে কি গো ফিরি ॥
দুর্ভিক্ষ যদ্যপি দেশে ব্যাড়ে ব্যাড়াজাল ।
তবু কি রপ্তানি বন্ধ হবে কভু চাল ॥
অতি কাঁচ ছেলেদের ঢুটিতে পকেট ।
কত দিনে হবে বন্ধ আসা সিগারেট ॥

কেবল পকেট নয় ইঁচড়ে বখাট।
দোকানে ঢোকেন চলে শীঘ্র আনে খাট ॥
মরিলে কলুর কলু কেরোসিন তেলে।
কলুনীর চুলো কি গো রাজা দেবে জ্বেলে ॥
কখনো দেবে না হাত ধর্মেতে প্রজার।
এ কেমন কথা শুনি মুখেতে রাজার ॥
অত্যাচার করিবে না যদি অর্থ হয়।
জিজ্ঞাসিও সে-কথা কি বেশী অতিশয় ॥
"ডিফেণ্ডার অফ্ দি ফেথ্" যাহার উপাধি।
কোন্ লাজে সে হইবে ধর্মেতে বিবাদী ॥
খৃষ্টানের মত পার্শী হিন্দু মুসলমান।
পাবে কি রাজার দ্বারে টান দান মান ॥
খুন হত্যা হয় যদি চীনের ক্যাণ্টনে।
যাবে কি শাসিতে চীনে গোরার পল্টনে ॥
জাতি ধর্ম বর্ণ ভেদ না করি বিচার।
বিদ্যার কৌশলে পদ বাড়িবে প্রজার ॥
বহুদিন হতে মনে আছে এক ধাঁধাঁ।
এ কথাটি কে কাহাকে বলিতেছে দাদা ॥
ইংরাজ জাতির ভাব, ভু-পালের ভাষ।
অমৃত-সমান কথা শুনে হিন্দু-দাস ॥
এ বর্ণের অর্থ কি গো নহে চতুর্বর্ণ।
যাদের পৈতৃক সত্ত্বে নাহি দিবে কর্ণ ॥
"কাষ্ট্ ক্রিড্ কলারের" এইরূপ মানে।
এক বোকা করিয়াছে খামকা এখানে ॥
মহাসভা সভাদলে বোলো ভালো করে।
বোকার বোকামি যেন কার্যে দেন ধরে ॥
আরো নানা কথা আছে সেই ঘোষণায়।
তন্ন তন্ন মানে বুঝে এস সমুদায় ॥
তাৎপর্যটি একবার হয়ে গেলে ধার্য।
কোন কার্যে ভবিষ্যতে হবে না আশ্চর্য ॥
"রাইট্ রাইট্" ব'লে না ক'রে চিৎকার।
মর্মে মর্মে কৃষ্ণচর্মে দানিব ধিংকার ॥

হিন্দুর চক্ষেতে রাজা দেবশক্তিময়।
মারো কাটো ভালবাস তবু গাব জয় ॥

[প্রথম প্রকাশ—'ভারতী' পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১০১২ বঙ্গাব্দ ; ১০১০ বঙ্গাব্দে বসুমতী থেকে প্রকাশিত 'অমৃত-গ্রন্থাবলী'-র ১ম খণ্ডে সংকলিত।]

টীকা।—

১। মিস্টার ফুলার—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে খণ্ডিত বাংলার পূর্ববঙ্গ ও আসামের অত্যাচারী কুখ্যাত ছোট লাট—স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার।

[গান]

হায় হায় কোথায় গেল
আমাদের সেই অসভ্য সেকাল
হ'ল সভ্য হ'য়ে লভ্য মাত্র গোরার চোরা চাল ॥
মুখে বলি লম্বা কথা ভালোবাসি দেশ,
দেশের আচার-ব্যবহার-রং তামাসা হ'য়ে গেছে শেষ,
আছে মাত্র গায়ে কালো রংটি অবশেষ,
তাও দপদপাতে ধবল করে সাবানেতে মাজি ছাল।
দেশকে ভালোবাসি ব'লে ছাড়ি চাপকান চোগা,
আগে রাখতেম দাড়ি, এখন কামাই গোঁফের ডগা,
মাকে রেখে গাঁ আগলাতে
মাগের সঙ্গে কচই রঙ্গে সহরেতে কাটাই কাল ॥
আর বলি হিন্দু বলি বলি আমরা সনাতন,
বলি আর্য-কীর্তি কাশী গয়া মথুরা বৃন্দাবন,
কিন্তু প্রেতের নৃত্য তীর্থে চলে
মনকে বোঝাই কলিকাল ॥
সাহেব সাজো মোগল সাজো সাজো ইওয়ান
বাঙ্গালী নামের করো নাকো গয়ায় পিণ্ডদান,
রাখো বাংলার পাল-পার্বন খেলা ধুলো
নিজের জেতের ভাতের থাল—
ভাড়াটে কোটার চেয়ে অনেক ভাল বাপু ভিটের
খড়ের চাল ॥

['সঙের ছড়া'—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ]

[গান]

এবার হুইস্কির বাজার মাটি, হায় হায় একদমসে মাটি।
আজ হপ্তাখানেক টানছি খালি দু-দশ ছটাক খাঁটি ॥
বলি—যে যা পারি নিজের মতন করা চাই তো কাজ,
তোমরা গোরার গোলামি ছাড়, আমি তার মদ ছাড়লুম আজ,
তবে রাজভক্তি করতে মজায়, রাখবো বজায় ধানেশ্বরীর ভাঁট।
বলি—ব্রাণ্ডি বল, হুইস্কি বল, বল দোয়াস্তা
পেটে গেলে সবাই সমান দিশীটুকু সস্তা।
আহা হয়েছে তেমনি নয়ন ঢুলু ঢুলু,
কাপড়-চোপড় আলু-থালু,
হায় হায়—টলছে তেমনি পাটি।
অভাব খালি পাহারোলা সাব্,
যেন ফাঁক ফাঁক ঠেকে ঘাঁটি ॥

['সাবাস বাঙালী' নাটক—১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ]

[গান]

তোমায় মনে মনে ভালোবাসি প্রাণের পাহারোলা।
জানি, লাট সাহেব তো তোমার নীচে তুমি ওপরওলা ॥
বলি জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট বড়লাট তবু মানে একটা আইনের সাট,
তোমার নাইকো ও-পাট, খোলা কপাট,
মিশ্টি কি তোর শালা বলা ॥
তোমার আগে ছিল খালি ডাণ্ডা, এখন আবার লাঠি,
চোরের ভয়ে ভোরের বেলা ঘুমোও আগলে ঘাঁটি।
কি নাক ডাকে ভাই, বলিহারি যাই,
যখন সিঁদেল দেখায় কলা,
আর চম্‌কে উঠে ধর ছুটে দুর্বল সব মাতোয়ালা ॥

['সাবাস বাঙালী' নাটক—১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ]

[গান]

(ভোটেশ্বরী দেবীর সম্মুখে উপাসক-উপাসিকাগণ)

নারীগণ । তেত্রিশ কোটির ওপর ঠাকুর তুমি ভোটেশ্বরী ।
নারদ ঋষির মানস-কন্যা দন্তে লম্বোদরী ॥
আত্ম-বন্ধু-প্রীতি যথা থাকে গলাগলি,
তোমার দৃষ্টি সৃষ্টি তথা করে দলাদলি,
মদ না খেয়ে পদের তরে ঢলাঢলি ঘরাঘরি ।

পুরুষগণ । আমরা দলের পাণ্ডা, মেজাজ ঠাণ্ডা করতে ডাণ্ডা ধরি ।
কোথাও পাঠাই দৈত্য-দানা কোথাও পাঠাই পরী ॥

নারীগণ । ভোটেতে যে একটি দিন ছোটর বাড়ে গর্ব,
মুটের দোরে রাজা জুটে, বলে আমি খর্ব,
বিলাত থেকে খেলাৎ ব'লে পর্ব এল শুভঙ্করী ॥

পুরুষগণ । ভোটে ইষ্ট, নেতা তুষ্ট, দল পুষ্ট কষ্টে কাতরং ।
স্বার্থ গন্ধে অন্ধ তাই বন্ধ 'বন্দে মাতরং' ॥

সকলে । বরদে এ বিরোধে পরিয়েছ মা সাদা গরদ,
রেষারেষীর নাম দেছ গো দেশের দরদ,
পূজে তোমার পদ, ক'রে গুরু বধ,
নাম কিনেছি মস্ত মরদ ।
অ-মুসলমান ব'লে পেয়েছি সম্মান,
গেছে হিন্দু-পরিচয় :
অজাতে বলিয়া বিখ্যাত জগতে গাই স্বজাতের জয় ।
শুধু কুড়াইয়া ভোট হব সব লোট্
কোট বজায়ে বর ভিক্ষা করি ,
সুহৃদ-মর্দিনী, বিরোধ-বর্দ্ধিনী,
ব্রিটিশ-তোষিনী দেবী ভয়ঙ্করী ॥

['বন্দেমাতরম্' প্রহসন—১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ।]



১৮৯১ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন উপলক্ষে লেখা কবিতার একটি ব্যঙ্গচিত্র। 'জন্মভূমি' চৈত্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।



শিল্পী শ্রীচঞ্চল বন্দোপাধ্যায়
ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও খদ্দরের বজ্রমুষ্টিতে ম্যানচেষ্টারের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।
'বিজলী' ১০ আশ্বিন, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ

[গান]

(এই) ভোটের কোঁদল দেখে ইচ্ছে করে গোঁদল পাড়ায় যাই।
শ্বশুর ভাশুর ভাই কি জামাই কারুর কামাই নাই ॥

(এই) ভোটের ল্যাটায় বাপে ব্যাটায় বেঁধেছে লড়াই,
ভায়ে ভায়ে বাক্য বন্ধ দ্বন্দ্বেতে চড়াই,
কি তোমার তেজ, ওগো ইংরেজ, কি বিষের বড়াই,—
কি পড়া পড়ালে কি বিদ্যে ছড়ালে বাড়ালে কি বাই ;
ক'রে দেশ দেশ বুঝি অবশেষ
চির্ঝাপ্রয়জনে হায় গো হারাই ॥

['বন্দেমাতরম্' প্রহসন—১৩০৩ বঙ্গাব্দ]

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু [১৮৫৪-১৯০৫]

ভারতমাতার শ্রাদ্ধ

প্রথম সর্গ

কাঁদে গয়ারাম গুরু গভীর গর্জনে,—
"Awake O Mother ! arise, awake.
কথা ক' মা, জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি—গয়ারাম ;
তোর তরে খেটে খেটে গায়ে নাই রক্ত ;
ব'কে ব'কে ভেঙ্গে গেছে গলা, লিখে লিখে 'নিব্'
কত ভোঁতা—'জে' মার্কা ; কি আর অধিক ক'ব,
কোমরে ধরেছে ফিক্—গাঁটে গেঁটে-বাত,—
ভ্রমি কত রেলপথে দেশ-দেশান্তরে।
আবার ডাগর ডাকে ডাকি গো জননি !
Awake, O Mother ! arise, awake."
তথাপি ভারতমাতা নাহি দিল সাড়া ;

স্তিমিত নয়ন-যুগ্ম মলিন বদন,
বিশুষ্ক অধরপ্রান্ত, নিশ্চল শরীর,
এলোমেলো কেশরাশি--আছেন পড়িয়া ।
তখন ফুকারি কেঁদে উঠে গয়ারাম,
"মা মোলো, মা মোলো বুঝি হ'ল সর্বনাশ !
কোথা হে মিস্টার যদু, মিস্ ক্ষুদিরাম,
মিসেস পাঁচী বা কোথা--এসো অসময়ে ,
এ সাধের মাকে বুঝি নারিনু বাঁচাতে ।"
মাতার সঙ্কট শুনি এলো ধাওয়াধাই,
ভজহরি, পাঁচকড়ি, ক্ষুদিরাম, যদু ;
বাম করে স্ত্রীলোকের হাত দেখে ক্ষুদি--
যদু চোঙ বসাইল জননীর বুকে,
পাঁচু ব্রাণ্ডী ঢেলে দিল জননীর মুখে
মিশাইয়া 'জুস্' তাহে বাচ্চা মোরগের,
ভজহরি ক্ষুরে করি মুড়াইল মাথা ,
গয়ারাম উচ্চরবে ডাকিল আবার--
"Awake O Mother ! arise, awake."
তথাপি নিষ্ঠুর মাতা না দিল উত্তর ।
তখন বুঝিল সবে নিশ্চয় মরণ ।
ধরাধরি করি মায়ে করিল বাহির ।
বিলাপিল ভক্তবৃন্দ করি হায় হায় ।
হরি হরি বলো সবে সর্গ হলো সায় ॥

দ্বিতীয় সর্গ

কৃষ্ণ অঙ্গে কালো কোট পরে গয়ারাম,
কালো কোটে বসাইল কালো-রং ফিতা,—
ত্রিকালোয় গয়ারাম সাজিল অদ্ভুত—
ভুষোমাখা ভোম্‌রা যেন ঢাকা দিল মেঘে ।
একে একে, দুয়ে দুয়ে সন্তান সকল
অশৌচ গ্রহণ করে মায়ের লাগিয়া ।
তখন বিরলে বসি ভাবিল বুকতি—
"কিরূপে হইবে শ্রাদ্ধ, কিরূপে সদ্গতি" ;

উত্তরিল ভজহরি করি জোড় কর,—
"শুন মন দিয়া, এযে বিষম ব্যাপার—
পুড়াবে কি মাতৃঅঙ্গ জাহ্নবীর কূলে ?"
ছি ছি ছি ছি ছি ছি ধ্বনি করে গয়ারাম,—
"কি কহিলি রে বর্বর ! বাঙ্গালী কুলের কালি,
উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগ—
আলোকিত দেশ যত সভ্যতা-আলোকে,
অসভ্যতা-পণ্য এবে, দাহি দেহ ! শুধু
দাহ নহে—গঙ্গা-উপকূলে ! Prejudice !
Thy name is Traitor !! শুনিবে যখন
ইংলণ্ডবাসী এ কথা ; কাঠি করি কালি
দিবে মুখে ;—হাসালি জগৎ,—উপযুক্ত
শিষ্য তুই না পারিলি হতে ভাগ্য দোষে।"
ছল ছল চোখে পুন বলে ভজহরি,
"না বুঝিয়া গুরুদেব কেন দাও গালি ?
এই কি বিশ্বাস তব,—আমিই বলিব
দাহিবারে দেহ ?—সভ্য ভূমিসম্মানিত
নহে যাহা ; যুনানী-মণ্ডলে যাহা নহে
প্রচলিত ;—গোর দিব মাকে, সার কথা
এই।" ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ ধ্বনি উঠিল সভায়,
ঠিক ঠিক ঠিক বলি দিল করতালি।
"কোথা দিবে মাতৃ গোর ?" হাঁকে গয়ারাম।
"ওয়েষ্টমিনষ্টার-আবি নামে আছে পুণ্য ভূমি,
বিলাতের এক প্রান্তে,—সতীসাধ্বী রানী
এলিজেবেথের পাশে গোরিব মায়েরে ;
অথবা ফরাসী-ভূমে, শ্রীমতী রোলন্দ
আছেন শয়ান যথা—পতি-পরায়ণা
গুণবতী সতী।" আনন্দ-লহরী-লীলা
খেলিল সভায় ; উঠিল সুখের ঝড়,
মড় মড়ি কাঁপিল গেহ ;—ফুরাইল সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

মায়ের শ্রাদ্ধ হবে— দিন স্থির হয় কবে
ভক্তগণ ভাবিয়া আকুল !
খৃষ্টের জনমক্ষণ, স্থির করে ভক্তগণ
সেই দিনে সব সুপ্রতুল ॥
কিবা শ্রাদ্ধ-আয়োজন, কিবা তার উপকরণ
কার হাতে দিব যজ্ঞভার ।
কোথা হতে টাকা পাই, উপায় চিন্তহ ভাই,
অসময়ে ভাব নাম তার ॥
শ্রাদ্ধ হবে টৌনহলে, পৌরহিত্য জনবুলে
মন খুলে করিনু অর্পণ ।
উৎসর্গ হইবে বৃষ, মায়ের সপ্ত পুরুষ,
স্বর্গধামে করিবে গমন ॥
টাকা চাই টাকা চাই, কোথা গেলে টাকা পাই,
কেমনে পূরিবে মনস্কাম ।
গয়ারাম বলে "ছি ! টাকার ভাবনা কি,
টাকা তোলা কত বড় কাম ॥
চাঁদার বাঁধহ খাতা, খুল টান পাতা পাতা,
নাম রাখ শ্রাদ্ধ-ফণ্ড বলি ।
দেশে দেশে সবে ফিরি সহি লও বাড়ী বাড়ী
স্বরাষ্ট্রীর কাঁধে লও ঝুলি ॥
কলিকালে হুন্দমুদ্দ মায়ের হইবে শ্রাদ্ধ
আদ্যক্রিয়া ভারত-ভিতর ।
পিণ্ড দিবে গয়ারাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
করতলে ধর্ম-অর্থ বর ॥
চাঁদার খাতা বগলে, চলেছে মা-মরা ছেলে,
মুখে উড়ে চুরুটের ধূম ।
"ভিক্ষা দাও গো প্রতিবাসী ! মা মরেছে দেখ আসি,
শ্রাদ্ধ হবে মহা ঘটা ধূম ।"
দ্বিজ কবিবর ভণে, ঝুলি পুরি দাও ধনে,
জননীর হইবে উদ্ধার ।
বাসি মড়া ঘরে পচে, টাকা দিলে মান বাঁচে,
সর্গ শেষ হইল এইবার ॥

চতুর্থ সর্গ

তেজঃপুঞ্জ যোগী এক গৌরাঙ্গ বরণ,
ঝক্ ঝক্ জ্বলে চক্ষু, ভালে শশিকলা,—
কহিতে লাগিল ধীরে, সুগম্ভীর স্বরে—
"কেন বাপু, ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রম অকারণ ?
কে কহিল মরেছেন ভারত-জননী ?
অনন্ত অক্ষয় মাতা, মরিবার নয়।"
উত্তরিল গয়ারাম হাসি হাসি মুখে,—
"কি বলিলে ? মরে নাই মা ? ভণ্ড যতি
তুই !—ডেকেছি ইংরেজী ছন্দে শতবার
মাকে,—সাড়া নাহি দিল তবু মাতা।" ক্ষুদী
বলে, "ফরাসী ভাষায় ডাকিয়াছি আমি,—"
বলে ভজহরি "জননীরে জার্মানেতে
সম্বোধিছি কত, তবু নিরুত্তর হায়।
যথা যবে পোড়া শোল মাছে, দিয়া নুন
কচুটিলে আর নাহি রঙ্গে-ভঙ্গে নড়ে,
যদিও পুকুরে তাহা ফেলাইয়া দাও।"
কহিছেন যোগিবর, "ভ্রান্ত বড় তোরা।
ডাক্ দেখি রসনায় সেই সুধা নাম,—
মা মা ব'ল,—কাতরা জননী উঠিবেন
জেগে,—চুম্বি মুখ, সন্তানে দিবেন কোল !
ঐ শোন্ কি বোল বলিছে মাতা মোরে,—
'পুত্র ! বল দেখি সত্যকার, এতক্ষণ
বিকৃত ভাষায় কারা, বিকৃত বসনে,
বিকৃত স্বরেতে ডেকেছিল কার নাম ?
কিছু বুঝি নাই,—ডাকে ওষ্ঠাগত প্রাণ।' "
গয়ারাম বলে, "ওহে ভজহরি ভাই—
মাতাকে পেয়েছে পেত্নী,—মড়া কয় কথা !
চলহ পলাই সবে এ কুস্থান হতে ;
জীবন হারাই বুঝি এ শ্রাদ্ধ-সঙ্কটে !
ছাড়িব না পিণ্ড দান, চাঁদার আদায়।"
হরি হরি বল সবে পালা হল সায়।

['বাঙালী চরিত'—১২৯২ বঙ্গাব্দ]

[গান]

[যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর এই দুটি গান ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের পদত্যাগ উপলক্ষে লেখা এবং ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ২২ চৈত্র 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।]

আয় রে আয় লাট মহালাট আয়।
আত্মশাসন সংকীর্তনে নাচবি যদি আয়॥
ওরে মার খেয়েছি, না হয় আরও খাবো—আয়।
ও ভাই, মেরেছ কলসীর কানা,
তা বলে কি প্রেম দিব না? আয়,
আয় রে আয় লাট মহালাট আয়॥

[গান]

দিয়াছ যে কাণমলা ঘুচলো তার দেহের মলা,
জুড়ালো অন্তরের জ্বালা—
মধুমাখা করস্পর্শে তোমার হে।
বাঁ কাণ পাছে দুঃখ করে
মলে দাও সেটি খুব জোরে
আত্মশাসন ধ্বজা উড়ুক অম্বরে।
গুণ গেয়ে তার মধুর স্বরে
ঘরে গিয়ে খাই ক্ষীর খাবার হে॥

('বাঙ্গালীর গান'—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।)

গোবিন্দচন্দ্র দাস [১৮৫৫-১৯১৮]

স্বদেশ

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে ? এ দেশ তোমার নয় :—
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয় ?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুণি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয় !

২

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া,
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গোষ্ঠী,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয় !

৩

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস্—এই যে বাড়ী,
এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট, বড়লাট তারাই সবে, জজ ম্যাজিস্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় !

৪

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
আইন কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরজুরি,[১]

তাদের চার্চে তাদের নাচ্চে তাদের 'বলে'[২] যায় :
একশ রকম টেক্স দিবা, বাড়ের বেলায় তোমরা কিবা,
গাধার কাছে বাঘের বল বাঘের করে ভয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে এ দেশ তোমার নয় !

৫

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বলতে পারে,
কুকুর মেকুর[৩] ছাগল কবে দেশের মালিক হয় ?
যে সব বাবু বিলাত গিয়ে, 'বাৰ্দুনি'[৪]-দের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আনছে তাদের শাবক সমুদয়,
'বৃটিশ বরণ'[৫] ব'লে দাবী কর্লে নাকি বিলাত পাবি ?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠি তোরা নাইকো লজ্জা ভয় !
এই যদি রে 'বৃটিশ বরণ' মরণ কারে কয় ?

৬

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিস্ কারে এ দেশ তোদের নয়,
কা'র স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে
জোর-জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয় ।
নপুংসকের গোষ্ঠি তোরা, জন্ম-অন্ধ কাণা-খোঁড়া,
ভিক্ষুয়ালা, পাশ্বাকুলি পীলা ফাটার ভয় !
কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয় ?

৭

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিস্ কারে এদেশ তোদের নয়,
যাহার লাঠি তাহার মাটি, চিরদিনের কথা খাঁটি
এ ত নহে চা'র পেয়ালা চুমুক দিলে জয় !
দেখতে যারা কাঁপে ডরে, মারবার আগে আপ্‌নি মরে,
ঘুসির বদল খুসি করে—'সেলাম মহাশয়' !
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিস্ কারে এ দেশ তোদের নয় !

৮

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিস্ কারে এদেশ তোদের নয় !
সোনার বাংলা সোনার ভূমি, হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আসবে কোলে, এই কি মনে লয় ?
'সোনা' 'যাদু' মিষ্টভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয় ,
কবির কথায় তুষ্ট নহে 'ভাব' মহাশয় !

৯

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিস্ কারে এ দেশ তোদের নয়,
তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের বেঙ্কে তোদের টাকা,
তাদের নোটে ভারত ঢাকা—বিশাল হিমালয় !
তাদের কলে তোরাই কুলি, তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি,
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি--ক্ষুধায় মৃত্যু হয় !
তারাই রাজা তারাই বণিক, তারাই সমুদয় !

১০

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিস্ কারে এ দেশ তোদের নয়,
কিসের বা তোর নেপাল ভুটান, সবাই তাদের পায়ে লুটান,
কুত্তার মত পুচ্ছ গুটান—শিয়াল দেখে ভয় !
অই যে ওদের 'কাটমুণ্ড' সত্যই ও কাটামুণ্ড,
রাহুর যেমন মরাতুণ্ড হাঁ করিয়ে রয় !
কেতুর মত পুচ্ছ লুটান ভূটান মহাশয় !

১১

স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিস্ কারে এ দেশ তোদের নয়,
করদ মিত্র—নবাব রাজা, সবাই দেখি দক্ষ সাজা,
একটাও নয় মানুষ তাজা—অজার মাথা বয় ;
ওগুলা সব মানুষ হলে, কোন্ দিকে কে যেত চলে,
ডোনিস পোনিস টোনিস খেলে ভারতভূমি লয় ?
মগু দেশের গন্ধকাটা ভারত করে জয় ?

১২

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে এ দেশ তোদের নয়,
যখন বাদসা মুসলমান, তখন তাদের 'হিন্দুস্থান',
ইংরেজ 'ইণ্ডিয়া' বলে এখন কেড়ে লয়!
অযোধ্যা কই — 'আউধ্' এ যে, দাক্ষিণাত্য 'ডেকান্' সে যে,
'সিলোন' গিলেছে লঙ্কা সুবর্ণময়!
ডমাউন আর ডিউ গোয়া, চুণি পান্না সোণার মোয়া,
যায় না তাদের ধরা ছোঁয়া, কে দেয় পরিচয়?
বারণাবত ইন্দ্রপ্রস্থ, কই সে তোদের সে সমস্ত,
'দিল্লী'র পরে 'ডেল্হি' হল, আরো বা কি হয়!
স্বদেশ স্বদেশ করে দাবি আর কি তোরা এদেশ পাবি?
এ নয় তোদের ভারতবর্ষ চির হর্ষময়!

১৩

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে এদেশ তোদের নয়,
কই সে শিল্প কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়?
কোথায় বা সে ব্রহ্মচর্য, অসীম ঐশ্বর্য, অসীম ধৈর্য,
কই বা উগ্র সে তপস্যা ইন্দ্রে লাগে ভয়?
কোথায় অসীম যোগ-বীর্যে অসুর পরাজয়?
স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি, চমকে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিবি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়!
প্রতি জনের প্রতি বক্ষে, কোটী কোটী লক্ষে লক্ষে,
কই সে তোদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়,
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
স্পর্শ থাকুক, দর্শনে তার শত্রুকুল ক্ষয়!
লোহার চেয়ে মহাশক্ত, ভক্ত-বীরের মাংস রক্ত,
তাদের বুকের অস্থি দিয়া বজ্র তৈয়ার হয়,
ব্রহ্মাণ্ডে প্রথম অসি, তাইতে তারা দৈত্য নাশি
পুণ্যভূমি ভারতভূমি প্রথম করে জয়!
তাদের 'স্বদেশ' ভারত ছিল, তোদের স্বদেশ নয়।

[প্রথম প্রকাশ—'নব্যভারত' ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।
যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'গোবিন্দ-চয়নিকা' গ্রন্থে সংকলিত—১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।]

টীকা—

১ তেরজুরী—ট্রেজারী (Treasury)

২ বলে—বল্ নাচে।

৩ মেকুর—বিড়াল।

৪ বাবুনী—বাবুর স্ত্রী।

৫ বৃটিশ বরণ—বিলাতে ভূমিষ্ঠ সন্তান।

[কবিতাটির শেষে এই শব্দ-টীকাগুলি দেওয়া আছে।]

অশ্বিনীকুমার দত্ত [১৮৫৬-১৯২৩]

গান

ভৈরবী—কাওয়ালী

আহা রে বাঙালীবাবু যাই বলিহারি।
কত রূপ ধরো তুমি অপরূপধারী ॥
শিবের ছিল অষ্টমূর্তি, তোমার হল শত মূর্তি,
রসনায় তব গুণ কি বর্ণিতে পারি।
ব্রহ্মারূপে সৃজন কর, বিষ্ণুরূপে কলম ধর,
শিবরূপে কত ঢালো ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরি ॥
(কভু) সাহেবী মেজাজে চল, কভু শিব দুর্গা বল,
কত রকম ভাব তোমার, কিছু বুঝতে নারি।
কভু মুরগীর ঝোল খাও, কভু গয়ায় পিণ্ড দাও,
বিদেশে পরমব্রহ্ম, হিন্দু গেলে বাড়ী ॥
নানা স্থানে ভাব নানা, কিছু যে বোঝা যায় না,
অন্ত নাহি পেলাম তোমার, সদা ভেবে মরি।
সত্য ভিন্ন মুক্তি নাই, খাঁটি হয়ে রও রে ভাই,
বহুরূপী হইও না রে, কপট আচারী ॥
নাহি রে তোর ধর্মাধর্ম, কর পশুর মতো কর্ম,
যদি দেখো শ্বেতচর্ম অমনি গোলাম তারি।

সদা করজোড়ে রও, মস্তকে পাদুকা বও,
বাড়ী এসে গোঁফে তাও, বাবুগিরি ভারি ॥
দিনে একশ আটবার, কর ভারতের উদ্ধার,
ভারতের তরে তোমার কত জাঁক জারি।
মুখেতে মালসাট্ মারো, এ্যায়সা করো ত্যায়সা করো,
কাজের বেলা ন্যাজ গুটিয়ে মারো টেনে পাড়ি ॥

('বাঙ্গালীর গান'—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, ১৩১২ বঙ্গাব্দ)

[গান]

ঝিঁঝিট—খং।

বাঙালী বড় বুদ্ধিমান কে বলে সংসারে।
এমন বোকা কোথাও না দেখি যে কাহারে ॥
দেশের প্রতি নাই মমতা
বিদেশীয়ের পায়ের জুতা,
যা করে ইংরাজে তাই ভালো তার বিচারে ॥
বাঙালী বাবু যারা
এমন হতমুর্খ তারা
শুটকী চুরুটের লেগে অম্বরী তামাক ছাড়ে ॥
সাচ্চা আতর গোলাপ ত্যজে
বিলাতী বিলাসে মজে,
কত টাকা ওড়ায় তারা ভস্ম ল্যাভেণ্ডারে ॥
দুদিন স্কুলে গেলে
দেশী খাওয়া যান ভুলে,
পরমান্ন ছেড়ে তুষ্ট গোমাংস আহারে ॥
(ওরে) গোমাংস এ গরম দেশে
নিতান্ত যে সর্বনেশে,
বৈদ্য শাস্ত্রের সার কথা, হেসে উড়ায় তারে ॥

কোন বাবু বিলেত গিয়ে
আসেন দেখ সাহেব হয়ে—
পৃথিবী চমকে তার হ্যাটের বাহারে ॥
গরমির দিনে গরম কোট
পায়েতে বিলাতী বুট,
কালো গায়ে বান্দর সাজেন ইংরাজ নকল করে ॥
দিবা নিশি চিন্তা কিসে
ইংরেজের সঙ্গে মিশে
তাদের পদতলে পড়ে থাকিবেন ডিনারে ॥
ভাই বন্ধু বেরাদারে
আপনার বলতে লজ্জা করে,
চোটে যান বাবু বলে ডাকিলে তাহারে ॥
সাহেবের মূর্তি ধ'রে
থাকেন পঞ্চমেঘে চড়ে,
ইংরাজী ভাবেতে মত্ত আহারে-বিহারে ॥
বদনে বিরাজে সদা
বাঙালীরা বড় গাধা,
দেহ-মন জর্জরিত ইংরাজী বিকারে ॥
যতই বুদ্ধি রাখ রে ভাই
দেখে বলিহারি যাই,
দেশশুদ্ধ ছি ছি শুন তোমার এ বাভারে ॥
কেন রে এ বিড়ম্বনা,
বিদেশী এ ভাব ছাড় না,
(দেখ) এত কর তবু তারা পুছেনা তোমারে ॥

['বাঙালীর গান'—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, ১৩১২ বঙ্গাব্দ ।]

বেণোয়ারীলাল গোস্বামী [১৮৬০-১৯৩৮]

'পোলাও'—কাব্য-গ্রন্থের দুটি কবিতা

[দশটি 'হাঁড়ি'-তে পঁচাত্তরটির অধ্যায় বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক 'হাঁড়ী'-তে ক খ গ হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা আছে। বিষয় প্রধানত সামাজিক ও রাজনৈতিক। সাহিত্যিকদের নিয়েও ব্যঙ্গ করা হয়েছে।]

তৃতীয় হাঁড়ী

(ক)

আর দিও না মুড়ির মোয়া
রাঙ্গা তোষণ-কাটি,
দানের চোটে ভারতবাসী
হয়ে পোলো মাটি।
গ্রামে গ্রামে জজ ম্যাজিস্ট্রেট
পাড়ায় পাড়ায় পগ্‌গা রাজা,
শান্তি রসে সবাই সিক্ত
সবার কেবল কোমর ভাঙ্গা।
ওপরেতে নীতির রসে
সবই যেন গিল্‌টী,
পাপের সাথে পুণ্য মাখা,
অপূর্ব এ মিল্‌টি।
শিখছি শুধু আত্মহত্যা
শিখছি হতে ভণ্ড,
যাজ্ঞিকদের যজ্ঞ ভঙ্গে
কচ্ছি সবই পণ্ড।
চট্টো Dyer[১] ভট্টো Dyer
সিংহ Dyer এই খানে,
অত্যাচারে কালোর কাছে
সাদা আদমী হার মানে।
পরের গর্বে গর্ব করি
পরের মুখের ঝাল খেয়ে,

ওদের দেশকে মাথায় তুলি
আনন্দেরি গান গেয়ে।
মেনে নিচ্ছি মাথায় করে
বোঝে ওরা বর্বর,
সভ্যতা মদ কণ্ঠেছি পান
পূর্ণ করি' খর্পর।

অষ্টম হাঁড়ী

(গ)

Lady-র জুতা কিনে এনে
পরাও ললনায় ;
(আর) গলায় দিয়ে Tie-টা যাদু
পূরাও বাসনায়।
যুঁই শেফালি টগর বেলা
উঠিয়ে ফেলে দিয়ে,
বাগান কর মনের মত
ম্যাগ্‌নোলিয়া নিয়ে।
ঘোমটা ঘোচাও, সিঁদুর মোছাও
স্বাধীনভাবে প্রেম কর ;
Nation যদি হতে চাও
ফিরিঙ্গি এ নাম ধর।
চাপে পড়ে সমাজটা যে
হয়ে পড়ছে চ্যাপ্‌টা,
(এখন) মাথার মাঝে গুঁজতে হবে
হ্যাট্‌টা কিংবা ক্যাপ্‌টা।
রোগটা যে কি হচ্ছে না ঠিক
বোঝা Dr. Merryman
দর্শনী যা লয়ে যান,
গুন্ গুনিয়ে গেয়ে গান।

গিলে দেওয়া লম্বা কোঁচার
　　রেওয়াজটা কি হবে বন্ধ.
সবাই আমরা আওড়াব কি
　　Nasty Nasty ড্যামের গন্ধ ?

কুমার তার ঘুরিয়েছে ভাই
　　চাক খানা,
সরা হবে কি কলসী হবে
　　নাইক জানা।
　　আমরা হতে চাচ্ছি কি ?
　　আমরা হতে চাচ্ছি কি ?
আমরা কেমন হলে কেমন হব,
　　বুঝতে পারছি কি ?

আমরা স্রোতের জলে ভাসতে জানি
　　জানি নাক উজোতে :
ঠাণ্ডা হয়ে কর্ছি বাস
　　চুণো পুঁটীর কুঁজোতে।
মনের চিতায় লকলক করি
　　আগুন জ্বলে
মনে হয় যেন শান্তি নাইক
　　জগতীতলে।
শিক্ষিত দেশ, শিক্ষিত দেশ,
　　শিক্ষিত মোরা কোনখানে ?
Monumental liar-গুলো
　　সমাজবেদীর মাঝখানে।

['পোলাও' কাব্যগ্রন্থ—১৯২০ খৃষ্টাব্দ]

টীকা—

১ পগ্গ—পাগড়ী, রাঙা পাগড়ী অর্থাৎ পুলিশ ; স্বাধীনতা লাভের পরেও কিছুকাল পুলিশের মাথায় লাল পাগড়ী ছিল।

২ Dyer—জেনারেল ডায়ার যার আদেশে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় [১৮৬১-১৯১০]

গান

['করালী' ছদ্মনামে ব্রহ্মবান্ধব এই গানটি রচনা করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য ক'রে যখন স্বদেশী- ও বয়কট-আন্দোলন পুরোদমে চলেছে গানটি সেই সময়ে লেখা। প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'করালী' নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকাও ব্রহ্মবান্ধব কিছুকাল সম্পাদনা করেছিলেন]।

আছিস্ কোন্ উল্লাসে ?
সদাই বিদেশী জোঁক রক্ত চোষে।
জলে গেলে জলের জোঁকে
ধরে জীবের আশে পাশে ;
এ যে এমনি নচ্ছার জোঁক
জলে-স্থলে ধরলো ঠেসে।
জোঁকের ভয়ে হলি পোকা
জন্ম নিয়ে বীর-ঔরসে ;
তোদের কাণ্ড হেরি, জগৎ জুড়ি
হো হো রবে সবাই হাসে।
অস্থিচর্ম হোলো রে সার,
রক্ত নাহি রক্তকোষে ;
এখন বাঁচতে চেলে ফেল্ সে জোঁক
বয়কট্-চুণা মুখে ঘসে।
খেতে নাই ঘরে অন্ন
শুইতে যাস্ না তক্তপোষে ;
তোরা ধনে প্রাণে গেলি মারা
বিলাসের চুলকানি দোষে।
করালীর পদাবলী
উড়াইও না উপহাসে,
(দেখছ না) সোনার ভারত হচ্ছে শ্মশান
দুষ্ট জোঁকের শ্বাস-প্রশ্বাসে।

[নলিনীরঞ্জন সরকার সম্পাদিত 'বন্দনা'—স্বদেশী গানের সংকলন, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১]

দেশের উন্নতি

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ,
রয়েছে রেশ কানে—
কী যেন করা উচিত ছিল,
কী করি কে তা জানে
অন্ধকারে ওই রে শোন্
ভারতমাতা করেন 'গ্রোন',
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
গেলেন কোন্ খানে!
দেশের দুখে সতত দহি
মনের ব্যথা সবারে কহি,
এস তো করি নামটা সহি
লম্বা পিটিশনে।
আয় রে ভাই সবাই মাতি
যতটা পারি ফুলাই ছাতি,
নহিলে গেল আর্য জাতি
রসাতলের পানে।

উৎসাহেতে জ্বলিয়া উঠি
দু'হাতে দাও তালি
আমরা বড়ো এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি!
কাগজ ভ'রে লেখো রে লেখো,
এমনি করে যুদ্ধ শেখো,
হাতের কাছে রেখো রে রেখো
কলম আর কালী!
চারটি করে অন্ন খেয়ো,
দুপুর বেলা আপিস যেয়ো,

তাহার পরে সভায় যেয়ো
বাক্যানল জ্বালি—
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে
সন্ধেবেলা বাসায় ঢুকে
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
করিয়ো চতুরালি।

দূর হউক এ বিড়ম্বনা
বিদ্রূপের ভান।
সবারে চাহে বেদনা দিতে
বেদনা ভরা প্রাণ।
আমার এই হৃদয়তলে
শরম-তাপ সতত জ্বলে,
তাই তো চাহি হাসির ছলে
করিতে লাজ দান।
আয়-না ভাই, বিরোধ ভুলি,
কেন রে মিছে লাথিয়ে তুলি
পথের যত মতের ধুলি
আকাশ পরিমাণ?
পরের মাঝে, ঘরের মাঝে
মহৎ হব সকল কাজে,
নীরবে যেন মরে গো লাজে
মিথ্যা অভিমান।

ক্ষুদ্রতার মন্দিরেতে
বসায়ে আপনারে
আপন পায়ে না দিই যেন
অর্ঘ্য ভারে ভারে।
জগতে যত মহৎ আছে
হইব নত সবার কাছে,
হৃদয় যেন প্রসাদ যাচে
তাঁদের দ্বারে দ্বারে।

কখন কাজ ভুলিয়া যাই
মর্মে যেন লজ্জা পাই,
নিজেরে নাহি ভুলাতে চাই
বাক্যের আঁধারে।
ক্ষুদ্র কাজ ক্ষুদ্র নয়
এ কথা মনে জাগিয়া রয়,
বৃহৎ ব'লে না মনে হয়
বৃহৎ কল্পনারে।

পরের কাছে হইব বড়ো
এ কথা গিয়ে ভুলে
বৃহৎ যেন হইতে পারি
নিজের প্রাণমূলে।
অনেক দূরে লক্ষ্য রাখি
চুপ করে না বসিয়া থাকি
স্বপ্নাতুর দুইটি আঁখি
শূন্যপানে তুলে।
ঘরের কাজ রয়েছে পড়ি,
তাহাই যেন সমাধা করি,
'কী করি' বলে ভেবে না মরি
সংশয়েতে দুলে।
করিব কাজ নীরবে থেকে
মরণ যবে লইবে ডেকে
জীবনরাশি যাইব রেখে
ভবের উপকূলে।

সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।
সত্যপথে আপন বলে
তুলিয়া শির সকলে চলে,
মরণভয়ে চরণতলে
দলিত হয়ে রবে।

নহিলে শুধু কথাই সার,
বিফল আশা লক্ষবার,
দলাদলি ও অহংকার
উচ্চ কলরবে।
আমোদ করা কাজের ভানে—
পেখম তুলি গগন-পানে
সবাই মাতে আপন মানে
আপন গৌরবে।

বাহবা কবি! বলিছ ভালো,
শুনিতে লাগে বেশ—
এমন ভাবে বলিলে হবে
উন্নতি বিশেষ।
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'
ছুটাও ভাষা অগ্নিকণা
আমরা করি সমালোচনা
জাগায়ে তুলি দেশ।
বীর্যবল বাঙ্গালার
কেমনে বলো টিঁকিবে আর
প্রেমের গানে করেছে তার
দুর্দশার শেষ।
যাক-না দেখা দিন-কতক
যেখানে যত রয়েছে লোক
সকলে মিলে লিখুক শ্লোক
'জাতীয়' উপদেশ।
নয়ন বাহি অনর্গল
ফেলিব সবে অশ্রুজল,
উৎসাহেতে বীরের দল
লোমাঞ্চিতকেশ।
রক্ষা কর! উৎসাহের
যোগ্য আমি কই!
সভা-কাঁপানো করতালিতে
কাতর হয়ে রই।

দশজনাতে যুক্তি ক'রে
দেশের যারা মুক্তি করে,
কাঁপায় ধরা বসিয়া ঘরে
তাদের আমি নই।
'জাতীয়' শোকে সবাই জুটে
মরিছে যবে মাথাটা কুটে,
দশ দিকেতে উঠিছে ফুটে
বক্তৃতার খই—
হয়তো আমি শয্যা পেতে
মুগ্ধহিয়া আলসেতে
ছন্দ গেঁথে নেশায় মেতে
প্রেমের কথা কই।
শুনিয়া যত বীরশাবক
দেশের যাঁরা অভিভাবক
দেশের কানে হস্ত হানে,
ফুকারে হই-হই।
চাহি না আমি অনুগ্রহ-
বচন এত শত।
'ওজস্বিতা' 'উদ্দীপনা'
থাকুক আপাতত।
স্পষ্ট তবে খুলিয়া বলি—
তুমিও চলো আমিও চলি,
পরস্পরে কেন এ ছলি
নির্বোধের মতো?
ঘরেতে ফিরে খেলো গে তাস,
লুটায়ে ভুঁয়ে মিটায়ে আশ
মরিয়া থাকো বারোটি মাস
আপন আঙিনায়।
পরের দোষে নাসিকা গুঁজে
গল্প খুঁজে গুজব খুঁজে
আরামে আঁখি আসিবে বুজে
মলিনপশুপ্রায়।

তরল হাসি-লহরী তুলি
রচিয়ো বসি বিবিধ বুলি,
সকল কিছু যাইয়ো ভুলি
ভুলো না আপনায় !
আমিও রব তোমার দলে
পড়িয়া এক-ধার !
মাদুর পেতে ঘরের ছাতে
ডাবা হুঁকোটি ধরিয়া হাতে
করিব আমি সবার সাথে
দেশের উপকার ।
বিজ্ঞভাবে নাড়িব শির,
অসংশয়ে করিব স্থির
মোদের বড়ো এ পৃথিবীর
কেহই নহে আর !
নয়ন যদি মুদিয়া থাকো
সে ভুল কভু ভাঙিবে নাকো,
নিজেরে বড়ো করিয়া রাখো
মনেতে আপনার !
বাঙালি বড়ো চতুর, তাই
আপনি বড়ো হইয়া যাই,
অথচ কোনো কষ্ট নাই
চেষ্টা নাই তার ।
হোথায় দেখো খাটিয়া মরে,
দেশে বিদেশে ছড়ায়ে পড়ে,
জীবন দেয় ধরার তরে
ম্লেচ্ছ সংসার !
ফুকারো তবে উচ্চ রবে
বাঁধিয়া এক-সার---
মহৎ মোরা বঙ্গবাসী
আর্য পরিবার !

('মানসী' কাব্যগ্রন্থ—১২৯৭ বঙ্গাব্দ ।)

বঙ্গবীর

ভুলুবাবু বসি পাশের ঘরেতে
নামতা পড়েন উচ্চ স্বরেতে--
হিস্ট্রি কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান দিয়ে।
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্‌টার তিন—
দাদা এমে, আমি বিএ।
যত পড়ি তত পুড়ে যায় তেল,
মগজে গজিয়ে ওঠে আক্কেল,
কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল
পাড়িল রাজার মাথা,
বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
পাকা আমগুলো রহে গো পাড়িতে
কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে
উলটি ব'য়ের পাতা।
কেহ মাথা ফেলে ধর্মের তরে,
পরহিতে কারো মাথা খ'সে পড়ে,
রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে
কেতাবে রয়েছে লেখা।
আমি কেদারায় মাথাটি রাখিয়া
এই কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া
পড়ে কত হয় শেখা!
পড়িয়াছি বসে জানালার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কারা ধরা চষিয়াছে,
কবে মরে তারা মুখস্থ আছে
কোন্ মাসে কী তারিখে।

কর্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ ক'রে কারা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন,
খাতায় রেখেছি লিখে।
বড়ো কথা শুনি বড়ো কথা কই,
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই,
এমনি করিয়া ক্রমে বড়ো হই—
কে পারে রাখিতে চেপে!
কেদারায় বসে সারাদিন ধ'রে
বই প'ড়ে প'ড়ে মুখস্থ ক'রে
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে,
বুঝি বা যাইব ক্ষেপে।
ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম!
আমরা যে ছোট সেটা ভারি ভ্রম;
আকার-প্রকার রকম-সকম
এতেই যা কিছু ভেদ।
যাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে
করি কত মতো গুরুমারা টীকে
লেখনীর ঘুচে খেদ।
মোক্ষমুলর বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়ো বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।
মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক,
আমরাও তাই করিয়াছি ঠিক
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্,
শাপ দি' পইতে ছুঁয়ে।
কে বলিতে চায় মোরা নাহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর
পূর্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।

আর-কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে বারো-তেরো জন
শুধু তর্জন আর গর্জন
এই করো অভ্যাস।
আলোচাল আর কাঁচকলা-ভাতে
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে
ব্রহ্মচর্য পেতে হাতে হাতে
ঋষিগণ তপ করে।
আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ,
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ,
তবু আছে সেই ব্রাহ্মণ-তেজ
মনু-তর্জমা প'ড়ে।
সংহিতা আর মুর্গি-জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,
বিশেষত এই আমরা ক' ভাই
নিমাই নেপাল ভুতো।
দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাটিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে
শিখেছি হাজার ছুতো।
ম্যারাথন আর থর্মপলিতে
কী যে হয়েছিল বলিতে বলিতে
শিরায় শোণিত বহে গো জ্বলিতে
পাটের পলিতে-সম।
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তারা এত কথা কী বুঝিবে ছাই ·
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই—
বুক ফেটে যায় মম।
আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গ্যারিবাল্ডির জীবনচরিত
না জানি তাহলে কী তারা করিত
কেদারায় দিয়ে ঠেস!

মিল ক'রে ক'রে কবিতা লিখিত
দু-চারটে কথা বলিতে শিখিত,
কিছু দিন তবু কাগজ টিঁকিত
উন্নত হত দেশ।
না জানিল তারা সাহিত্যরস,
ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াশিংটনের জন্ম-বরষ
মুখস্থ হল নাকো।
ম্যাট্‌সিনি-লীলা এমন সরেস
এরা সে কথার না জানিল লেশ—
হা অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ,
লজ্জায় মুখ ঢাকো।
আমি দেখো ঘরে চৌকি টানিয়ে
লাইব্রেরি হতে হিস্ট্রি আনিয়ে
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা।
জ্বলে ওঠে প্রাণ, মরি পাখা করে,
উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে—
তবুও যা হোক স্বদেশের তরে
একটুকু হয় আশা।
যাক, পড়া যাক 'ন্যাস্‌বি' সমর—
আহা, ক্রমোয়েল, তুমিই অমর।
থাক এইখানে, ব্যথিছে কোমর—
কাহিল হয়েছে বোধ।
ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু।
আরে, আরে এসো! এসো ননিবাবু,
তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক গ্রাবু—
কালকের দেবো শোধ!

['মানসী' কাব্যগ্রন্থ—১২৯৭ বঙ্গাব্দ।]

ধর্মপ্রচার

কলিকাতার এক বাসায়

ওই শোনো ভাই বিশু,
পথে শুনি 'জয় যিশু'!
কেমনে এ নাম করিব সহ্য
আমরা আর্যশিশু!

কূর্ম, কল্কি, স্কন্দ
এখন করো তো বন্ধ।
যদি যিশু ভজে রবে না ভারতে
পুরাণের নামগন্ধ।

ওই দেখো ভাই, শুনি—
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি,
বিষ্ণু, হারীত, নারদ, অত্রি
কেঁদে হল খুনোখুনি!

কোথায় রহিল কর্ম,
কোথা সনাতন ধর্ম!
সম্প্রতি শুধু কিছু শোনা যায়
বেদ-পুরাণের মর্ম!

ওঠো, ওঠো ভাই, জাগো,
মনে মনে খুব রাগো!
আর্য শাস্ত্র উদ্ধার করি
কোমর বাঁধিয়া লাগো!

কাছা কোঁচা লও আঁটি
হাতে তুলে লও লাঠি।
হিন্দু ধর্ম করিব রক্ষা
খৃস্টানি হবে মাটি।

কোথা গেল ভাই ভজা
হিন্দুধর্মধ্বজা ?
বক্তা ছিল সে, সে যদি থাকিত
আজ হত দু-শো মজা !

এসো মোনো, এসো ভুতো,
পরে লও বুট জুতো ।
পাদ্রি বেটার পা মাড়িয়ে দিয়ো
পাও যদি কোনো ছুতো ।

আগে দেবো দুয়ো তালি,
তার পরে দেবো গালি ।
কিছু না বলিলে পাড়ব তখন
বিশ-পঁচিশ বাঙালি ।

তুমি আগে যেয়ো তেড়ে,
আমি নেব টুপি কেড়ে ।
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে প'ড়ে
মাটিতে ফেলিও পেড়ে ।

কাঁচি দিয়ে তার চুল
কেটে দেব বিলকুল ।
কোটের বোতাম আগাগোড়া তার
করে দেব নির্মূল ।

তবে উঠ, সবে উঠ—
বাঁধো কটি, আঁটো মুঠো !
দেখো, ভাই, যেন ভুলো না, অমনি
সাথে নিয়ো লাঠি দুটো ।

দলপতির শিষ ও গান :

প্রাণ সই রে !
মনো জ্বালা কারে কই রে !

কোমরে চাদর বাঁধিয়া, লাঠি হস্তে, মহোৎসাহে সকলের প্রস্থান।
পথে বিশু, হাবু, ভোনা ভুতোর সমাগম। গেরুয়া-
বস্ত্রাচ্ছাদিত অনাবৃতপদ মুক্তিফৌজের
প্রচারক :

ধন্য হউক তোমার প্রেম,
ধন্য তোমার নাম,
ভুবনমাঝারে হউক উদয়
নূতন জেরুজিলাম।

ধরণী হইতে যাক ঘৃণাদ্বেষ,
নিঠুরতা দূর হোক—
মুছে দাও, প্রভু, মানবের আঁখি,
ঘুচাও মরণশোক।

তৃষিত যাহারা জীবনের বারি
করো তাহাদের দান।
দয়াময় যিশু, তোমার দয়ায়
পাপীজনে করো ত্রাণ।

'ওরে ভাই বিশু, এ কে,
ভূতো কোথা এল দেখে!
গোরা বটে, তবু হতেছে ভরসা
গেরুয়া বসন দেখে।'

'হাবু, এবে তুই এগো!
বল—বাছা তুমি কে গো?
কিচিমিচি রাখো, খিদে পেয়েছে কি?
দুটো কলা এনে দে গো!'

বধির নিদয় কঠিনহৃদয়
তারে প্রভু দাও কোল।
অক্ষম আমি কী করিতে পারি—

'হরিবোল হরিবোল !'

'আরে রেখে দাও ধৃষ্ট !
এখনি দেখাও পৃষ্ঠ !
দাঁড়ে উঠে চড়ো, পড়ো বাবা পড়ো
হরে হরে হরে কৃষ্ট !'

তুমি যা সয়েছ তাহাই স্মরিয়া
সহিব সকল ক্লেশ
ক্রুস গুরুভার করিব বহন—

'বেশ, বাবা, বেশ বেশ !'

দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ
আমার নয়ননীরে,
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে
পাপীর জীবন ফিরে।

আপনার জন- আপনার দেশ-
হয়েছি সর্ব-ত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায়
তোমার প্রেমের লাগি।

সুখ, সভ্যতা, রমণীর প্রেম,
বন্ধুর কোলাকুলি
ফেলি দিয়া পথে তব মহাব্রত
মাথায় লয়েছি তুলি।

এখনো তাদের ভুলিতে পারি নে,
মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে—
চিরজীবনের সুখবন্ধন
সেই গৃহমাঝে টানে।

তখন তোমার রক্তসিক্ত
ওই মুখপানে চাহি,
ও প্রেমের কাছে স্বদেশ বিদেশ
আপনা ও পর নাহি।

ওই প্রেম তুমি করো বিতরণ
আমার হৃদয় দিয়ে
বিষ দিতে যারা এসেছে তাহারা
ঘরে যাক সুধা নিয়ে।

পাপ লয়ে প্রাণে এসেছিল যারা
তাহারা আসুক বুকে—
পড়ুক প্রেমের মধুর আলোক
ভ্রূকুটিকুটিল মুখে!

'আর প্রাণে নাহি সহে,
আর্যরক্ত দহে!'
'ওহে হাবু, ওহে মাধু, লাঠি নিয়ে
ঘা-কতক দাও তো হে!'

'যদি চাস তুই ইষ্ট
বল্ মুখে বল্ কৃষ্ট।'
ধন্য হউক তোমার নাম
দয়াময় যিশুখৃষ্ট!

'তবে রে! লাগাও লাঠি।
কোমরে কাপড় আঁটি।
হিন্দুধর্ম হউক রক্ষা
খৃষ্টানি হোক মাটি!'

প্রচারকের মাথায় লাঠি-প্রহার। মাথা ফাটিয়া রক্তপাত
রক্ত মুছিয়া:

প্রভু তোমাদের করুণ কুশল,
দিন তিনি শুভমতি
আমি তাঁর দীন অধম ভৃত্য
তিনি জগতের পতি।
'ওরে শিবু, ওরে হাবু,
ওরে নন্দি, ওরে চাবু,
তামাসা দেখার এই কি সময়—
প্রাণে ভয় নেই কাবু?'

'পুলিস আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া,
এই বেলা দাও দৌড় !'
'ধন্য হইল আর্যধর্ম,
ধন্য হইল গৌড় ।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন। বাসায় ফিরিয়া :

সাহেব মেরেছি ! বঙ্গবাসীর
কলঙ্ক গেছে ঘুচি ।
মেজবউ কোথা ডেকে দাও তারে—
কোথা ছোকা, কোথা লুচি !
এখনো আমার তপ্ত রক্ত
উঠিতেছে উচ্ছ্বসি—
তাড়াতাড়ি আজ লুচি না পাইলে
কী জানি কী করে বসি !

স্বামী ঘরে এলো যুদ্ধ সারিয়া
ঘরে নেই লুচি ভাজা !
আর্যনারীর এ কেমন প্রথা,
সমুচিত দিব সাজা ।
যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি হারীত
জলে গুলে খেলে সবে—
মারধোর করে হিন্দুধর্ম
রক্ষা করিতে হবে :
কোথা পুরাতন পাতিব্রত্য
সনাতন লুচি ছোকা—
বৎসরে শুধু সংসারে আসে
একখানি করে খোকা ।

·এই কবিতায় বর্ণিত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ।

['মানসী' কাব্যগ্রন্থ—১২৯৭ বঙ্গাব্দ]

উন্নতিলক্ষণ

১

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎব্যাপারে অজ্ঞ,
শুধাই তোমায় এ পুরশালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ?
সিংহদুয়ারে পথের দুধারে
রথের না দেখি অন্ত—
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উষ্ণীষবন্ত?
বসেছেন ধীর অতি গম্ভীর
দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ
প্রবেশিয়া ঘরে সংকোচে ডরে
মরি আমি অনভিজ্ঞ।
কোন্ শূরবীর জন্মভূমির
ঘুচালো হীনতাপঙ্ক?
ভারতের শুচি যশ-শশীরুচি
কে করিল অকলঙ্ক?
রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
কাহারে করিতে ধন্য?
বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা
কাহার পূজার জন্য?

উত্তর

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
করিয়া উদর পূর্তি,
এঁরা বড়লোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি॥

— —

অভাগা কে ওই মাগে নাম সই,
দ্বারে দ্বারে ফিরে খিন্ন,
তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে
কাহার স্মরণ চিহ্ন ?
সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসে হায়
নয়ন অশ্রুসিক্ত
হৃদয় ক্ষুণ্ণ, খাতাটি শূন্য
থলি একেবারে রিক্ত !
যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
মুছি ললাটের ঘর্ম,
স্বদেশের কাছে কী সে করিয়াছে ?
কী অপরাধের কর্ম ?

উত্তর

আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
বসায়ে গেছে সে উচ্চে,
জন্মভূমিরে সাজায়েছে ঘিরে
অমরপুষ্প গুচ্ছে ॥

২

দেবী দশভুজা, হবে তাঁরি পূজা
মিলিবে স্বজনবর্গ
হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
নূতন পূজার অর্ঘ্য ?
কার সেবা-তরে আসিতেছে ঘরে
আয়ুহীন মেষবৎস ?
নিবেদিতে কারে আনে ভারে ভারে
বিপুল ভেটকি মৎস্য ?
কী আছে পাত্রে যাহার গাত্রে
বসেছে তৃষিত মক্ষী ?
শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ
মুনিনিষিদ্ধ পক্ষী ।

দেবতার সেরা কী দেবতা এঁরা
পূজাভবনের পূজা—
যাহাদের পিছে পড়ে গেছে নিচে,
দেবী হয়ে গেছে ঊহ্য ?

উত্তর

ম্যাকে, ম্যাকিনন, অ্যালেন, ডিলন
দোকান ছাড়িয়া সদ্য
সরবে গরবে পূজার পরবে
তুলেছেন পাদপদ্ম ॥

এসেছিল যারে পূজা দেখিবারে
দেবীর বিনীত ভক্ত,
কেন যায় ফিরে অবনতশিরে
অবমানে আঁখি রক্ত ?
উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা,
রবি চলে গেছে অস্তে—
কুতূহলীদলে কী বিধান-বলে
বাধা পায় দ্বারীহস্তে ?
ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,
সমাজ হইতে ভিন্ন ?
পূজাদানধ্যানে ছেলেখেলা-জ্ঞানে
এরা মনে মানে ঘৃণা ?

উত্তর

না, না, এরা সবে ফিরিছে নীরবে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে—
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে ॥

৩

লোকটি কে ইনি, যেন চিনি চিনি,
বাঙালি মুখের ছন্দ—
ধরনে ধারনে অতি অকারণে
ইংরাজিতর গন্ধ !
কালিয়া-বরন, অঙ্গে পরন
কালো হ্যাট কালো কুর্তি,
যদি নিজদেশী কাছে আসে ঘেঁষি
কিছু যেন কড়ামূর্তি !
ধুতি-পরা দেহ দেখা দিলে কেহ
অতিশয় লাগে লজ্জা,
বাংলা আলাপে রোষে সন্তাপে
জ্বলে ওঠে হাড় মজ্জা !
ইঁহারা কি শেষ ছাড়িবেন দেশ ?
এঁরা কি ভারতদ্বেষ্টা ?
এঁদের কি তবে দলে দলে সবে
বিজাতি হবার চেষ্টা ?

উত্তর

এঁরা সবে বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি বলে গণ্য—
কোট-পরা কায় সঁপেছেন হায়
শুধু স্বজাতির জন্য ॥

——

অনুরাগভরে ঘুচাবার তরে
বঙ্গভূমির দুঃখ
এ সভা মহতী, এর সভাপতি
সভোরা দেশমুখ্য ।
এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে
আপন রক্তমাংস—

তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে
এ দেশের অধিকাংশ ?
কেন দলে দলে দূরে যায় চলে
বুঝে না নিজের ইষ্ট,
যদি কুতূহলে আসে সভাতলে,
কেন বা নিদ্রাবিষ্ট ?
তবে কি ইহারা নিজ-দেশ-ছাড়া
বধিয়া রয়েছে কর্ণ ?
দৈবের বশে পাছে কানে পশে
শুভকথা এককবর্ণ ?

উত্তর

না না, এ'রা হন জনসাধারণ,
জানে দেশভাষামাত্র,
স্বদেশসভায় বসিবারে হায়
তাই অযোগ্য পাত্র ॥

৪

বেশভূষা ঠিক যেন আধুনিক,
মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ,
কিন্তু বচন অতি পুরাতন,
ঘোরতর জরাজীর্ণ।
উচ্চ আসনে বসি এক মনে
শূন্যে মেলিয়া দৃষ্টি
তরুণ এ লোক লয়ে মনুশ্লোক
করিছে বচনবৃষ্টি।
জলের সমান করিছে প্রমাণ
কিছু নহে উৎকৃষ্ট
শালিবাহনের পূর্ব সনের
পূর্বে যা নহে সৃষ্ট।
শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে
নিখিল পুরাণতন্ত্রে ?

বয়স নবীন করিছেন ক্ষীণ
প্রাচীন বেদের মন্ত্রে ?
আছেন কি তিনি লইয়া পাণিনি,
পুঁথি লয়ে কীটদষ্ট ?
বায়ুপুরাণের খুঁজি পাঠ-ফের
আয়ু করিছেন নষ্ট ?
প্রাচীনের প্রতি গভীর আরতি
বচনরচনে সিদ্ধ
কহ তো ম'শায়, প্রাচীন ভাষায়
কত দূর কৃতবিদ্য ?

উত্তর

ঋজুপাঠ দুটি নিয়েছেন লুটি,
দু' সর্গ রঘুবংশ—
মোক্ষমূলার হতে অধিকার
শাস্ত্রের বাকি অংশ ॥

———

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিতশির
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা ।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব ।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্‌নেটিজ্‌ম্ শক্তি—
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়,
তাই জেগে ওঠে ভক্তি ।

সভ্যাটি হলে প্রাণপণবলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মনটা।
এম-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দান্ত।
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের—
অন্তত গ্যানো-খণ্ড,
হেলমহংস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ডভণ্ড!

উত্তর

কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি—
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি॥

['কল্পনা' কাব্যগ্রন্থ—১৩০৭ বঙ্গাব্দ।]

বিজয়চন্দ্র মজুমদার [১৮৬১—১৯৪২]

মাভৈঃ মাভৈঃ

[রঙ্গের বিষয় দেশের তৎকালীন অবস্থা ও নেতাদের রাজনীতি-চর্চা]

১

গ্যাস থেকে জল হয় বলে যখন কেমিষ্ট্রি
পরিষ্কার বোঝা গেল সৃষ্টির যত মিস্ত্রি।
বোঝা গেল পরমেশ্বর নিতান্তই ফক্কা,
ধর্মকর্ম একেবারে পাবেই পাবে অক্কা।

তীর্থগুলো ব্যর্থ হল, কেউ না রাখে তত্ত্বা
বারাণসী বুদ্ধ গয়া পেলেস্টিন্ ও মক্কা।
হায় রে ধর্ম ! কিন্তু চর্মচক্ষে সবাই চেয়ে দ্যাখ,
হিন্দুর অংশে পরমহংসে কচ্চে কত প্যাক প্যাক।
মাভৈঃ মাভৈঃ খানাডোবায় বাড়ছে ওঁদের গুষ্টি ;
ইংরাজীতে তর্জমায় ভেরিটেবল্ গুস্‌টি।

২

দেশের নীতি মন্দ অতি, ছেলেগুলি দুষ্ট ;
বুক ঠুকে বেড়ায় সুখে, চুরুট মুখে পষ্ট।
গৌরাঙ্গ হেরে অঙ্গ বাঁকায় নাকো মোটে ;
দলে দলে টাউন হলে হল্লা কোরে জোটে।
ইন্সিয়র বাংলা বই করে ঘরে জমা,
থাকতে দেশে চমৎকার বাইবেলের তর্জমা।
ছেলে দুষ্ট, যুবা দুষ্ট, এ কি মহাপাপ !
ঠিক বলেছ গণকঠাকুর, কলিরই প্রতাপ।
মাভৈঃ মাভৈঃ ওয়েলডন্ চিন্তা কচ্চেন গতি ;
নিদেন কথা, গিদেন্ ছেলের সুধরে যাবে নীতি।

৩

উড়ে গেল বর্ষা বাদল, পুড়ে গেল ধান ;
নাহি অন্ন অবসন্ন হচ্ছে জীবের প্রাণ।
ছিল পৈতৃক ম্যালেরিয়া, প্লেগ্‌টা স্বোপার্জিত,
দুটোয় মিলে চুলোয় দিলে সুখশান্তি যত।
এত টীকে, তবু টিঁকে রইল রোগের মূল,
কেমনে ভাই বাঁচি প্রাণে পাইনে ভেবে কূল।
কিন্তু দেশে খ্রীষ্টমাসে দেখছ না কি মজা ভাই ;
বছর বছর কেঁচর-মেচর কচ্চে দেশের কত চাঁই।[১]
মাভৈঃ মাভৈঃ কংগেরেসে হাঁসিল কোরে দাবি,
পোক্তা যত বক্তা বাবু কর্বে কাবু সবি।[২]

['নব্য ভারত' পত্রিকা—ফাল্গুন, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ ; কবির কোনো কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় নি।]

টীকা

১ 'কিন্তু দেশে ...কত চাঁই'—এই সময় কংগ্রেসের অধিবেশন হত।
২ 'মাভৈঃ মাভৈঃ......দাবি'—এই বছর কলকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন হয়।

বঙ্গমঙ্গল

(খণ্ড কাব্য)

[১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের দু বছর আগেই অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনাটি তৈরি করেছিলেন এবং এই সময় থেকেই এ-ব্যাপারে সরকারী জেদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। অপর দিকে দেশবাসীর প্রতিবাদের কণ্ঠও ক্রমশ চড়ায় উঠতে থাকে। বিজয়চন্দ্রের এই ব্যঙ্গরচনাটি এই সময়েই লেখা।]

প্রথম সর্গ

(মন্ত্রণা)

অর্জন করিতে যশ কর্জন সুজন
কেমনে গর্জন করি হেলায়ে তর্জনি
আদেশিল সাধুশীল সচিব প্রধান
রিজ্‌লি[১] রে রিজলিউশন্ লিখিবারে —
বর্ণিব সে যশকীর্তি। এ অর্ণবে হায়
কিরূপে উড়ুপে চড়ি পারি পার হতে?
তুমি যদি, হে ভারতি, নাহি ধর হাল?
খাটুনিও নাহি বেশি পাটুনীর কাজে।
থাকিলেও ক্ষতি কি বা? কার্যহীন তুমি
হবেই তো অচিরাৎ নূতন বিধানে।[২]
আগে থেকে দাঁড়-টানা শিখে রাখা ভাল।
পার কর বীণাপাণি কাব্য-কালাপানি।

হিমালয়ে সিমলার তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা —
নিজনে মার্জন করে পর্জন্য আপনি,
কর্জন বসিয়া তথা কনক-আসনে
ভাষেণ অমৃতবাণী বাণী-বিড়ম্বিনী,
সম্ভাষি সচিবে, মিত্রে, পাত্রে, কোতোয়ালে।—

"বিদায়িতে ভারতীরে মাধুভির রথে
পূর্ণ আজি আয়োজন, চূর্ণ আন্দোলন।
হে পাত্র! পড়িয়া শাস্ত্র গাত্র দাহ কারো
নাহি হবে; রবে সবে নীরবে জগতে।

ছল-ধরা রোগে ধরা ছিল প্রপীড়িত,
লুপ্ত হবে তাহা গুপ্ত বিধির প্রচারে ;
ওহে মিত্র, নেত্র আজি উৎফুল্ল উল্লাসে ।

শান্তির কুলীশ দিব পুলিশের হাতে,
আঁটো ঢাল কোতোয়াল শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিয়া ।
সচিব, রচিব আমি অন্য নব বিধি,
ঠাণ্ডা করি দেশ, তুমি পাণ্ডা হও তার ।"
শুনি সে-অমৃতবাণী জয়ধ্বনি করি
উঠিল সচিববৃন্দ ; বন্দী গাহে গান ।

(বন্দীর গান)

করিয়ে দরবার জেরবার
করেছ রাজাগণে ।
রহিবে নাম ছাপা (ধামা চাপা)
পুলিশ কমিশনে ।
ইউনিবরসিটি বরষটি
অস্ত না যেতে যেতে
করিবে ভারতীর মতিস্থির
কুলোর বাতাসেতে ।
গুপ্ত বিল্ খুলি বিলকুল-ই
মহিমা জারি হোলো ।
প্রভুর জয়গানে এক তানে
সকলে হরি বলো ।

দ্বিতীয় সর্গ

(উদ্যোগ)

"মধুমাখা ইতিবৃত্ত প্রত্নতত্ত্বে জারি
করিলে সচিব তুমি, বাঁচিল বাঙালী ।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সে ছিল তিন দেশ
এক সঙ্গে বঙ্গে তার শাসন গর্হিত ।

বিশেষ বঙ্গের লোক বড় কথা কয়
জ্বালা-ফালা করি কর্ণ। জ্বালা দূর হবে,
কথা বন্ধ কর যদি কবন্ধ করিয়া।"
উচ্চারিয়া কথাগুলি হস্তে লয়ে ছুরি
দক্ষ সার্জনের মতো দাঁড়াল কর্জন,
কহিল সচিব তবে যুক্ত করযুগে—
"ছুরি হেরি ডরি প্রাণে যদি ওঠে কাঁদি ;
কিম্বা যদি ধড় হতে স্বতন্ত্রিতে মাথা
শঙ্কা হয় প্রাণে তার ? কি হইবে প্রভু ?"
বাঁধি রসনায় লক্ষ ভৎ'সনা বচন
কহেন শ্বেতাঙ্গ-পতি :—"অঙ্গচ্ছেদ অতি
সোজা কথা, মজা ওতে আছে বহুবিধ।
উহাতে চিৎকার করা ভাবপ্রবণতা।
বৈজ্ঞানিক জাতি মোরা শিখাব এবার
থাকে প্রাণ ধড় মুণ্ড বিভক্ত করিলে।
যতটুকু যাবে কাটা ঠিক ততখানি
এনে দিব অন্য দেহ হইতে কাটিয়া ;
সবগুলো হবে তাজা সমান সমান।
বঙ্গ হতে কাট বঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ত সেটা।
কলিঙ্গ কিঙ্কিন্ধ্যা জুড়ি উৎকলের সাথে
কর নব দেহ সৃষ্টি। ভাষার একতা
অত্যন্ত আশ্চর্যরূপে হইবে সাধিত।"
তথাস্তু বলিয়া সবে শির করি নত
ব্রত হল নব বিধি করিতে প্রচার।
হুঙ্কারে মেদিনী ফাটে। উঠিল রোদন
বুদ্ধিহীন বঙ্গমুখে অঙ্গচ্ছেদ ভয়ে।

(রোদন ধ্বনি)

মাথাটা কাটা গেলে
বাঁচিব জানি খাঁটি ;
শোভিব নব ভালে,
দেহটা দিলে ছাঁটি।

মঙ্গল হবে খাসা
বিশেষ আছে জানা,
জঙ্গলে পাবে বাসা
অঙ্গের দুটো ডানা।
অবোধ মোরা ওগো
কাঁদিয়া মরি তবু,
বঙ্গটা বঙ্গে রাখো
করুণা করি প্রভু।

তৃতীয় সর্গ

(সিদ্ধি)

—তূণক ছন্দ—

অস্ত্র-হস্ত লাট, মস্ত বঙ্গ-অঙ্গ ছেদিবে।
সাধ্য কার আজি তাঁর ন্যায্য কার্য রোধিবে?
মন্ত্রপূত লাটদূত দেশ দেশ ধাইল;
ভেদমন্ত্র বেদতন্ত্র কণ্ঠ তার গাইল।
হর্ষনেত্র পাত্রমিত্র লম্ফ ঝম্ফ ঝাঁপিল।
ঘোর রোল গণ্ডগোল; বঙ্গখণ্ড কাঁপিল।
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড হইল তায় দুঃখ কি?
খণ্ডশূন্য জেদপূর্ণ রৈল লাট বাকাটি।
দেখ সর্ব স্লাট-গর্ব হেরি পুষ্প বর্ষিল,
বঙ্গমুণ্ড দেহপিণ্ড ছাড়ি ভূমি পর্শিল।
স্তব্ধ বঙ্গ, কর্ম সাঙ্গ, লাট ঘাড় নাড়িল।
তূণকের ছন্দ ঢের বর্ণনায় বাড়িল।

মাথাটা গেল যবে দ্যাখে সবে
দেহটা ঠাণ্ডা!
কেহ বা ভাবে মনে সংগোপনে
গেছে বা প্রাণটা।
উড়ের মাথা জুড়ে দিল ধড়ে,
তবুও নড়ে না!

আসাম দিল খাসা লম্বা নাসা,
শ্বাস যে পড়ে না।
টিপিয়া নাড়ি তার ফেরেজার
কহেন লাটকে,—
"আমার দেহটিতে পার দিতে
মাথাটা আটকে;"
কহেন লাট যে সে কড়া ভাষে—
"কোরো না বিজ্‌ বিজ্‌
জুড়িয়া দিলে মাথা রবে কোথা
আমার prestige."

খণ্ড হল বঙ্গদেশ,
খণ্ড কাব্য হল শেষ।
বঙ্গের মঙ্গল আজি করিল কর্জন।
শ্রীবঙ্গ-মঙ্গল গায় বঙ্গবাসীজন ॥

[প্রথম প্রকাশ: 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্যায়) ফাল্গুন ১৩১০ বঙ্গাব্দ;
কবির 'ফুলশর' কাব্যগ্রন্থে (১৩১১ বঙ্গাব্দ) সংকলিত।]

টীকা—

১ রিজ্‌লি—H. H. Risley—ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব।

২ "কার্যহীন তুমি ··· নূতন বিধানে"—'নূতন বিধান' অর্থাৎ 'য়ুনিভার্সিটি বিল্‌'; ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশকে ব্যাহত করার ব্যাপারে এটি লর্ড কার্জনের একটি অভিসন্ধিমূলক প্রচেষ্টা। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের 'য়ুনিভার্সিটি বিল্‌' প্রবন্ধটি ('আত্মশক্তি ও সমূহ' গ্রন্থের অন্তর্গত) দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালার পলিটিক্স্

(আরামপ্রিয় ভণ্ড রাজনীতিজ্ঞদের স্বরূপ)

আরাম চেয়ারে শুয়ে ভেবে কূল পাইনে—
কিরূপ শাসননীতি হবে ফিলিপাইনে !
ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা,
ম'ল কি বাঁচিল তথা
বিচার হইবে এবে কি রকম আইনে,
রীতি নীতি দেশাচার চলিবে কি লাইনে ?
গোঁয়ার বোয়ার জাতি
কেন করে মাতামাতি ;
চলিয়াছে ডিওয়েট বাঁয়ে কিম্বা ডাইনে—
ভেবে ভেবে সে সমস্যা অন্ন আর খাইনে।
তিন কোটি মূল ধন
লয়ে যদি কোন জন
মাছ ধরে একেবারে চলে গিয়ে রাইনে,
বুঝিতে না পারি সাফ্
কতটা যে হয় লাভ,
বোধ হয়, হয় কিছু—ঠাওর তো পাইনে।
প্লেগে নাকি হয় মাটি,
হনলুলু, ওটাহাটি,
দুর্ভিক্ষ হয়েছে নাকি নবাজোয়া স্কাইনে ·
কি হবে উপায় হায় ভেবে দিশে পাইনে।
কি হবে স্পেনের গতি,
চাষীর হতেছে ক্ষতি,
ফসল হল না ভাল এ বছর ডাইনে ,
মিছাই জঙ্গল রাখা
আদপে হয় না টাকা
লোহার সুলভ দরে ওকে কিম্বা পাইনে।
উথলিছে বড় শোক
মরেছে অনেক লোক
হেটেন্‌টট্ দেশে হায় হীরকের মাইনে !

বল কি উপায় করি ?
নদীতে ডাকাতি চুরি
হতেছে বিষম নাকি ভিক্টলা ও টাইনে।
আমার না হয় ঘুম—
ইলেকসনে মহা ধুম,
সবে বলে হগ্ চাই লায়নকে চাইনে।
আইরিশ্ বিলে নাকি
লাগিয়াছে ঠোকাঠুকি
মেরেছে থাপ্পড় কেউ ধরিয়া ও'ব্রাইনে।
যায় দিবা অনিদ্রায়
পলিটিক্স ভাবনায়,
অধিক লিখিতে আমি অদ্য আর চাইনে ;
কেবল জিজ্ঞাসা করি,
যদি লই এডিটোর,
এত বিদ্যা লয়ে আমি কত পাব মাইনে ?

('ফুলশর' কাব্যগ্রন্থ—১৩১১ বঙ্গাব্দ)

লাট-বিদায়

(১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলারের অকথ্য নির্যাতনে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফুলারের এই অত্যাচার-প্রবণতাকে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিন্টো, এমন কি ভারত সচিব লর্ড মর্লিও সমর্থন করতে পারেন নি। ফলে ফুলার সাহেবকে পদত্যাগ করে এ-দেশ থেকে বিদায় নিতে হয়।)

১

উপক্রমণিকা

চতুর্বর্ণের মধ্যে দেখি প্রথমটির দৈন্য,
চতুর্বর্গের মধ্যে ভবে দ্বিতীয়টি ধন্য,
চতুর্বেদের তৃতীয়টি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ,
চতুর্যুগের চতুর্থটি ফুরাচ্ছে না শীঘ্র ;



পূর্ব্ববঙ্গে গজারোহণ।

প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৪।

ব্যাম্‌ফিল্‌ড্‌ ফুলারের শাসন- সম্বন্ধীয় ব্যঙ্গচিত্র

চারিদিক ভেবে ঠিক কত্তে নারি তাই
চতুর জনের চারি নীতির কোন্‌টি মোয়া চাই।
শাম নীতিতে সমতল তিব্বতে পর্বত,
দানের পুণ্যে উড়ে গেল দেশের সম্পদ;
ভেদ নীতিতে করে খেদ মূর্খগুলো বঙ্গে,
দণ্ডনীতির গণ্ডগোল জঙ্গী ল্যাটের সঙ্গে।[১]
কে যে বড় কে যে ছোট কেমন করে বুঝি,
উনিশ-বিশ নাহি মানি, তুল্যরূপে পূজি।
চারিনীতির উপরেতে তিনটির খেলা,
রাইট্ হ্যাণ্ডে উপযুক্ত লেফ্‌টনেণ্ট চেলা।
ফেরে যার সাথে সাথে গৃহ হিতকারী
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নিজে গুপ্ত বেশধারী।
বীরদর্পে বড় কত্তা সিংহনাদ নাদি'
বলে গেলেন নিদেন কথা হিদেন্ মিথ্যাবাদী।[২]
পবিত্র আত্মার ঘুঘু ভিটেয় করি পেশ,
উদ্ধারেন ছোট কত্তা আমাদের দেশ।
গুপ্ত দেবের ভাষাতত্ত্বে কূল নাহি পাই;
শালগিরামের শোয়া-বসা, দুঃখ কিছু নাই।

২

এড্রেশ

কত্তা তুমি চন্দ্রে ঘরে নেহাল করি দেশ;
রচি তব কীর্তিকল্পে কাব্যে এড্রেশ।
জঙ্গী বেটার সঙ্গে বুঝি কর্ম হল ঠাণ্ডা,
নইলে সবাই বুঝতো তুমি কত বড় বান্দা!
গর্‌গরিয়ে রাগের চোটে ইস্তফাটি পেশ,
রইল কিন্তু আস্ত সেই কেশী-নরের কেশ।
জবরদস্তের সঙ্গে নাহি উঠতে পার এ'টে;
নরম কাঠের ছুতোর তুমি, গেলে বঙ্গে কেটে।
কলেজ-বয়ের ভয়ে তোমার ইস্তাহারের ধূম,[৩]
রজনীতে কাঁদন ভায়া হয় নি তোমার ঘুম?

ঘরে গিয়ে পরের ভাবনা কোরো নাকো আর ;
রেখে গেলে যতটুকু এই তো চমৎকার ।
গিয়ে দেশে ভুলে যেয়ো কাশ্মীরের স্বর্গ ।
এডরেশের প্রথমাক্ষর পড় পাঠকবর্গ ।

কবিটি তোমার ভক্ত বুঝহ ইঙ্গিতে,
ঘোষিল অতুল কীর্তি বিজয়-সঙ্গীতে ।

['প্রবাসী' পত্রিকা কলকাতা – অগ্রহায়ণ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ ;
কবির কোনো কাব্যগ্রন্থে নেই ।]

টীকা—

১ 'দণ্ডনীতির গণ্ডগোল……সঙ্গ'—এই সময় ছোটলাট ফুলার সাহেবের অত্যাচার পূর্ববঙ্গে পুরোদমে চলেছিল, কিন্তু বড়লাট লর্ড মিন্টো, এমন কি ভারত-সচিব লর্ড মর্লিও ফুলারের এই অত্যাচার-মূলক দণ্ডনীতি বরদাস্ত করতে পারেন নি। এই কারণেই কাজে ইস্তফা দিয়ে ফুলার দেশে চলে যান।

২ 'বলে গেলেন … মিথ্যাবাদী'—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে (২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ) ভাষণদানকালে লর্ড কার্জন ভারতবাসীদের মিথ্যাবাদী বলতেও কুণ্ঠিত হন নি।

৩ 'কলেজ বয়ের তরে … ধূম'—"লাট ফুলার সিরাজগঞ্জের কয়েকটি ছেলেকে একেবারে শিক্ষাগার হইতে বাহির করিয়া দিতে (Rusticate) বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিয়া লেখেন। এইরূপ কার্যে অনুমোদন না করিয়া লর্ড মিন্টো লাট ফুলারকে উক্ত চিঠিখানি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ফুলার বলেন ঐরূপ চিঠি যদি বিবেচিত না হয় তবে তিনি পদত্যাগ করিবেন। চিঠি বিবেচিত হইল না, সুতরাং তিনিও কাজ ছাড়িয়া দেন, আর ভারত সচিব মর্লি সাহেবও অবিলম্বে পদত্যাগ পত্র মঞ্জুর করিয়া লন।"—

(হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'—২য় খণ্ড পৃ-৬২)

ঠিক বলেছ

(ইংরেজকে ম্লেচ্ছ বলে গালি দিয়ে আর তাদের অসাধারণ কর্মশীলতাকে অশিষ্টাচার বলে ধিক্কার দিয়ে আমরা এক সময় নিজেদের আলস্যকে সাত্ত্বিকতার মণ্ডিত করতে চেয়েছিলাম। এই আত্মপ্রবঞ্চণার সঙ্গে ছিল ভারতের অতীত গৌরবের দোহাই।)

তোমরা কর শ্রমের বড়াই
আমরা যে রে বাবু ;
তুমি চাহ কত্তে লড়াই
আমি তাহে কাবু।
তোমার খেলা ছুটাছুটি,
আমার খেলা গ্রাবু,
তোমার খাদ্য গোস্ত-রুটি
আমার পথ্য সাবু।
মোরা আর্য অতি শিষ্ট
তুমি বেটা ম্লেচ্ছ।
দুষ্ট লোকের নাহি ইষ্ট !
ঠিক বলেছ ! হেঁচ্চো !

তোদের ধর্ম রজ-তম
মোরা অতি সাত্ত্বিক ;
তোদের মূর্তি অসুর-সম
মোরা রূপে কার্তিক।
পা-উঁচিয়ে কর রোষ
ঘন ঘন মারো কিক্,
আইন খুলে তস্য দোষ
দেখাই মোরা তার্কিক।
আর্য যাবে স্বর্গে হেঁটে
তোরা দেবের ত্যাজ্য,
মাঁব খালি রাজ্য ঘেঁটে।
ঠিক বলেছ। হেঁচ্চো !

জানিস্ ? যখন ছিলি বনে,
করল এই জাতে কি ?
ধনী হয়ে মোদের ধনে
লড়াবি মোদের সাথে কি ?
আছে প্রাচীন ঘিয়ের ভাঁড়
নাই থাকুক তাতে ঘি,
খচ্চি এখন ভাতের মাড়
দেখ্‌বি পরে পাতে কি !
শাস্ত্রগুলো করি জড়ো
ভাবলে কথা ন্যায্য,
বুঝবি মোরা কত বড় !
ঠিক বলেছ ! হেঁচ্চো !

—('প্রবাসী' পত্রিকা, কলকাতা—পৌষ, ১৩১০ বঙ্গাব্দ :
কবির কোনো কাব্যগ্রন্থে নেই ।)

মনের কথা

(রাজনৈতিক ঘটনার পটভূমিতে লেখা যশের কাঙাল, কথা-সর্বস্ব বাঙালীর অন্তরের দীনতার ছবি ।)

মনের কথা বল্লে খুলে লোকে বলবে পাগল !
আমিই কোন্ করে বেয়াৎ,
তবে কি না সামনে নেহাৎ
যা তা কথা বলতে নারি খুলে মুখের আগল ।
যা হোক, রাখি ঢাকা চাপা,
দেখাই যে সে ভিতর ফাঁপা ।
কুমড়া বলি দিয়ে বলি দুর্গা খেলেন ছাগল ।
বলি পটল, ভাজি ঝিঙে ;
বলি জাহাজ চালাই ডিঙে ;
ঝোলাই লম্বা কোঁচা, তবে ছুঁচো করে যা গোল ।

'কালো কুর্তি' লাগায় বেটন্
মেহের মাংসে করি মাটন্ :
ভ্যা-ভ্যা চেপে হালুম্-ডাকে তবু উঁচাই খাবোল।
অগ্নি মোদের খ্যাতি রটে,
হলেও গ্রাম্য, সিংহ বটে !
পিঠের দাগ ঢেকে পিটি আত্মযশের মাদল।
পরের দড়ায় পাকে ভ্রমি
লাটিম সম 'অটনমি'
হচ্ছে বটে, কিন্তু ঘটে জাগছে শক্তি আসল।
খুঁজি বটে গর্তে বাসা
আত্মশক্তি আছে খাসা
বিপত্তিতে মাচার তলে খোকার মায়ের আঁচল।

['প্রবাসী' পত্রিকা, কলকাতা– বৈশাখ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ;
কবির কোনো কাব্যগ্রন্থে নেই।]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [১৮৬৩-১৯১৩]

বাঙ্গালী-মহিমা

মিথ্যা মিথ্যা কথা যে—"বাঙ্গালী ভীরু,
বাঙ্গালীর নাহি একতা—"
কেন বক্তৃতায় রটাও সে বাণী
খবর কাগজে লেখ তা ?
অদ্য পদ্যে আমি বাঙ্গালী বীরত্ব
করিব জগতে ঘোষণা ;
বেরোবে ছাপায় : পড়িতে পাবে তা
ব্যস্ত হও কেন ? রোস না।
তবে তালুদেশে চড়াং করিয়া
নেমে এসো মাতা ভারতি !

অর্জুনের সাধ্য হত যুদ্ধ করা
কৃষ্ণ না থাকিলে সারথি ?
সাহায্য তুমি না কর যদি আমি
সমর্থ তাহাতে নহি মা,—
দাও বীণাপাণি বীণার ঝংকার
গাইব বাঙ্গালী-মহিমা।
খোলো ইতিহাস,—সতেরো তুরস্ক
প্রবেশিল যবে গৌড়েতে,
লক্ষ্মণ সেন তো দিলেন চম্পট
কচু বনে এক দৌড়েতে।
সে অপূর্ব সুমধুর, আধ্যাত্মিক
দীর্ঘ পলায়ন কাহিনী
যোগ্য ছন্দোবন্ধে বোধ হয় আজও
ভাল করে কেহ গাহি নি।
পরে আফগান, মোগল, পাঠান
দলে দলে দেশ জুড়িয়া
করিল রাজত্ব ; তাহাও বীরত্বে
সহিল বাঙ্গালী উড়িয়া।
আসিল ইংরাজ ; বাঙ্গালী (লেখে ত
সব ইতিহাস বহিতে)
দিল দীর্ঘ লম্ফ ইংরাজের কোলে
পাঠানের ক্রোড় হইতে।
করেছে সংগ্রাম মহারাষ্ট্রী শিখ,
মূর্খ যত সব মেড়ুয়া,
তুমি সূক্ষ্মবুদ্ধি সন্ন্যাসীর মত
(যদিও পর নি গেরুয়া)
নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত উদাসীন হাস্যে
বুঝে নিলে সব পলকে,—
'ভবিতব্য লিপি কে খণ্ডাতে পারে ?
কাটাকাটি করে ফল কি ?'
হবে না বা কেন ? খায় ছাতু রুটি—
পশ্চিমে পাঞ্জাবী পাহাড়ে ;

"তোমরা বসিয়া কাঁচকলা ভাত
খাও আধ্যাত্মিক আহারে।
তারা ভাবে তাই অলসতা চেয়ে
কার্য করাটাই শ্রেয়সী
তোমরা হাসিয়া ভাব মূর্খ সব—
জীবনের সার প্রেয়সী ;
তাহাদের চিত্র অর্জুন রাবণ
ভীষ্ম শরশয্যাশয়নে ;
তোমাদের পট বংশীধর বাঁকা—
প্রেমে ঢুলু ঢুলু নয়নে ;
তারা গায় সবে "জয় সীতারাম"
আজও শুনি যেথা যাই গো ;
তোমাদের গান "জয় শ্রীরাধিকে—
ওগো দুটি ভিক্ষে পাই গো।"
তেমনটি কেহ পারে নি জগতে—
তোমরা যেমন দেখালে ;
বুঝেছে তা মোক্ষমূলার ও গেটে—
—ধিক্ মিথ্যাবাদী 'মেকালে'।
এ সব ত মাত্র পুরাণ কাহিনী—
কাঁহাতক স্মরি' রাখি মা।
কিন্তু আজও দেখ চক্ষের সামনে
প্রত্যক্ষ বাঙ্গালী গরিমা।
এখনো বাঙ্গালী জগৎ সম্মুখে
রাস্তা ঘাটে দিয়া নিয়ত
চলিছে নির্ভয়ে—এ কথা জগতে
প্রচার করিয়া দিও ত।
তারপর বুদ্ধি!—আশ্চর্য সে বুদ্ধি!
ইংরাজী ফরাসী কেতাবে
পড়িছে, পরীক্ষা দিতেছে ; নিতেছে
'এম এ' ও 'এম ডি' খেতাবে।

ব্যবসা চাকরি করিয়া,—কত কি
নাটক নভেল লিখিয়া
আজিও আছে ত শুদ্ধ বুদ্ধিবলে
এ জগতে সবে টিঁকিয়া।
ল্যাণ্ডোয় চড়িছে, ফিটনে চড়িছে,—
ট্যাণ্ডেম হাঁকায় সঘনে ,
বা-সিকিলে যায় ; অশ্বপৃষ্ঠে ধায়
ধূলি উড়াইয়া গগনে ;
খেলিছে ক্রিকেট, ফুটবল, করে
সার্কাস, জান না তাও কি ?
করিছে বক্তৃতা—লিখিছে কাগজে ;
তার বেশী আর চাও কি !
ভেবে দেখ সেই সত্যযুগ হতে
কলিযুগাবধি হেন সে
বরাবর বেঁচে এসেছে ত, তার
বেশী আর পারে কেন সে ?
এত বিপদের আবর্তের মাঝে,
এত বিজাতীয় শাসনে,
বরাবর টিঁকে আছে ত, তাকিয়া
ঠেসিয়া, ফরাস আসনে।
ধন্য বুদ্ধিবল !—যুদ্ধে কভু শির
দেও নি কাহারে বক্সী ;
যদি বাহুবল অভাব, বুদ্ধিতে
পুষিয়ে নিয়েছ। মন্দ কি।

('আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থ—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।)

কর্ণবিমর্দন কাহিনী

[পজ্ঝটিকা ছন্দ]

জানো না কি কদাচন মূঢ়,
কর্ণবিমর্দন মর্ম কি গূঢ় ?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য
যদি না তা আকর্ষণ জন্য ?
যদি বল সেটা শ্যালী ভিন্ন
অপর করে নয় আদরচিহ্ন
তবু যদি সাহিব অল্পে স্বল্পে
টানে, হয় তা মধুর বিকল্পে ;
অন্তত নাসারক্ষার্থে, সে
কাণমলা হয় গিলিতে হেসে ।
বাবা সে দশ ইঞ্চি প্রস্থে—
বিপুল বিশাল প্রকাণ্ড হস্তে
শূকর-গো-মৃগমাংসে পুষ্ট—
আছে রক্ষা হইলে রুষ্ট ?
কর্ণাকর্ষণ অতিশয় তুচ্ছ,
যা কর সাহিব নাড়িব পুচ্ছ,
হুজুর হুজুর বলি' জীবনমরণে
র'ব পড়ি' ইন্দুনিন্দিত চরণে :
—রহিও খুসি, ঘুঁসি আসটা, রাগে
মেরো নাকো কেবল নাকে ।
ও ঘুঁসি পড়িলে কর্ণে, স্তব্ধ
ত্রিভুবন : শুনি শুধু ঝাঁ ঝাঁ শব্দ ;
ও ঘুঁসি পড়িলে গণ্ডে জোরে,
একেবারে মাথা ঘোরে ।
কাণা নিশ্চিত পড়িলে চক্ষে ।
ভূমিবিলুণ্ঠিত পড়িলে বক্ষে ।
পড়িলে দন্তে বিভগ্ন পংক্তি ।
পড়িলে নাকে রক্তারক্তি !

শুধু ও অঙ্গুলি মৃদুল স্পর্শে
শ্রবণে তো প্রভু অমিয়া বর্ষে।
বসিয়া বসিয়া নিজ ঘর মধ্যে
লেখা সোজা গদ্যে পদ্যে
"সমুচিত, তুলিয়া ঘুঁসি নিজ হস্তে
মারা বেগে অরাতি মস্তে"
জানো না সে স্থানে, একা
লাগে প্রথমত ভেবা চেকা।
যখন পরাজয় খলু অনিবার্য,
তখন কি যুদ্ধটি বুদ্ধির কার্য -
না হইলে সমসাত্তিন অবস্থা,
থাকো নীরবে হি অতি সত্তা।
মাখি তৈল ঘন কুঞ্চিত কেশে
মানসিক উদরটা, ঠেসে
ডালে ভাতে করিয়া পূর্ণ
গন্ধে পানে ভরিয়া তূর্ণ
চাপকান পরিয়া আপিস নিত্য
আসি হি পুরুষানুক্রম ভৃত্য,
নাকে কাণে, চুপে চুপে
রক্ষা করিয়া কোন রূপে
সংসারেতে টিকিয়া আছি—
রহি না ঘুঁষি-ঘুঁষি কাছাকাছি।

('আষাঢ়ে' কাব্যগ্রন্থ—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ)

জিজিয়া কর

পাঁচশ বছর এমনি ক'রে
        আসছি সয়ে সমুদায় .
এইটি কি আর সইবে নাকো—
        দু' ঘা বেশী জুতার ঘায় ?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা ;
        দিবি দু' ঘা, দেনা বাবা !
দু' ঘা বেশী, দু' ঘা কমে
        এমনি কি আসে যায় ।

তবে কিনা জুতোর গুঁতো
        হয়ে গেছে অনেকবার,
একটা কিছু নতুন রকম
        কর্লে হত উপকার ;
ধর্ না যেমন, বেটা ব'লে
        দিলি না হয় কাণটা ম'লে,—
জুতার খোঁটা খেয়ে খাঁটা
        প'ড়ে গেছে সকল গায় ।

প'ড়ে আছি চরণতলায়
        নাকটি গুঁজে অনেক কাল ;
সৈবে সবই, নই ত মানুষ,
        আমরা সবাই ভেড়ার পাল ;
যে যা করিস দেখিস চাচা,
        মোদের পৈতৃক প্রাণটা বাঁচা,
শাঁসটা খেয়ে আঁশটা ফেলে
        দিস রে দুটো দুবেলায় ।

তোরাই রাজা তোরাই মুনিব,
মোরা চাকর মোরা পর,
মনে করিস চাচা এটা
তোদের বাড়ী তোদের ঘর ;
মোরা বেটা মোরা পাজি,
যা বলিস তাই আছি রাজি ;—
রাজার নন্দিনী প্যারী,
যা বলিস তাই শোভা পায়।

['হাসির গান'—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ]

খুসরোজ

[এই কবিতায় 'মোগল' শব্দটি 'ইংরেজ' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।]

১

আজ, এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে
উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজায়,
—উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা
তো হবে বজায় ,
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো
মানের দায়ে,
এখন ত উচিত কার্য এদিক ওদিক
বুঝে চলাই :
—সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে
বাবা বলায়।

২

আজ, এই শুভ রাতি, জ্বালবো বাতি
ঘরে ঘরে ভক্তি ভাবে ;
নৈলে যে চাকরি যাবে,
নৈলে যে চাকরি যাবে।

—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো
পেটের দায়ে :
নিয়ে আয় চেরাক বাতি
নিয়ে আয় দিয়েসলাই :
সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

৩

"জয় জয়, মোগল ব্যাঘ্র মোগল ব্যাঘ্র"
ব'লে জোরে ডঙ্কা বাজাই :
পাহারা ফির্চ্ছে দ্বারে,
সেটা যেন ভুলে না যাই :
—আমাদের ভক্তি যা এ—এ যে গো
প্রাণের দায়ে :
কি জানি পিছন থেকে
কখন ফাঁসি পড়ে গলায়।
—সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

৪

আমরা সব "রাজভক্ত রাজভক্ত" ব'লে
চেঁচাই উচ্চরবে :
কারণ সেটার যতই অভাব
ততই সেটা বলতে হবে।
—আমাদের ভক্তি যা এ—মানের,
পেটের, প্রাণের দায়ে :
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা
ছুটে পালায় :
—সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।

৫

ভোলানাথ শুয়ে আছেন,—
        ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন ;
কালী জিব মেলিয়ে আছেন
        তা তিনি মেলিয়ে থাকুন ,
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন
        তিনি পটেই আঁকা ;
আমরা সব নিয়ে শরণ
        মোগলদেবের চরণতলায় ,
—সাধে কি বাবা বলি,
        গুঁতোর চোটে বাবা বলায় ।

('হাসির গান'—১৯০০ খৃষ্টাব্দ)

বিলাতফের্তা

আমরা বিলাত ফের্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
        করিয়াছি সব জবাই ।
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি'
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি
আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
        মুটেদের ডাকি "কুলি" ।
"রাম" "কালীপদ" "হরিচরণ"
নাম এ সব সেকেলে ধরণ ;
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
        করিয়াছি নামকরণ ;

আমরা সাহেব সঙ্গে পটি
আমরা মিস্টার নামে রটি,
যদি "সাহেব" না বলে "বাবু" কেহ বলে,
মনে মনে ভারি চটি।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর
আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর।
আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসী ধরণে কাশি
আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।
আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।
আমাদের সাহেবিয়ানার বাধা
এই যে রংটা হয় না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই—'ভিনোলিয়া'
মাখি রোজ গাদা গাদা।
আমরা বিলেত ফের্তা ক'টার
দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ঐ
সাহেবগুলোই চটাই।
আমরা সাহেবি রকমে হাঁটি
স্পীচ দেই ইংরিজি খাঁটি
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত
চম্পট পরিপাটি।

['হাসির গান'—১৯০০ খৃষ্টাব্দ]

নতুন কিছু করো

১

নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো;
পাগুলো সব উঁচু ক'রে, মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো;
কিম্বা চিংপাত হয়ে—পাগুলো সব ছোঁড়ো;
ঘোড়াগাড়ি ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো,
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

২

ডাল ভাতের দফা কর সবাই রফা,
কর শীগ্‌গির ধুতিচাদরনিবারিণী সভা,
প্যান্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে,
ধুতিচাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে,
কাঁচকলা ছাড়ো, এবং রোস্ট চপ্ ধরো;
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

৩

কিম্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো,
হিন্দুধর্ম প্রচার করতে আমেরিকায় ছোটো;
আমরা যেন নেহাইৎ খাটো হয়ে না যাই, দেখো,
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখো;
বেন্, মিল্ ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

৪

আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধ'রে মারো;
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো ভালো আরো!
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক;
বি এ, এম এ, ঘোড়সোয়ার যা একটা কিছু হোক।
যা হয়—একটা করো কিছু রকম নতুন তরো;
—নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

৫

হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর :
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির :
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব :
মর্বে, না হয় মর্বে,—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো, কিম্বা নতুন রকম মরো :—
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।

'হাসির গান'—১৯০০ খৃষ্টাব্দ।

তা সে হবে কেন

১

তোমরা দেশোদ্ধারটা করতে চাও কি
ক'রে মুখে বড়াই ?
তা' সে হবে কেন !
তোমরা বাক্যবাণে শুধু ফতে কর্তে
চাও কি লড়াই ?
তা' সে হবে কেন !
তোমরা ইংরাজ-গৌরবে ক্ষুব্ধ ব'লে
চাও কি যে সে
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা সঁপে, শেষে
তাঁপিতল্পা বেঁধে, নিজের চলে যাবে দেশে
তা' সে হবে কেন !

২

তোমরা হিন্দুধর্ম "প্রচার" ক'রেই,
হতে চাও যে ধন্য,
তা সে হবে কেন।

তোমরা মূর্খ হয়ে হতে চাও যে
বিশ্বে অগ্রগণ্য !
তোমরা বোঝাতে চাও হিন্দুধর্মের
অতি সূক্ষ্ম মর্ম—
'টীকিতাটি আধ্যাত্মিক, আর কুর্ত্তোমিটা ধর্ম !'
অমনি তাই সব বুঝে যাবে যত শ্বেত চর্ম ?
—তা' সে হবে কেন !

৩

তোমরা সাবেক ভাবে সমাজটিকে
রাখতে চাও যে খাড়া ;
—তা' সে হবে কেন !
তোমরা স্রোতটাকে ফিরাতে চাও
যে দিয়ে মুখের তাড়া ;
—তা সে হবে কেন !
তোমরা বিপ্র হয়ে কৃতাকার্য করে বাড়ী ফিরে,
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—
দলাদলি করে শুধু রাখবে সমাজটিরে ?
—তা সে হবে কেন !

৪

তোমরা চিরকালটা নারীগণে
রাখবে পাঁচিল ঘিরে ?
—তা সে হবে কেন !
তোমরা গহনা ঘুষ দিয়ে বশে রাখবে রমণীরে ?
—তা সে হবে কেন !
তোমরা চাও যে তারা বদ্ধ থাকুক,
এখন যেমন আছে,
রান্নাঘরের ধোঁয়ায় এবং আঁস্তাকুড়ের কাছে ;
এবং তোমরা নিজে যাবে থিয়েটারে, নাচে ?
—তা সে হবে কেন !

('হাসির গান'—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)

বিলেত

১

বিলেত দেশটা মাটির,
সেটা সোনার রূপোর নয় ;
তার আকাশেতে সূর্য ওঠে
মেঘে বৃষ্টি হয় ;
তার পাহাড়গুলো পাথরের
আর গাছেতে ফুল ফোটে ;
তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা
কর্চ্ছ না ক মোটে ;
কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি,
এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
তোমরাও বলতে তাই ।

২

সেথা পুঁটিমাছে বিয়োয় না ক
টিয়াপাখীর ছা ;
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর
চারটে চারটে পা ,
তাদের ল্যাজগুলো সম্মুখে নয়,
আর মাথাও নয়কো পিছে
তোমরা অবাক হচ্ছ, বোধ হয়
ভাবছো এ সব মিছে ;
কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি
এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
তোমরাও বলতে তাই !

৩

সেথা পুরুষগুলো সব পুরুষ
আর ঐ মেয়েগুলো সব মেয়ে
আর জোয়ান বুড়ো কচি,
কেউ না বাঁচে হাওয়া খেয়ে
তাদের মাথাগুলো সব উপর দিকে,
পাগুলো সব নীচে :
তোমরা মুচকি হাসচ বোধ হয়
ভাবচ এ সব মিছে :
কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি,
এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে তা'লে
তোমরাও বলতে তাই।

৪

সেথা বসনভূষণ কমতি হলে
স্বামীকে স্ত্রী বকে,
আর নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে,
'বাসি' হলেই টকে।
আর আমোদ হলে হাসে তারা
দন্ত করে বাহির
তোমরা ভাবচ কচ্ছি আমি
মিথ্যে কথা জাহির
কিন্তু এ সব সত্যি, এ সব সত্যি,
এ সব সত্যি কথা ভাই,
তোমরাও যদি দেখতে, তা'লে
তোমরাও বলতে তাই।

৫

তবে কিনা দেশটা বিলেত,
এবং জাতটা বিলিতি :
কাজেই,—একটু সাহেবী রকম
তাদের রীতি নীতি।

আর ঐ করে শুধু সাদা হাতে
চুরি ডাকাতি সে :
আর স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে
বিশুদ্ধ ইংলিশে :—
এই তফাৎ এই তফাৎ,
এই তফাৎ মাত্র, ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের
বিশেষ তফাৎ নাই।

['হাসির গান'—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ]

নন্দলাল

১

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা ক'রেই হোক রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল 'আ-হা-হা কর কি, কর কি নন্দলাল ?'
নন্দ বলিল 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?'
তখন সকলে বলিল— 'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !'

২

নন্দর ভাই কলেরায় মরে দেখিবে তাহারে কেবা।
সকলে বলিল 'যাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা।'
নন্দ বলিল 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারি দিক ;
তখন সকলে বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে, ঠিক !

৩

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন ;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ !
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল ;
তখন সকলে বলিল—বাহবা, বাহবা, নন্দলাল !

৪

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ,
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল 'আ-হা-হা ! কর কি, কর কি, ছাড় না ছাই,
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই ?
বল ক'বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বল করিব তাহা',
তখন সকলে বলিল—বাহবা, বাহবা, বাহবা, বাহা !

৫

নন্দ বাড়ীর হত না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি ,
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উল্টায় গাড়ীখানি ,
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন্‌' হয় ,
হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ী-চাপা পড়া ভয় ,
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল ।
সকলে বলিল—ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল ।

['হাসির গান'—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ]

আমি যদি পিঠে তোর ঐ

আমি যদি পিঠে তোর ঐ
লাথি একটা মারিই রাগে ;
—তোর তো আস্পর্দ্ধা বড়
পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে ?
আমার পায়ে লাগল সেটা
কিছুই বুঝি নয়কো বেটা ?
নিজের জ্বালায় নিজে মরিস,
নিজের কথাই ভাবিস্ আগে।
লাথি যদি না খাবি ত
জন্মেছিলি কিসের জন্যে ?
আমি যদি না মারি তো
মেরে সেটা যাবে অন্যে !
আমার লাথি খেয়ে কাঁদা,—
ন্যাকামি নয় ? শুয়োর গাধা !
—দেখছি যে তোর পিঠের চামড়া
ভরে গেছে জুতোর দাগে !
আমার সেটা অনুগ্রহ—
যদি লাথি মেরেই থাকি ;—
লাথি যদি না মার্তাম ত
না মেরেও পার্তাম নাকি ?
লাথি খেয়ে ওরে চাষা !
বরং রে তোর উচিত হাসা,—
যে তোর কথাও মাঝে মাঝে,
তবু আমার মনে জাগে।
বরং উচিত আগে আমার
পায়ে হাত তোর বুলিয়ে দেওয়া !
পরে ধীরে ধীরে নিজের
পিঠের দাগটা মুছে নেওয়া !

—পরে বলা ভক্তি ভরে—
"প্রভু অনুগ্রহ করে
পৃষ্ঠে ত মেরেছ—লাথি
মারো দেখি পুরোভাগে !
দেখি সেটা কেমন লাগে ।"

('হাসির গান'—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)

জাতীয় সঙ্গীত

১

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম ধূলি চেয়ে ,
চৌদ্দ পুরুষ আছি পরের জুতা খেয়ে ;
তথাপি ধাই মানের লাগি, ধরনীমাঝে ভিক্ষা মাগি
নিজ মহিমা দেশবিদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে !
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে ।

২

লজ্জা নাই ! 'আর্য' বলি চেঁচাই হাসিমুখে !
মুখে বলি তা, বাজে যে কথা বজ্র সম বুকে ,
ছিলাম বা কি হয়েছি একি ! সে কথা নাহি ভাবিয়া দেখি
নিজের দোষ দেখালে কেহ মারিতে যাই ধেয়ে !
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে ।

৩

কেহই এত মূর্খ নয় ; সবাই বোঝে জেনো,
হাজারই 'গীতা' পড়, তুমিও পয়সা বেশ চেনো ,
এ সব তবে কেন রে ভাই, তুমিও যাহা আমিও তাই-
স্বার্থময় জীব ! —কাজ কি মিছে চিৎকারে এ ?
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে ।

৪

ব্যবসা কর, চাকরি কর, নাহিক বাধা কোন ;
ঘরের কোণে ক্ষুদ্র মনে রৌপ্যগুলি গোণ ;
চারটি ক'রে খাও ও পর, স্ত্রীর দুখানা গহনা কর,
আর্যকুল বৃদ্ধি কর, ও পার কর মেয়ে।
বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলি চেয়ে।

['মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থ—১৯০২ খৃষ্টাব্দ]

নেতা

১

কথায় কথায় যাচ্ছে শুধু কথা বেড়ে,
গানে গানে ছেয়ে পড়ল দেশটা ;
কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ক নেড়ে চেড়ে
কি রকম যে দাঁড়ায় এখন শেষটা।
সভায় সভায়, মাঠে হাটে, গোলেমালে,
বক্তৃতাতে আকাশ পাতাল ফাটছে ;
যাদের সময় কাট্‌ত না ক কোন কালে,
তাদের এখন খাসা সময় কাট্‌ছে।
নেতায় নেতায় ক্রমেই দেশটা ভ'রে গেল,
সবাই নেতা সবাই উপদেষ্টা,—
চেঁচিয়ে ত সবার গলা ধ'রে গেল,
অন্য কিছুর দেখাও যায় না চেষ্টা।
লিখে লিখে সম্পাদকে কবিগণে
ভীষণ তেজে অনুপ্রাসে কাঁদছে ;
সবাই বলছে কি কাজ এখন 'পিটিশনে'[১]
সবাই কিন্তু পায়ে ধ'রেই সাধ্‌ছে।

২

খাটো লম্বা কবিতায় ও উপদেশে
সবাই বোঝায়, সবাই খাসা বুঝছে ,—
সবাই কিন্তু সভা হ'তে ঘরে এসে,
নিজের নিজের আহার নিদ্রাই খুঁজছে ।
নেতারা কেউ হ্যাট কোট গায়ে এঁটে,
সাহেবগুলোয় তেজে গালি পাড়ছে .
রেশমি চাদর উড়িয়ে দিয়ে, তেড়ি কেটে,
কেউ বা জোরে 'মা মা' ধ্বনি ছাড়ছে .
কেউ বা হাতের কব্জায় সখের রাখী বেঁধে,
(বায়টি তাতে একটি পয়সা মাত্র)
আর্য ভ্রাতার প্রতি বলছে কেঁদে কেঁদে—
"বটে, তুমি নহ ঘৃণার পাত্র ।"
কেউ বা বলে "দেশের জন্য —যত চাহ,
ইংরাজদিগে সুখে গালি পাড়ব .
কিন্তু স্বপ্নেও কভু তুমি ভেবো না ও
দেশের জন্য নিজের কিছু ছাড়ব ।"
কেউ বা খাসা নিজের থলে ভ'রে নিল
দেশের নামে দিয়ে সবায় ধাপ্পা ।
কেউ বা খাসা দু পয়সা বেশ ক'রে নিল
বিদেশীয়ে দিয়ে 'দেশী' ছাপ্পা ।
কেউ বা বলে "শোন সবাই এই বাণী—
রাখব না আর বিজাতীয় চিহ্ন .
অর্থাৎ কিনা হুইস্কি এবং সোডা পানি
ম্যানিলা ও ভিনোলিয়া ভিন্ন ।"
শুনে সবাই এ ঘোর কঠোর দৃঢ় পণে
বলে "এ'রাই সাধু, এ'রাই শ্লাঘ্য ।"
এতেও যদি বাঁচেন এ'রা—ভাবে মনে—
সেটা দেশের বিশেষ রকম ভাগ্য ।

৩

আমি বলি রোসো রোসো, গ্যাছে বোঝা ,
ওহে নেতা ! ওহে স্বদেশভক্ত !

স্বদেশহিতৈষণা নয় ক এত সোজা,
সেটা একটু ইহার চেয়ে শক্ত।
'মা মা' ব'লে চেঁচিয়ে ওঠা বারে বারে,
'ভাই ভাই' ব'লে বাঁকা সুরে বায়না ;
তাতে তোমার ভাষার খ্যাতি হ'তে পারে ;
স্বদেশভক্তির কাছেও ঘেঁষে যায় না।
যেমনি তোমার হাতে একটা সূতা বেঁধে,
হৃদয়ের বিষ হয় না তোমার মিষ্ট
তেমনি হয় না বাউল সুরে গলা সেধে,
স্বদেশভক্তি কস্মিন কালেও সৃষ্ট।
কার্পেটমোড়া ত্রিতলকক্ষে ব'সে থেকে
'মা মা' ব'লে নাকি সুরে কান্না
নিয়ে যাও সে ভক্তি বক্ষে চেপে রেখে,
মা সে সৌখীন মাতৃভক্তি চায় না।
—সুসন্তান কেউ দূরে ব'সে দেখে না সে
মায়ের কেমন ভুবনমোহন কান্তি !
তাহার কেবল মায়ের ব্যথাই মনে আসে,
মায়ের স্নেহধারা অবিশ্রান্তি।
পিকধ্বনি, শীতল ছায়া, 'জোছনা'টি,
তাতে কাহার নাই ক অনুরক্তি ?
হ'তে পারে তাতে কাব্য পরিপাটি,
কিন্তু তাতে দেখায় নাক ভক্তি ;
বিভোর হয়ে রাধাকৃষ্ণের ছবি নিয়ে,
লম্পটেরও দেখা—নয় ক শক্ত ;
তাহার জন্য যে জন সংসার ছেড়ে দিয়ে
কৌপীন নিতে পারে, সেই ভক্ত।

৪

নিজের খাবার গুছিয়ে নিয়ে খেয়ে দেয়ে
ক্ষেপাও নিয়ে স্কুলের ক'টি ছাত্র ;
পরের ছেলের ভবিষ্যতের মাথা খেয়ে
আপনি গিয়ে বোসো ঝেড়ে গাত্র।

খেতে না পায় পরের ছেলেই পাবে না ক,
মরে যদি পরের ছেলেই মরবে ;
নিজের সিন্দুক বন্ধ ক'রে ব'সে থাক,
(বটে, তখন তুমি তা কি করবে ?)
নামটি নিজের জাহির ক'রে দিয়েছ ত,
পেয়েছ যা ধর নিজের মস্তে ;
তুমি তাদের করতালি নিয়েছ ত,
আশিস্ তাদের দিয়ে যাও দু হস্তে।
—প্রবেশ করবে সংসারে সে পরে যবে,
শাপ্‌বে তোমায় সে যৎপরোনাস্তি ;
পাপের শাস্তি থাকে, তোমায় পেতে হবে,
ইহার জন্য পেতেই হবে শাস্তি।

৫

হা রে মূঢ়—ইংরাজদিগে গালি দিয়ে
দেশের প্রীতি দেখায় না ক ভক্তি
দেশভক্তি নয় ক ছেলেখেলাটি এ
সেখানে চাই প্রাণ দেবার শক্তি।
দেশের জন্য দুঃখ নিতে হবে চেয়ে,
দেশের জন্য দিতে হবে রক্ত ;
সেটা হয় না টানা পাখার হাওয়া খেয়ে,
সেটা একটু বিশেষ রকম শক্ত।
পার যদি এস রে ভাই—লাগ তবে,
ধর ব্রত, অঙ্গে মাখ ভস্ম।
দেশের জন্য গ্রামে গ্রামে ফির সবে,
ভায়ের সেবায় দাও রে সর্বস্ব।
মায়ের সেবা করতে সত্য চাহ যদি,
ভায়ের সেবায় নিবেশ কর চিত্ত ;
নিজের ভাবনা ছেড়ে কর নিরবধি
ভায়ের ভাবনা তোমার ভাবনা নিত্য।
টিয়ার মতো দাঁড়ে বসে ছোলা খেয়ে
রাধাকৃষ্ণ বল্লেই হয় না ধর্ম ;

পরের জন্য ভাবতে হবে জগতে এ
পরের জন্য করতে হবে কর্ম।
চাদর উড়িয়ে মাথায় বাঁকা সিঁথীকেটে,
তক্কার উপর হয়ে উচ্চ ব্যক্তি,
'মা মা' শব্দে আকাশ যায়ও যদি ফেটে,
দেখানো তায় হয় না মাতৃভক্তি।
ফিটন্ চড়ে টাউন হলে নেমে এসে,
গেয়ে গান—সেও একটু বেশী মাত্রায়
স্বদেশহিতৈষণাটাকে পরিশেষে
করে তুম্নে ভুলোর দলের যাত্রায়।

৬

নামের কাঙ্গাল হায় রে! দ্বারে দ্বারে ঘুরি
বেড়াচ্ছিলে ভালো!—ওহে মিত্র!
পরিশেষে নামের জন্য জুয়াচুরি!
মায়ের নামটাও কর্চ্ছ অপবিত্র!!!

['আলেখ্য' কাব্যগ্রন্থ : চতুর্দশ চিত্র — ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ]

টীকা—

১ "সবাই ভাবছে কি কাজ এখন 'পিটিশনে'"—আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন ও রাজনীতি চর্চা দীর্ঘকাল শুধু ইংরেজ-সরকারের কাছে 'পিটিশন' বা আবেদন-নিবেদন-মূলক কাজ-কর্মের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬৩—১৯৪৯]

স্বদেশ সঙ্গীত

কুহু আমার, কেকা আমার, কাকলি আমার—আমার দেশ,—
দেখনা কেমন মলয় পবন, ভাবের স্বপন হান্‌চে বেশ!
দেখনা গো ঐ চাঁদের কিরণ—নাইক তাতে ময়লা লেশ,
সপ্ত কোটি সন্তান তাই—বলে তোরে আমার দেশ।

কোরাস্—

কিসের ভাবনা কিসের চিন্তা কিসের জ্বালা কিসের ক্লেশ ?
সপ্তকোটি জঞ্জাল যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ !

উঠিল যেখানে মহা-ম্যালেরিয়া কাঁপায়ে বুকের হাড় ক'খান্,
পেট জোড়া পিলে জোয়ান-যুবার—ধুক্ ধুক্ ধুক্ করিছে প্রাণ,
শিক্ষিত—যাহার উপাধি ছাইল—এ-মুড়ো হইতে ও-মুড়ো শেষ,
চাকুরী তরে সে ফেরে দ্বারে দ্বারে, তুই বটেই তো তাদের দেশ

কোরাস ... ...

একদা যাহার বচন-বীরেরা বন্যা আনিল লেক্‌চারে,
একদা যাহার সংস্কারকে সংহারিল এই দেশটারে,
সন্তান যার হুইস্কি ধরিল, পকেটে চাঁদির Cigar Case,
তুই বটেই তো তাদের জননী—বটেই তো তুই তাদের দেশ !

কোরাস্ ... ...

Curl দুলিল দু-গালে যাদের, - রমনী-সুলভ, মন্দ কি !
চরণে পাম্‌সু রেশমি ওড়না—ভিটেটায় রেখে বন্দকী ;
পত্নীরে যারা প্রিয়তমা বলে—বাপে দিয়ে তার ভিখারী বেশ,
তুই বটেই তো তাদের জননী—বটেই তো তুই তাদের দেশ !

কোরাস্ ... ...

একদা যাহার পল্লী-পতিরা বিলাস খুঁজিল কলিকাতায়
শুকালো সরসী ছাইল বন পল্লী-লক্ষ্মী নিল বিদায় ;
বিদ্যালয়েতে ঝুলিল বাদুড়, ভূমে সে শুইল অবশেষ,
তুই বটেই তো তাদের জননী—বটেই তো তুই তাদের দেশ !

কোরাস্ ... ...

পড়িল যেখানে বিধবার শ্বাস—ভাই দেবরের ব্যবহারে,
কাঁদি হাতে ধরি অনাথ শিশু ফেরে অভাগিনী দ্বারে দ্বারে,
যাচে সে মৃত্যু দিবস রজনী, বলে—কৃপা করি লহ দীনেশ ;
তুই মা হলে তাদের জননী, আর কে হবে মা তাদের দেশ !

কোরাস্ ... ...

সবাই যেখানে কহে নীতি-কথা, নিজেরা পালে না একটা কেউ,
সলিল-শূন্য শুষ্ক সিন্ধু—শব্দে কেবলি উঠিছে ঢেউ,
সকল বিষয়ে সবাই দক্ষ, কে কার শোনে বা উপদেশ।
তুই তো বটেই তাদের জননী—তুই বটেই তো তাদের দেশ!

কোরাস্ ... ...

উঠিল যেখানে ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বে উকীল-কণ্ঠে law-এর তান,
বাস্তু ভিটায় চরিল ঘুঘু, লক্ষপতি ভানিল ধান।
ভায়ে দলিয়ে বিজয়ী ভ্রাতার হাসিতে উথলি উঠিল face,
না থাকে যদি তাদের রক্ত এ শিরায় তো কি disgrace!

কোরাস্ ... ...

যদিও মা তোর শাস্ত্র আলোকে ঘিরে আছে আজ আচার ঘোর,
তাই নিয়ে ঐ টিকিধারী ক'টা কোরচে বটে বেজায় সোর,
আমরা মা তায় দিব রসাতল, আমরা মানুষ নহি গবেশ,
বিলাস আমার, বাসন আমার, বচন আমার, আমার দেশ।

কোরাস্—

কিসের ভাবনা, কিসের চিন্তা, কিসের জ্বালা, কিসের ক্লেশ?
সপ্ত কোটি জঞ্জাল যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ!

('উড়ো খৈ' কাব্যগ্রন্থ—১৩৪১ বঙ্গাব্দ।)

স্বদেশ-ভক্তি

(সংক্ষিপ্তসার)

আমার কথায় রক্ষা হয় তো হোক্ দেশটা রক্ষা,
অন্যে যদি করে সেটা তো একখুনি পাক অক্কা।

আমার খাতে নামটা নাই এমন কোন কাজই
অন্যে যদি করতে চায়, সে ব্যাটা ঘোর পাজী।

ভারত উদ্ধার আমার দ্বারা হয় যদি তো হোক্,
তা না তো দেশ চুলোয় যাক্—নাইকো আমার শোক।

আমায় ডিঙিয়ে অন্যে করবে সইতে হবে নাকি ?
জাহান্নামে যাক্ সে দেশ, কিছু না কেন রাখি।

এইটে মোদের আসল কথা স্বভাবের সেরা,
বিদ্যাবুদ্ধির জোরে সেটা ঢেকে-ঢুকে ফেরা

('উড়ো খৈ' কাব্যগ্রন্থ—১৩৪১ বঙ্গাব্দ)

দেশের পাপ

বরাবরই আসছি শুনে চাকুরে গুলোই দেশের পাপ :—
লেখক বক্তা সম্পাদকে দিচ্ছে তাদের অভিশাপ।
সবাই এবে হবে চাষা, তাড়ির দোকান খুলবে খাসা,
কেউ বা ধোপা হয়ে ধোয়া কাপড়গুলো করবে সাফ্।

কাজুর নাকি বড়ই দুঃখু কেরাণীরা দেশের আপদ,
ওঁরাই শুধু মানুষ কজন—তারাই নাকি খাঁটি শ্বাপদ।
মোট সে সবাই গেলে হাটে কিম্বা যদি কাঠটা কাটে,
দেশটা সটান স্বাধীন হবে, ঘুচতো তাদের মনস্তাপ।

সেইতো নাকি 'মরণ কামড়' এম. এ. মাথায় নিয়ে ঝুড়ি,
গামছা পেতে মুড়ি বেচে দ্বারে দ্বারে বেচে চুড়ি,
পুজো-বাড়ি বাজিয়ে ঢাক, বি. এ. লাগাবে তাক্!
আপনাটা উঠবে গড়ে দেশের ভাগ্যে ধরবে ঝাঁপ।

সবাই যেন মনিব হবে রবে না কেউ পরাধীন,
চাকরী ছেড়ে হওয়াটা চাই একায় অন্নবস্ত্রহীন।
দেখবে তাতে দুখে মজা, স্বাধীনতার উড়বে ধ্বজা,
খালি পেটে হাল্কা হয়ে উচ্চ হবে মেরে লাফ্!

শিখে এলো বিদেশ থেকে—বা-কথা, মাছ, চাষ, সাবান,
দেখ না কেমন ঘরের মেয়ে—বসে তারা ভানছে ধান!

ফুলের মালা, সম্বর্দ্ধনা—তা হলেই বেদুলো জানা,—
(এখন) উড়ে খাও, না হয় ওড়াও রেখে যা গিয়েছে বাপ !

ব্যবসা করবে—পুঁজি যাদের অদ্য ভক্ষ ধনুর্গুণ !
উৎসাহদাতারা খালাস বচন ঝেড়ে সুনিপুণ !
প্রবন্ধে আর বক্তৃতাতে লিখে দিয়ে কলার পাতে
করতালি হাতিয়ে দেখি বেমালুম সব হ'তে গাপ্ :
(কারুর) সুখশয্যায় সময় কাটে আহার করে মটন চাপ্ !

বরাবরই আসচি শুনে চাকরেগুলোই দেশের পাপ !

('উড়ো খৈ' কাব্যগ্রন্থ—১৩৪১ বঙ্গাব্দ)

রজনীকান্ত সেন [১৮৬৫–১৯১০]

জাতীয় উন্নতি

বসন্ত বাহার—জলদ একতালা

হয় নি' কি ধারণা, বুঝিতে পার না
ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে ।
যেহেতু, যেগুলি বুঝিত না আগে
এখন সেগুলো বুঝ্‌ছে ।

কেন না, আমাদের বেড়ে মাথা সাফ্,
'গ্যানো' খুলে পড়াচ্ছি 'বিদ্যুৎ' 'আলো' 'তাপ',
মাপ্চি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ,
(আর) মনের অন্ধকার ঘুচ্‌ছে ।

যেহেতু বুঝেছি বিস্কুট কেমন মধুর,
কুক্কুট-অস্থি কেমন স্বাদু ,
(আর) ক্রমে মদিরায় যার মতি যায়,
কেমন সে হয় সাধু ;

আর যেহেতু আমাদের মনে মুখে দুই,
(যাকে) বলতে হবে 'আপনি', তাকে বলি 'তুই',

চাকরির দেবে কমলে চরণতলে থুই,
আর ঘৃণা করি গরিব দুখে।

যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি,
সদা জামা রাখি শরীরে,
(আর) 'শ্যান্টিপো' বলি 'শান্তিপুর'কে,
'হ্যারি' বলে ডাকি 'হরি'রে
যেহেতু আমরা শ্রেষ্ঠ একান্ত,
কাঁটা-দণ্ড বাহুলতা বেশ-বেশান্ত,
(মোদের) অস্থিমজ্জাগত সাহেবী, দৃষ্টান্ত
দেখ না অমুক বাঁড়ুয্যে।

(কারণ) ধর্মহীনতাটা ধর্ম আমাদের,
কোন ধর্মে নাই আস্থা,
কি হবে ও ছাই-ভস্মগুলো ভেবে ;
মস্তিষ্কটা নয় সস্তা ;
অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ ধ'রে,
বাইরের আঁখি দুটো ফুটোচ্ছি বেশ ক'রে ;
মনশ্চক্ষু অন্ধ, তার খবর কে করে ?
সে বেচারী আঁধারে ঘুরছে।

(আর) যে হেতু আমরা নেশা করি,
কিন্তু প্রাইভেট্ ক্যারেক্টার দেখ না,
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো,
আর কিছু মনে রেখো না,
বাপকে করি ঘৃণা, মাকে দেই না অন্ন,
বাইরের আবরণটা রাখি পরিচ্ছন্ন,
কোট পেন্টালুনে ঢাকি কৃষ্ণবর্ণ
যেন দাঁড়কাক ময়ূর-পুচ্ছে।

(আর) যেহেতু আমরা পত্নীআজ্ঞাকারী
প্রাণপণে যোগাই গহনা ;
আর বাপ্‌রে ! তার রুষ্ট আঁখি-তাপে,
শুকায় প্রেম-নদীর মোহনা।

(সে যে) মাকে বলে 'বেটী', হেসে দেই উড়িয়ে,
(তার) পিতৃবংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে
(মোদের) চিনিয়ে দিতে হয় 'এ মাসী খুড়ী এ',
ভুলে প্রণাম করি না পূজো।

(কারণ) খবরের কাগজ, সাইন বোর্ড, আর
বিজ্ঞাপণের বেজায় ছড়াছড়ি,
(তাতে) দেখবে যথাক্রমে 'পঞ্চানন্দ', আর
'তিনকড়ি কবিরেজ', 'প্রেম বড়ি',
আর যেহেতু আমাদের সাহস অতুল,
সাহেব দেখলে, হয় পিতৃনামটা ভুল,
(দেশটা) সংক্রান্তি-পুরুষের হাত, পা, মাথা ছেড়ে
ধ'রেছিল বুঝি " — " !

['বাণী' কাব্যগ্রন্থ—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ]

বিচার

মিশ্র গৌরী—জলদ একতালা

কেমন বিচার কচ্ছে গোরা।
হাঁটতে শিখিয়ে লাঠির গুঁতোয়
কচ্ছে পা ভেঙ্গে খোঁড়া।
বলতে শিখিয়ে, পাকড়ে, দিচ্ছে
গলায় গামছা-মোড়া ;
সুখ দিয়ে ভাই ; হাসির বেলায়
মাচ্ছে রে পিঠে কোড়া !
দিল্লীর লাড্ডু খাইয়ে, সামনে
ধরেছে রে কচুপোড়া ,
গরীব বানিয়ে দূর হতে ভাই
দেখায় টাকার তোড়া !

খাইয়ে দাইয়ে নাদুস নুদুস
ক'রে বুকে মারে ছোরা ;
চক্ষু ফুটিয়ে আঁধারে বসায়,
এমনি অভাগা মোরা !
কাজে বলিছে, ন্যায় বিচারের
পূরো অবতার ওরা ;
তোমরা মোটেই মান না, আমি তো
বলছি রে আগাগোড়া ।

('বাণী' কাব্যগ্রন্থ—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ

উঠে পড়ে লাগ

মিশ্র গৌরী—অলপ একতালা

তোরা যা কিছু একটা হ' ।
Ray কি Sinha, কি Doss, কি Shanne,
কি Dutt, কি Dwarkin, Shaw,
সাফ ক'রে মাথা whisky চা-পানে
ধুয়ে কালো অঙ্গ glycerine সাবানে,
ছুটে যা বিলেত, Italy, Japan-এ
(and) inspire your countrymen with awe !
গুপ্ত চেষ্টায় যদি এইটে মনে হয়—
যে বাবার iron-safe-টা তত brittle নয়,
তবে, submit to your doom, take to
hatchet or loom,
(কিম্বা) ঐ অজাতির পাঠ 'law' !
আর, যদিই না থাকে legal acumen,
Steal from your father's cash-box Rs. 10.
একটু pulsatilla-nux-সম্বলিত box
(কিনে) কর্ একটা হ য ব র ল ।

আর 'Dilution' ব্যাপারটা না হ'লে পছন্দ,
স্থানান্তরে গিয়ে করগে যা' আনন্দ,
এয়ার বন্ধু নিয়ে, ব'সে যা জাঁকিয়ে
(আর) ক'সে রসে টান raw.
দেখ্ না, কুমারিকা হতে সুদূর হিমাদ্রি,
ছেয়ে ফেল্লে দেশ লক্ষ লক্ষ পাদ্রি,
আর কিছু না হয়, গেয়ে যীশুর জয়
(একটা) মেম বিয়ের যো ক'রে ল' ।
আরো এক উপায়ে হ'তে পারে যশ,
একটা নতুন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস,'
বিলাতি যা' কিছু সবি nonsense, bosh,
যা রে লিখে বা lecture-এ ক' !
কান্ত বলে এবার জাগ্ তোরা জাগ্,
ভারত-মা'টার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্,
ব'সে বিছানাতে, ধরলে গিঁঠে বাত,
(দেখ্ না) হ'লি হাঁটু ভাঙা 'দ' ।

(কল্যাণী' কাব্যগ্রন্থ —১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ)

কপাল দোষ

খাম্বাজ — একতালা

দুত্তোর, বড় সেক্ সেক্ লাগে,
দেশের কপালে মার্ দুশো ঝাঁটা,
কবে আসবেন কাল্কি, বিলম্বে আর ফল কি ।
দেখা দিলেই এখন ঘুচে যায় সব লেঠা ।

বিলেত থেকে এল রসটা কি দারুণ !
বীর, কি বীভৎস, হাস্য কি করুণ,
সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে 'বরুণ' ,
ডেকে পঞ্চানন এয়ারকিতে জ্যাঠা ।

পড়ে A B C D, খায় বার্ডস্-আই,
মুখে বলে, "মাইরি বাবু ! মরে যাই।"
মায়ের উপর চটা, বউকে বলে "ডাই",
টেড়ির পাশ্‌না মাথে, চোখে চশমা আঁটা।

মায়ের স্বত্ব কেবল গুদোম-ঝাড়া পাবেন,
Old idiot বাপ্‌টা ব'সে ব'সে খাবেন ;
গিন্নী ; হাঁ-হাঁ, ব'সে মাসোহারা লবেন,
কোমল করে কত সয় কি বাট্‌না বাটা ?

কলা-মূলো খেকো মুনিগুলো ভ্রান্ত,
ক'রে গেছেন যত fallacious সিদ্ধান্ত,
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ নিতান্ত,
প্রকাণ্ড foolery পৌত্তলিকতাটা।

ছত্রিশ জেতের সঙ্গে আমোদ ক'রে খাওয়া
(আর) সচকিত ভাবে চতুর্দিকে চাওয়া
স্ফূর্ত্তিতে ম'শায় ডাক-বাংলাতে যাওয়া,
আর বেমালুম চম্পট। বামুনটা কি ঠ্যাটা !

সভামাঝে উদ্ধার করেন হিন্দু nation,
ইঙ্গ-বঙ্গ-মিশ্র অদ্ভুৎ conversation,
অঙ্গ শৌচে জল নেওয়া botheration,
গুরুদেবটা ঘুঁচো, পুরুত পাজি বেটা।

উঠিয়ে দেওয়া উচিত বিবাহ-পদ্ধতি,
সন্ধ্যা-গায়ত্রীর হয় না সদর্থ সঙ্গতি,
বক্তৃতা হাততালি, জাতীয় উন্নতি,
বুঝ্‌লি না রে কান্ত, কপালের দোষ সেটা।

['কল্যাণী' কাব্যগ্রন্থ—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ]

বুয়ার যুদ্ধ

মিশ্র ইমন—তেওরা

[দক্ষিণ আফ্রিকার বসবাসকারী ওলন্দাজরা বুয়ার নামে পরিচিত। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বুয়াররা ইংরেজদের সাহায্য চায়। ইংরেজ সরকার তাদের রক্ষা করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বাধীনতাও হরণ করে। চার বছর পরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদে রসঙ্গে বুয়ারদের প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত ক'রে বুয়াররা নিজেদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু দ্বিতীয় বুয়ার যুদ্ধে (১৮৯৯-১৯০২) আবার তারা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভ করে।

এই গানটিতে দ্বিতীয় বুয়ার যুদ্ধের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রজনীকান্ত অলস ভীত স্বদেশবাসীর শৌর্যহীনতাকে ব্যঙ্গ করেছেন।]

বুয়ারে ইংরেজে যুদ্ধ বেধে গেছে
নিত্য আসিতেছে খবর তার;
আজকে এরা ওরে গুঁতোলে বেড়ে ক'রে
কালকে ওরা ধরে জবর মার!

ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোলমেলে!
আমরা করি হেথা যুদ্ধ ঘোলচেলে;
তর্কে হেরে গেলে মাথায় ঘোল ঢেলে
ধরিয়ে চৈতন করি দেশের বা'র।

কামান ছোঁড়ে তারা, সঙ্গীনে মারে খোঁচা
প্রাণটা ধাঁ করে বেরিয়ে যায় সোজা;
কাগজে পড়ি যবে এ সব বিবরণ,
ধড়াস্ ক'রে ওঠে প্রাণটা কি কারণ!
চমকে উঠি রেতে দেখিয়ে কুস্বপন,
ঘুমটি ভেঙে, ভয়ে রাত কাবার!
আমরা কোথা আছি, লড়াই কোথা হয়;

শুধু এ প্রাণে কেন সদাই ভয় ভয় !
খবরগুলো যেন, কামান গোলা নিয়ে
কানের কাছে এসে যায় গো ফেলে দিয়ে ,
নয়ন মুদে দেখি, শোণিত নদী এঁকে !
কে যেন বলে যায়, 'খবরদার !'

সোনার খনি দিয়ে বল কি হবে বাবা,
থাকলে ধড়ে প্রাণ অনেকখানি পাবা,
কেন এ কাটাকাটি, পরাণ বধাবধি ?
কেন এ খোঁচাখুঁচি, বক্ষে দমাদমি ?
অনেক দেশ আছে প্রাণটা যদি বাঁচে,
খুঁচিয়ে কেন কর সেটাকে বার ?

শ্বশুর, শালী, শালা, শাশুড়ী, মাগ, ছেলে
বন্ধু মিলে যাবে প্রাণটা বেঁচে গেলে ;
পালিয়ে এস চ'লে ও সব দেশ ফেলে,
দুঃখ যাবে ক'ছিলিম তামাক খেলে,
চেহারা যাবে ফিরে, বেরোবে কার্নিশরে
ভুঁড়িটা যাবে বেড়ে চমৎকার !

('কমলাণী' কাব্যগ্রন্থ—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ)

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৬৮—১৯২৯]

গান

গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা মা

শ্যামা বিষয়ক

[১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে যখন সারা দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল গানটি সেই সময়ে লেখা। ললিতকুমার গান বা কবিতা বিশেষ লেখেন নি। এটিও তাঁর কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত। এখানে 'গোরাচাঁদ' ইংরেজ এবং 'শ্যামা মা' বঙ্গজননী।]

ওহে গৌর গৌর হে, তোমার মুখে পড়ুক ছাই।
ইচ্ছে করে যাই হে মরে লয়ে তোমার নামের বালাই॥
তোমার মুখে জ্ঞানের আলো,
যে পায় সে না বাসে ভালো,
আপন জনে খোলা মনে
হয়ে যায় ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই॥

ভেদ বুদ্ধি ভেবে সার
পাকা চাল চাললে এবার
সোনার বাংলা চুরমার
করলে তুমি দুটা দু'ঠাঁই॥

শেল দিয়েছ মোদের বুকে,
বল হে গৌর আর কি সুখে
সমানভাবে ভজবো তোকে
তোমার প্রেম নীতিতে ফাই ফাই॥

তোমার মুলুকের আমদানী
বসন ভূষণ চুড়ী চিরুণী,
ছড়ি জুতা চোখরাঙানী,
প্রেমের গৌর, আর না চাই॥

চুরুট সাবান পাকা লবণ,
দোবরা চিনি লোহার বাসন,
সাগর জলে দিই বিসর্জন,
তোমার ভজনে ধর্ম নাই ॥

কালাপানির অতল জলে
চায়ের বাক্স দিল ফেলে
স্বদেশ ব্রতে প্রাণটা ঢেলে
মার্কিণ তুল্য কীর্তি নাই ॥

এখন গোরাচাঁদকে ছেড়ে দিয়ে
ভজবো মোদের শ্যামা মায়ে,
কালী কালী নাম জপিয়ে
মনের কালি মুছবো ভাই ॥

ঘুচেছে মোহ এত দিনে,
সুজন কুজন লই হে চিনে,
গতি নাই রে শ্যামা বিনে,
ঘরের ছেলে ঘরে যাই ॥

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে
সাধের শ্যামা মাকে ঘিরে
আবেগভরা চাপা সুরে
স্বদেশ প্রেমের গুণ গাই ॥

লাঞ্ছনার আর বাকি নাই,
পর হয়েছে আপন ভাই,
সবাই মিলে কানমলা খাই—
মিটেছে মোদের বিলাতী বাই ॥

('ভারতী' পত্রিকা—কলকাতা, পৌষ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ)

মুকুন্দ দাস [১৮৭৮—১৯৩৪]

গান

[এখানে মুকুন্দ দাসের চারটি গান সংকলিত হল ; চতুর্থ গানটি—"বাবু বুঝবে কি আর মলে"—রচনার জন্যে মুকুন্দ দাসকে তিন বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।]

এক

তোরা পাশ করে হোস মরা।
থাকে না শৌর্য-বীর্য, শুধু মুখের বোলেই
জিনিস ধরা ॥
পড়ে ভাই এ. বি. সি. ডি সাহেব হবার সাধটি যদি
তবে কেন ড্যাম্ ব্লাডি শুনেও তাদের ছাড়া,
তারা কি ছাড়ে রে তোরে বল্লে এমন ধারা,
তাতেই বলি শিখলি ভালো
কেবল তাদের পোষাক পরা।

দুই

ঘোর কলিকাল যা দেখি সব উল্টা তোর।
নইলে মা করবেন দাসীপনা,
গিন্নি উঠছেন মাথার উপর ॥
হয়েছে দুনিয়ার কি দোষ
সবে খোঁজে পরের দোষ।
দেখে আমার পাচ্ছে হাসি,
বাবুদের কি জ্ঞানের জোর।
সদা অসতের আদর,
সৎ-এর যে হচ্ছে অনাদর।
বেদ-কোরাণ ফক্কিকারি—
বাবুরা নভেল পড়ে প্রেমে ভোর ॥

যে জনে সদা খাচ্ছে মদ,
নেশা যার পরম সম্পদ
সে নয় দোষী তার উচ্চ পদ —
যে না খায় সে মদখোর ॥
দেখে শুনে ভবের ভাব—
সুবুদ্ধের পূরিল অভাব ।
এক ডাক্তার কাছে ভাব শিখিয়ে
ভাঙ্‌লো আমার ঘুমের ঘোর ॥

তিন

বাবুদের পায়ে নমস্কার—
দেখলেম ভাই ঘোর কলিতে এ জগতে
ভাল মন্দের নাই বিচার ॥
যার মা উপোসী ভগ্নী দাসী বাবুর বাড়িতে
সেই ছেলে হয় টিকপাদার বেশ্যা বাড়িতে ।
বাবু বিদ্যার নামে নব ডঙ্কা —
গুড্‌নাইট, গুড্‌মর্নিং সার ॥
কলিতে বৌ হয়েছে রং-এর বিবি* স্বামী মানে না—
শাশুড়ী হন ময়না মাগী স্বামী খানসামা ।
তারা ভাশুর-শ্বশুর কেয়ার করে না
বাপকে বলে "মাই-ডিয়ার" ॥
ছোট খাটো চুল ছাঁটা আর সিং তোলা টেরী
যুবক গরুর চোখে চশ্‌মা এই দুঃখে মরি ।
বাবুরা স্ফূর্তি করে বেড়ান ঘুরে**
যেন ময়লা টানা গাড়ির ষাঁড় ॥

চার

বাবু বুঝবে কি আর ম'লে ।
কাঁধে তোর সাদা ভূত চেপেছে,
একেবার দফা সারলে ॥

---

* পাঠান্তর : "বাবুর বৌ হয়েছে রঙের বিবি" ।
** " "বাবু শখে বেড়ান ঘুরি" ।

খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিস্‌ফাইড্‌ জীলের থালে,
তোমার মতো মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মেলে ?
পমেটম্‌ লাইক্‌ কারিল দেশী আতর ফেলে,
সাধে কি দেয় রে গালি, "ব্রুট, ননসেন্স, ফুলিস্‌" বলে !
ছিল ধান গোলাভরা
ইন্দুরে সব করলে সারা
চোখের ঐ চশমা-জোড়া দেখ্‌না বাবু খুলে !
কুল নিয়েছে, মান নিয়েছে, ধন নিয়েছে কলে,
ডু ইউ নো ডিপুটি বাবু নাউ হেড্‌ ফিরিঙ্গীর বুটের তলে ?
পাগলের কথা ধরো
এখনো সামলে চলো,
সাহেবী চালটি ছাড়ো
যদি সুখ-ইচ্ছা কপালে।
বন্দে মাতরম্‌ বাজাও ডঙ্কা
জাগুক ভাই সকলে।
দেখে মুকুন্দ ডুবে যাক রে ভাই
প্রেমময়ীর প্রেম সলিলে।

এই চারটি গান ড. জয়গুরু গোস্বামী প্রণীত 'চারণকবি মুকুন্দদাস' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।]

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)—[১৮৮১—১৯৬৮]

হিন্দু-মুসলমান মিলন

হিন্দু—তোমার মতো লুঙ্গী পরে
খুলে দিলাম কাছা।
মুসলমান—তোমার মতো শুরু করে
দিলাম দাড়ি চাঁচা।

কৌরব-কৌ—আমি হচ্ছি Common factor
উভয়েরেই ভিসে।
বিদূষক—এ মিলন কি মিলন দাদা
মন যদি না মিশে।

['বিদূষক'—সাপ্তাহিক পত্রিকা ;
১২ ফাল্গুন, ১০২৯ বঙ্গাব্দ]

হাইকোর্টে মালসী-কীর্তন

[যে রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে দাদাঠাকুর ব্রজবুলিতে এই অভিনব কীর্তনটি রচনা করেছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' গ্রন্থে তার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে ; এখানে সেটি উদ্ধৃত হল : "১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশনে মন্ত্রীদের মাইনে নামঞ্জুর ক'রে দিল। স্বরাজীরা বললেন, মন্ত্রী রাখবারই কোনো দরকার নেই। অন্যান্য দলের অনেক সদস্য স্বরাজীদের পক্ষ সমর্থন করায় অধিকাংশের ভোটে সরকার পক্ষের পরাজয় হল। তখন এক-একজন মন্ত্রী চৌষট্টি-হাজারী মনসবদার। মহা মুশকিল। যেমন প্রমাদ গণলেন বাংলা সরকার, তেমনি ফাঁপরে পড়লেন মন্ত্রী মহাপ্রভুরা। ভিতরে ভিতরে একটা চক্রান্ত ক'রে কিছুদিন পরে বাজেটের অতিরিক্ত অধিবেশন আহ্বান ক'রে সরকার পক্ষ থেকে আবার মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করিয়ে নেবার চেষ্টা চললো। যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত এই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা রুজু করলেন। তাঁর বক্তব্য—কাউন্সিলে অধিকাংশ সদস্য মিলে মন্ত্রীদের যে মাইনে বাতিল করেছেন, সে মাইনে সরকার আবার দাবি করেন কোন্ হিসাবে ? আর কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টই বা কোন্ নীতি অনুসারে সেই দাবি আবার সদস্যদের কাছে উপস্থিত করেন ? প্রেসিডেন্ট তখন কটন সাহেব। বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষের এজলাসে মামলা। আইনের নানান কূটতর্ক তুলে বিচারপতি মামলাটি ডিস্মিস্ করে দিলেন। দাদাঠাকুর তাঁর বিদূষকে এই সংবাদটি পদাবলীর ভাষায় রচনা করে মালসী—(এম্. এল্. সি.-র বাংলা রূপ) কীর্তন প্রকাশ করলেন।" পৃ—৪০]

বন্দে মালসী-লীলা অতীব সুমধুর
শ্রবণে উপজয়ে কোপ।
রজত-চাকিকা লালসী মালসীকো
লাজ শরম কৈল লোপ॥

এক নাহি দো নাহি চৌষট্টি হাজার
লাভকো লোভন বেশ।
ধন অনুরাগে সব প্রাণ-মন মাতল
না শুনে ধরম ভয় লেশ॥
কলঙ্কে ভরল দিঠি সোঙরি রজন মিঠি
পুলকে পুরিত সব অঙ্গ।
ঠুন ঠুন ঠুন রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
শুষ্ক রজত-রস অনুমানি উনমত্ত
বদনে না লয় আন নাম।
আকাশকুসুম মনে মনে ভাবরি
ধরম রহব কোন্ ঠাম॥
দেশবাসী-শোণিতে উদর পূরাওবি
ঘটাওবি তাকো বিনাশ।
রাজাপুরুখ সাথ কাহে কর মিতালি
পুছত গোবিন্দ দাস॥

একহি দিবসে স্বরাজিয়া সব মিলি
বাঁধি কৈলা নিধারণ।
সচিব জনকো মাহিনা না মিলব
মন্ত্রীকো নাহি প্রয়োজন॥
ভোটমে স্বরাজিয়া আন দল পরাজিল
পরকাশ হৈলা কুভাব।
দেশকো শাসক তবহুঁ সচিব রাখি
বেতনকো দিলা আশোয়াস॥
সুযোগ সমঝি পুন দরবার বৈঠায়ে
বেতন করিবেক স্থির।
যতীন্দ্রমোহন খ্যাতনামা স্বরাজিয়া
উপাজিল মমলা মন্দির॥
শ্রেষ্ঠ বিচারালয় সোই হাইকোর্টমে
বিচারিল জজ সি সি. ঘোষ।
যতীন্দ্রমোহন বিচারে পরাজিত
রাজপুরুখ-চিত খোস॥

কুমার শঙ্কর   কিরণশঙ্কর
    সর্বাজয়া আর কোনো বীর ।
দরবার সভাপতি   যৌহো সচিব নামে
    আরক কৈল হাজির ॥
সেই বিচারক   বৈঠল পুণরায়
    হাইকোর্ট-বিচার পাটে ।
কোনো দল রক্ষক   আইনকো লাঠিয়াল
    সুজন নজীর পাঠে ॥
দক্ষ বিচারপতি   আদেশ পরকাশি
    মিটাওল চিত্তকো সঙ্ক ।
সভাপতি কটনে   নোটিশ ভেজল
    আবহি সভা কর বন্ধ ॥
জজকো আদেশ   বজর সমান ভেল
    রাজপুরুষ হিয়া লাগি ।
মন্ত্রীকো হিতকামী   কাতরচিত সব
    মরমে বেদন বহু জাগি ॥
দরবার বন্ধকো   নোটিশ জানাওল
    বয়ানে বচন নাহি ফুরে ।
আপীল তামাসা   বৈঠি বৈঠি দেখহ
    গোবিন্দ দাস বহু দূরে ॥

['বিদূষক'— সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১৩৩০, বঙ্গাব্দ, ২য় হর্ষ সংখ্যা]

গান

[দাদাঠাকুর মঞ্চে মাঝে উকিল-ব্যারিস্টারদের নিয়ে যাত্রাভিনয় করতেন। একদিন এক অভিনয়ের শেষে তিনি স্বরচিত এই গানটি গেয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে উকিল-ব্যারিস্টাররাও উপস্থিত ছিলেন। এ-সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীনলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'দাদাঠাকুর' গ্রন্থে লিখেছেন—"গানটি শুনে উকিলবাবুদের মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল অন্তর্যামীই জানেন, আমরা কিন্তু তাঁদের মুখে হাসিই ফুটতে দেখেছিলাম। সে হাসি কৃত্রিম কিনা কে জানে।"—পৃ--১০৫]

ফিরি টাউন জুড়ে গাউন প'রে
জাহান্নামের পাণ্ডা।
আমরা ধরে থাকি অধঃপাতের
ডাউন ট্রেনের ঝাণ্ডা।
আমরা মক্কেল আশায় বসে থাকি,
পেলে আদর ক'রে ডাকি,
পরে দেখাই রক্ত-আঁখি,
শেষে লাগাই ডাণ্ডা।
ভাইয়ে ভাইয়ে ক'রে মারামারি,
তোমরা এসো যদি মোদের বাড়ি,
আমরা দুজনেরই দফা সারি,
গরম করি ঠাণ্ডা।
যে কেউ এসো মোদের কাছে,
তার ফেভারেই রুলিং আছে,
তাদের সাহস দিয়ে তুলে গাছে
খাওয়াই ঘোড়ার আণ্ডা।
চেয়ে দেখ চারিভিতে,
আমরাই লেগে গেছি দেশের হিতে,
কার্য সেরে চালাকিতে
চালাই প্রোপাগাণ্ডা।
খাটছে না আর এই চালাকি,
সবাই তো ধরেছে ফাঁকি,
এখন ভেড়ার দলে মিশে থাকি,
প্রায় ভাজি ভেরাণ্ডা।

[শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের 'দাদাঠাকুর' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ-১০৮।]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত [১৮৮২-১৯২২]

কেরাণীস্থানের জাতীয়-সঙ্গীত

(সুর—"ধাও ধাও সমর-ক্ষেত্রে")

ধাও ধাও চাকুরীক্ষেত্রে
   খাও—অর্থাৎ গিলে খাও যা তা,
রক্ষা করিতে পৈতৃক কর্মে
   শোনো—ঐ ডাকে service জাতা।
   কে বলো কাঁদিবে মানের কান্না,
   যখন মুরুব্বী চাকরী বই চান না!
   সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে,
   শোনো ঢঙ্‌-ঢঙাঢঙ ঘড়ি বাজে কানে।
   চলো আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
   জয় ট্রাম-কোম্পানী; জয় পানওয়ালী!

সাজে কখনো কি হীন দোকানে
   পেলব হস্তে গ্রহণ দাঁড়ি-পাল্লা?
পল্লীগ্রামে—বাবা! পদ্মার পারে
   হয়ে যেন চাষা-ভুষো মাঝি-মাল্লা!
   ডেস্ক্‌-নিবদ্ধ রবে দরখাস্ত!
   যখন বেরুলেই কিছু-কিছু আসত!
   সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে,
   শোনো ঢঙ্‌-ঢঙাঢঙ্‌—ইত্যাদি।

আফিসে নাহি দেখাইব দন্ত,
   মৌনি মুখে শুধু মারিব মাছি;
ভাব না বড় বড়-বাবুর ফন্দ
   বেরুবার বেলা যদি না পড়ে হাঁচি!

টিঁকিয়া থাকিব, হব না ক্ষুব্ধ,
ছুরি, ফিতা, পেন্সিল ও পেন্সেন্-লুব্ধ ;
সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে
শোনো ঢঙ্‌-ঢঙাঢঙ্‌—ইত্যাদি।

ধাও ধাও চাকুরী-ক্ষেত্রে
চেপে যাও বাহিরের যত দরখাস্ত,
পুণ্য সনাতন পৈতৃক আফিসে
উড়ে এসে জুড়িলে হবে না বরখাস্ত !
সে দরখাস্তে করি জুতা সাফ্‌,
উমেদারে জানাও গভীর পরিতাপ !

সাজ সাজ সকলে চাপ্‌কানে
শোনো ঢঙ্‌-ঢঙাঢঙ্‌ ঘড়ি বাজে কানে।
চলো আফিসে মুখে মাখিতে কালি,
জয় ট্রাম-কোম্পানী ! জয় পানওয়ালী !

['ভারতী'—মাঘ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ; 'শ্রীনবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনামে প্রকাশিত।]

হুঁঃ

[গান্ধীজীর অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার অনেক আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কবিতাটি লেখা]

(ওই) বুদ্ধ বাকিল মিথ্যা বকুনি,—
বজায় রহিল যুদ্ধ ;
(আর) যেহেতু খ্রীষ্ট নেহাৎ শিষ্ট
তাই ক্রুদ্ধ জগৎ সুদ্ধ !
(দ্যাখো) শিলেপা লাথে ফোলে অহিংসা
রজ্জু বাঁধিয়া গলাতে,
(হুঁ হুঁ) মাতাল দুনিয়া চলিছে বেতাল-
পঞ্চায়তের সলাতে।

(শোনো) ম্যাক্সিম গুপ মেঠ্ নিকফের
চাইতে মানমান হে.
(করে) ডাইনামাইট আবিষ্কর্তা
গল্প মেরে জুতা দান হে।
(তাই) ভাঙার চেয়ে যে গড়া ভালো বলে
তারে আমি বলি Pooh !
সাক্ষী তাহার চেঙ্গীজ্ !—আছে
চাপা কবরে—
কোরাস··· ···হুঁঃ !

(দ্যাখো) সৃজন কাজটা নেহাৎ কুকাজ,
তার চেয়ে ভালো ধ্বংস .
(তাই) কাপরে শ্রীহরি দ্বারকায়, মরি,
ধ্বংসিল নিজ বংশ।
(আর) ধ্বংসের ফিলজফি আউড়িয়ে
মগজে বহাল দ্যু,
(নৈলে) ব্রহ্মার ভুল শোধরাতো কিসে :
তোমরা তা বল—
কোরাস··· ··হুঁ !

(দ্যাখো) চাষা বোনে ধান, যাঁরা ধ্বংসান
তাঁরা হন মহাশয়,—
জমীদার, দারোগা বা সিপাই ,
চাষা সে চাষাই রয় !
(দাদা) অন্যান্য লোকের ভাত রেঁধে হ'ল
বসুরে বামুন হীন .
(ও সে) প্রেতের জন্য পিণ্ড বাঁধলে
পূজা পেত চিরদিন।
(অ হো) মরণের পথে আলপনা দিয়ে
(হ'ল) বামুন পূজ্য, ভাই,
(আর) জনমের দুঁড়ে আঁতুড় নিকায়ে
ছোট জাত হ'ল যাই।

(তবে) কর আজীবন ধ্বংসে পূজন,
সৃষ্টিতে দাও থু,
(কর) না হক লড়াই হইয়া চড়াও
যার খুসী যত—
কোরাস্… …হুঁঃ !

(এই) ইতিহাস কারে বলে তা' জানো কি ?
শোনো তোমাদের বলি—
(লাখো) লাখো খুন যারা করেছে তাদের
নাম লেখা নামাবলী !
(আহা) সেই নামাবলী অঙ্গে জড়ায়ে
ঘুঘু ডাকে ঘু ঘু ঘু ;
(ওগো) যার যত আছে কামান তাহার
সম্মান তত…
কোরাস্ … … হুঁঃ !

(দ্যাখো) কবি করিয়াছে কাব্যসৃষ্টি,
কে পুছে তাহার মূল্য ;
(হোথা) ক্রিটিকের গালি পায় করতালি-
বরাতে তাহার পুলক !
(যত) রাজ্যের মদের গাঁজলা মুখে, ও—
রাজ্যাটে সাহিত্যিক হে
হিংসুড়ে লেখক মিটাইছে সখ্
করে শুধু টিক্ টিক্ হে ।
(তবু) বেড়ায় ভবের পর-যশ-খোর
(ওই) উনুন-মুখোর ফুঁ,
(ওই) ধ্বংসের ভূত ভারি মজবুত
তা' বুঝি জান না ?
কোরাস … … হুঁঃ !

(তবে) নিয়ে আয় গীতি কার্তির কি জাতি
সৃষ্টির গোড়া খোঁড়,
নিয়ে আয় ডাং—চুরে-ব্যাং-চ্যাং—
নইলে বলিব 'থোড়' !

(ভবে) কুড়্লিয়া তিতা কুটে বুদ্ধি
কচ্লাও যত পারো,
মগজের খোঁজে কেউটিয়া সাপ
নাচাও নচাও আরো !
(তবে) আন্ জেপ্লিন সভা সভীন্
নহিলে ডাকিব 'হু' !
(ওরে) স্বর্গে না হয় জাহান্নামেই
(চল্) হাওয়া বদলাবি ...
কোরাস্ ... ... হুঃ !

(দ্যাখো) সৃষ্টি যে ভুল সে কথাটা শেষে
খুদাও বুঝেছেন,
(তাই) কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলিতে সৃজিলা
গাঁজা গুলি অহিফেন ।
(যাহে) সৃষ্টিকার্য্য পিছু হেঁটে ফের
দেখিবে কারণ-বারি,
(সেই) 'কারণ' সৃজিলা প্রকাশিতে লীলা
রম্, হেনো—রকমারি ।
(সুখে) পান কর আর গ্রামদ্নু লেখ
মেঘলা জীবন ভরিয়া,
(খাও) দুইটি গ্রাঁও হাশীস মাতি
মরার আগেই মরিয়া,
যত খুসী খাও, গোল্লায় যাও
শক না করি হুঁ,
(বাবা) যমের সঙ্গে রফা হ'য়ে গেছে
তা' বুঝি জানো না ?—
কোরাস্ ... ... হুঃ !

('হসন্তিকা' কাব্যগ্রন্থ—১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ)

নরম-গরম-সংবাদ

[১৯১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'হোমরুল' আন্দোলনের সময় তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড মন্টেগু সুকৌশলে কংগ্রেসের নেতাদের সন্তুষ্ট ক'রে আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেন। এই সময় মন্টেগু পাঁচ মাস ভারতে অবস্থান করেন এবং বহু নেতার সঙ্গে মিলিত হন। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় যে সংস্কার প্রয়োজন ও যোগ্য ভারতবাসীদের যে দায়িত্বশীল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা উচিত এ-কথাও তিনি তখন স্বীকার করেন। এই সময় তিনি মডারেট নেতাদের একটি আলাদা দল গড়বারও পরামর্শ দিয়ে যান। উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় চরমপন্থীদের সঙ্গে নরমপন্থীদের বিরোধটা পাকা করা ; এবং এ-ব্যাপারে তিনি যে কিছুটা সার্থকও হয়েছিলেন তার প্রমাণ মডারেটদের নতুন দল 'ন্যাশনাল লিবারাল লীগ' (১৯১৮)। মন্টেগু বিলেতে ফিরে যাবার পর মডারেটরা এই ভেবে আশান্বিত হয়েছিলেন যে এবার তাঁরা একটা কিছু পাবেন। কবির ভাষায় তাঁরা "আচাভুয়া বোম্বার" লোভে উদ্বাহু হয়েছিলেন। কিন্তু মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার তাঁদের হতাশ করেছিল।

কংগ্রেসের তখনকার মডারেট ও এক্সট্রীমিস্ট দলের আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও কর্মাদর্শগত বিরোধ এই কবিতার ব্যঙ্গের বিষয়। লক্ষণীয়, গরম বা চরমপন্থীদের প্রতি কবির সমর্থন পরোক্ষভাবে এখানে প্রকাশ পেয়েছে।]

নরম। বিলাত হইতে আসিছে—মস্ত !—
গরম। বিলিতি ঘোড়ার ডিম !
নরম। চোপ্ ! চোপ্ ! ডিম হোমা-পক্ষীর !
নেপথ্যে। কিন্তু ততঃ কিম্ ?
গরম। গোড়াগুড়ি বলে রাখছি, হাঁ,
আমরা ও-ডিমে দিব না তা।
নরম। দেশোয়ালি ঘোড়া ডিম পাড়িবে
এই কি তোদের স্বপ্ন ?
গরম। মিছে কর দাদা কথা-কাটাকাটি,
মিছে থরথার কর লাঠালাঠি।
নরম। যা' যা' যা' আমরা লাট হব খাঁটি,
আমরা দেশের ক্রীম্ !
গরম। ক্রীম বটে তা তো দেখছি চক্ষে,—
জানছি চিরে নিদেন পক্ষে
লাট ক'রে দেবে লাঠিয়ে কিন্তু,
হাড় ক'রে দেবে হিম !

নরম ! চোপ্ ! চুণোপুঁটি তোরা কির
তাক থাকে যত বড় বড় বীর
জানিস্ কি পিঠ চাপড়ায় কার —
মায় জন-ডিউক —
গরম । জানি গো নিরেট মডারেট ওরা—
খালি পেটে তোলে ঢেঁকুর যাহারা,
আড়াছুরা মোটা-পেটে উঁচাড়ু
আর বার ফিরিশিম্ !
নরম । চোপ ! চোপ ! চোপ্ ! আমরা বড়া,
পাঁচ-মণের আমরা ঢেলা,
আমরাই হব উজীর নাজীর
খেয়ে-না খেয়ে-না দিয়া !
গরম । মরি ! মরি ! মরি ! মধু গরিমা,
মর্যাদার তো নাহি শেষ সীমা,—
মরে পরে মার— ও চু-কাস কাঁমা,—
নেপথ্যে । সম্প্রতি চিৎ চিন্ !

[বিশেষ আবাহিত কামনায় —১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ

সতীশচন্দ্র ঘটক [১৮৮৫—১৯৩২]

বাঙ্গালী-চরিত

(১)

আমরা বাঙালী বটি
মোরা গৃহকোণে বীর বক্তা সুধীর
আর অতিভদ্র পরিপাটি,
যবে জোছনা মলয় বহিয়া প্রলয়
মোরা প্রেমের জগের কাটি ।
বিপদের নামে থাকি গো আড়াল,
কাছে এলে আঁখি করে ঢুলুঢুলু,

আর   স্কন্ধে চাপিলে তুলি গো পটল
ভয়েতে হইয়া মাটি ;
মোরা   মচকাই তবু ভাঙ্গিনা কখন
মুখের দাপটে খাঁটি ,
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ।

(২)

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ,
মোরা   হয়ে বিনম্র পরের ছিদ্র
সতত লইয়া ঘাঁটি,
শুধু   নিজের রন্ধ্র দেখিতে অন্ধ -
নয়ন-যুগল আঁটি ।
ভিখারী গরীব, দীন প্রতিবেশী
যে দিকে আমরা চাহিনাক বেশী,
হায়   তথাপি আমরা পূর্ণ স্বদেশী
বাখানি দেশের মাটি , -
আর   স্বদেশের তরে কাঁদি অকাতরে
দেশীভাবে চুল ছাঁটি ;
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ।

(৩)

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ,
মোরা   কুৎসা কলহ করি অহরহ
কিছুতে বলি না 'না'-টি ,
আর   ভায়ে ভায়ে ঘরে বিচ্ছেদ তরে
মন্ত্রণা মস্ত আঁটি ।
ভালোগুলি রেখে মন্দ সকল
নিয়েছেতে মোরা টুকি আবিকল,
তাও   মাহিমারা সে সব নকল
তাতেই গর্বে ফাটি ,
তবু   নকলনবিস বলে যদি কেহ
মারি তার মাথে চাঁটি ,
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ।

(৪)

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি ;
মোরা জীবনতরণী সেই দিকে বাহি
যখন যে দিকে ভাঁটি।
আর চড়ায় বাঁধিলে চিৎকার করি
মাথায় করিয়া পা-টি।
স্বার্থনীতিই মোদের কেতাব
চাই মোরা শুধু লম্বা খেতাব
রায় বাহাদুর, রাজা, মহারাব,
নবাব, খাজা খাঁ-টি ;
মোরা সকল বিষয়ে পাণ্ডিত সাজি
সাধা আছে মুখে 'হাঁ'-টি,
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

(৫)

আমরা বাঙ্গালী খাঁটি,
মজলিস্ ক্লাবে টানি মোরা সবে
কাফি বিস্কুট খাঁটি,
আর নিজের লজ্জা নিন্দা যা কিছু
দেশের মধ্যে বাঁটি।
মোরা অপমান-ক্ষতে ভরায় মালিস
মাখাইয়া, পরি হাসির পালিশ,
আর কোলেতে টানিয়া তাকিয়া বালিস
ঘুরাই পাখার ডাঁটি ;
মোরা নবাভরণে সভাচরণে
নূতন পথেতে হাঁটি,
আমরা বাঙ্গালী খাঁটি।

['রঙ্গ ও ব্যঙ্গ' কাব্যগ্রন্থ—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ



দেশে মানুষ কই ?

শিল্পী-বনবিহারী মুখোপাধ্যায়



'বিজলী' ২৩ শ্রাবণ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

'নব্যবাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষাক, অতীতের গৌরব-দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি প্রসাধনদ্রব্যে নিজের কঙ্কালসার দৈন্য ঢাকিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন'।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় [১৮৮৬—১৯৬৫]

উকীল

[রঙ্গ-চিত্র]

সাক্ষীরে জেরা করিব, বাসনা—
অগ্নির কণা নয়নে ঝরে;
হায় রে এদিকে না সরে ভারতী,
কণ্ঠ পিঞ্জরে গুমরি মরে।
তর্কেই যদি পাকা নই, যদি
বলিতে গেলেই পড়িব থেমে,—
তবে কেন হনু বি. এল? কারণ,—
পাশ করেছিনু বি. এ. ও এম. এ।

['ভারতবর্ষ'—পৌষ ১৩২০ বঙ্গাব্দ।]

জমিদার

[রঙ্গ-চিত্র]

আমি রাজা, মোর রাজ্যে চিরানন্দ, চির মহোৎসব,
নাহি দুঃখ দৈন্য লেশ।—জলাভাব? তাও কি সম্ভব?
গ্রামে-গ্রামে দীঘি, ডোবা, খাল, বিল আদি জলাশয়,
বিমল হরিতকান্তি, পানাঢাকা চির শান্তিময়।
যাদের শীতল ক্রোড়ে সন্তাপিত অঙ্গ ঢালি দিয়া,
জুড়ায় মানুষ, মোষ, মেষ, বৃষ, হৃদয় ভরিয়া
পান করি লয় সুধা, প্রাণময় লক্ষ জীবাণুর
সাগ্রহে, দশটা মাস। তবু আজ শুনি এ কি সুর।
চতুর্দিকে আর্তনাদ, কীর্তিনাশা দুস্থ কোলাহল,—
"পিপাসায় কণ্ঠ ফাটে; বক্ষ ফাটে; দাও দাও জল।"

"কোথা জল ? কোথা জল ?"—অভ্রভেদী শব্দ হাহাকার—
অকৃতজ্ঞ কৃষকের দুর্বিনীত দারুণ চিৎকার।
বৈশাখের খরদাহে তপ্ত, দগ্ধ ধরণীর ধূলা,—
শুকাইছে নদী-নালা, শুষ্ক হয় পুষ্করিণীগুলা,
সে দোষ আমার নহে। পাইয়েছি সোডা শুঁড়ী হতে
আমি করি নাই মানা নিদারুণ তৃষ্ণা নিবারিতে।
অন্নকষ্ট? মিথ্যা কথা! শস্যাগারে নয় বঙ্গভূমি,
বিরাজে শ্যামল ক্ষেত্র দিক হতে দিগন্তর চুমি ;
এ সব কাহার? এই পরিপূর্ণ অক্ষয় ভাণ্ডার
চিরদিন কার তরে? কৃষকের! তবু অনাহার?
নাহি চাই বাজে কথা, শস্য ভাগ। লহ শুধু টাকা,
অপেয়, অখাদ্য, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ অতি, রজতের চাকা
—Nominal value—তবু অনাহারে মরে যে দুর্ভাগা,
কে তারে আহার দিবে? বিধাতার অভিশাপ লাগা
তার ভালে। শীর্ণকায় প্রজাগণ সে তাই বরাত!
আমিও তো জন্মিয়াছি বঙ্গদেশে, খাই ডাল ভাত।
তবু দেখ ফুলি রোজ, পাঞ্জাবী সে গোঁফসম আঁটে,
পদভরে প্রতিদিন আনকোরা Pump shoe জোড়া ফাটে।
কলেরা, বসন্ত, জ্বরে জর্জরিত, অর্দ্ধমৃত দেশ
জানি তাহা। কিন্তু হায়, উপায়ের না পাই উদ্দেশ।
রোগ, শোক দেবতার হাত। আছে একটি সম্বল,
পলায়ন! তাই আমি পরবাসী। গ্রাম্য মূর্খদল,
তারাও বাঁচিতে পারে পলাইয়া আমারি মতন
সহরের সৌধচূড়ে, নিরাপদে, নিরুদ্বিগ্ন-মন।
তবে কেন পড়ে থাকা, রোগমাখা দুঃখমসী-আঁকা,
অরণ্যে বাঁশবন, অন্ধতম ঝোপঝাড়ে ঢাকা,
পিচ্ছিল বন্ধুর ভূমি, চড়া, গাড়া, গভীর কর্দম,
পাগলা শৃগাল, জোঁক, সর্প, ভেক, বৃশ্চিকে দুর্গম
পাড়াগাঁর পূতিগন্ধে, নাক গুঁজে চোখ মুখ বুজে?
শরীরের রস দিয়া কেন তবে, আত্মনাশ খুঁজে
পুষ্ট করি তোলা দুটো পেট-জোড়া প্লীহা ও লিভার?
অজ্ঞতা? সে হতে পারে। তুমি চাও শিক্ষার বিস্তার?

না হয় করিনু সেটা। তার পরে কোন্ বেটা করে
বলো তো আমার কাজ ? কে সাজিবে পান ? সমাদরে
কে দুলাবে তালবৃন্ত ক্লান্তিহরা, যবে শ্রান্তকায়
দিবসের তন্দ্রাশেষে, সন্ধ্যাকালে তুপ্সে তাকিয়ায় ?
সট্‌কা এগিয়ে দেওয়া, সুকোমল অঙ্গে তেল-ঘসা,
কে করিবে এই সব ? তাড়াতাড়ি কে তাড়াবে মশা
ভুঁড়ি হতে, হস্ত যেথা অর্দ্ধপথে ব্যর্থ ফিরে আসে,
হারায় দৃষ্টির সীমা, জ্ঞান মৌন নিষ্ফল প্রয়াসে ?
আমি করি অন্য রূপে প্রজাদের দুঃখের লাঘব।
বার মাসে তের পর্বে বেড়ে যায় প্রজারই বৈভব।
প্রজাই বাজায় বাঁশি, কাঁসি, ঢোল। দেখে হৃষ্ট-চিতে
হাজার হাজার মুদ্রা ফুঁকে দিই আতস-বাজিতে।
দেশের ভূস্বামী আমি, মোর কাছে লাভবান্ সবে।
এই দেখে ঘটা করে প্রতিবার শারদ-উৎসবে,
কত শত নিরন্নেরে ভুপ্পুর্‌চি পোলাও খিলাই
জীর্ণ-চীর দরিদ্রেরে শান্তিপুরী চাদর বিলাই।

('ভারতবর্ষ'—মাঘ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।)

বামুন-ঠাকুর

(রঙ্গ-চিত্র)

আমার কাপড় গামছা তেল কুচ্‌কুচে,
সেই তো আমার গর্ব।
শুধু বাবুর্চিরাই করতে ওরা
সোপার খরচ খর্ব।
জানি, দদ্রু আমার অঙ্গ ভূষণ,
নিন্দার কিবা ইথে ?
আছে সর্ষপতেলে জব্‌জবে চুল
ধব্‌ধবে সাদা সিঁথে।

আমি বাস করি বটে কেল্লা-আলয়ে,
টানি বটে গাঁজা-গুলি,
তবু গলায় তো আছে পৈতের গোছা,
জবর হজমি-গুলি।
আমি চুরিটা আস্‌টা করে থাকি,
তাতে নেইকো তেমন লাজ,
শুধু ব্রাহ্মণ হয়ে পণ্ডিত হইব,
করিনি এমন কাজ।
আমি পড়ি নি কখনো Hegel বা Mill,
যাইনি বিলাতে গিয়ে,
আমি শিখিনি কখনো ফরাসী বুলি,
করিনি বিধবা বিয়ে।
আমি হোটেলে, টেবিলে, সাহেবের সাথে
খাই নি কারি ও ভাত,
আমি ধর্ম রেখেছি অক্ষত,
আমি অটুট রেখেছি জাত।
ক্রমে ভারত-শূন্য একেবারে হবে,
সকলেই জানে সেটা।
শুধু আমি টিকে রব হিন্দু সমাজে,
আমারে তাড়ায় কেটা?

['ভারতবর্ষ'—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত [১৮৮৭-১৯৫৪]

শরতে বঙ্গভূমি

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি' গেছে খানা ডোবাতে!

পারে না বহিতে লোকে জ্বরভার,
পেটে পেটে পিলে ধরে না ক আর,
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী সভাতে
এক পাশে তুমি কাঁদিছ জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

জননী, তোমার ভিক্ষার খাতা
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।
রোগে-বন্যায়,—'ভাণ্ডে ভবানী'
তোমার ভবনে ভবনে।

অবসর আর নাহিক তোমার,
দলে দলে ছুটে 'ভলণ্টিয়ার',
লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত,
পান্ত আনিতে লবণে।
জননী তোমার চির চাঁদা খাতা
খুলিয়া রেখেছ ভুবনে।

গুলি কাদা পাঁক করেছ বেবাক
জলাশয় ঘোলাবরণী।
পচাইয়া পাতা করিয়াছ স্যাঁতা
বন-জঙ্গলা ধরণী।

ঘরে ঝাড়ে আর ঝোপে ঝাড়ে বনে
বাঁশী বাজে যেন সকরুণ স্বনে,
উড়ে' ঝাঁকে ঝাঁকে ঢোকে মুখে নাকে
মশক-মশকধরণী।
জলাশয়গুলা করিয়াছ ঘোলা
বন-জঙ্গলা ধরণী।

খুলিছে আবার যমের দুয়ার
ভবযন্ত্রণা জুড়ায়ে
কুটিরে কুটিরে নব নব ব্যাধি
নবীন জীবন উড়ায়ে।

দিকে দিকে মাতা উঠে ক্রন্দন
ঘরে ঘরে টুটে ভববন্ধন ,
যমদূতের মুঠা মুঠা লয়
পড়ে-পাওয়া প্রাণ কুড়ায়ে ।
চলেছে শমন দুধারে তাহার
ভবযন্ত্রণা জুড়ায়ে ।

আয় আয় আয় আছ যে যেথায়
কাঙালী ও রোগী উঠিয়া,
ভিক্ষার ক্ষুদ বাঁটিছে জননী
বাণী যেতেছে ফুটিয়া ।

ও ঘর হইতে আয় হামা দিয়ে,
ও বাড়ী হইতে আয় খোঁড়াইয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায়, মায়েরে কাঁদায়,
ক্ষুদ কুঁড়া খায় খুঁটিয়া ।
ভিক্ষা-অন্ন বাঁটিছে জননী
আয় তোরা সবে জুটিয়া ।

মাতার কণ্ঠে কণ্টকমালা,
বাঞ্ছা কাঁদিছে ডুকরি ,
'চাঁদমারা' মেঘে আকাশ-আঁচল
ছিঁড়ে যেন সে ধুকড়ি ।
কেড়েছে কিরীট নিঠুর পীড়নে,
কত না ছলনা হরিতে হিরণে,
কঠিন-শিকল-বিকল-চরণে
জননী কাঁদিছে ফুকরি' ।
রোগে বন্ধনে তাপে ক্রন্দনে
নিখিল উঠিছে মুখরি' ।

[প্রথম প্রকাশ— 'বিজলী' সাপ্তাহিক,—২ আশ্বিন, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ;
কবির 'মরুশিখা' কাব্যগ্রন্থে (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) সংকলিত ।]

দেশোদ্ধার

বার বার তিন বার,—
এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার।
শোন্ রে শ্রমিক শোন্ ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালোবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার!

তোদের দুঃখে হায়,—
পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
কোরো নাকো ভাই হীন আশঙ্কা,
এবার নয়নে ঘষিনি লঙ্কা;
সত্য সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয় তোদেরই চায়!

ও কে চিরপরাধীন!
তোরা না জানিস্, মোরা জানি তোর কি কষ্টে কাটে দিন।
নানা পুঁথি পড়ে পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তের আনা প্রাণ,
বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন!

তোরাই যে ভাই দেশ,
তোদের দৈন্য-জনা মায়ের কঙ্কাল অবশেষ।
মহাত্মা হলে বেগুন পালঙ্,
যদিও ভিতরে চটে হই টং,
তবু তোর সেবা দেশেরই যে সেবা মনে মনে বুঝি বেশ!

ওরে নাবালক চাষা!
আমরা তোদের ভাঙাব নিদ্রা মূক মুখে দিব ভাষা।
শ্রমিক চাষীর দুঃখে স্বর্গ
রচিতে ছুটিব লইয়া খড়্গ।
গড়িয়া আইন ভাঙি বে-আইন জাগাইব নব আশা!

ওরে ওঠ্ ওঠ্ জেগে,—
তরুণ অরুণআলোকে জানা ও অজানা বাধায় রেগে
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল,
পাঁচনে খেদায়ে বলদের দল,
প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বেঁধে চল্ বেগে।

জুড়ে দে লাঙল ক'সে,—
ফালের আগায় যত উঁচু নিচু সমভূম্ কর্ চষে;
মথা উঁচু করে আছে ঢ্যালাগুলো
মই-এর চাপনে করে দে রে ধুলো;
কাঁটার বনে কর্ রে খরসে জোএ জোএ বিদে ঘষে।

ফসল হবেই হবে!
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি পাতাল ফুঁড়িবি তবে।
আপনার হাতে পুনেঃহস্ যাকে
টেনে তুলে জলে দুয়ে দিবি পাঁকে,
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।

সেই দুর্যোগ-উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রেবাদলে রচিয়া অন্ধকার;—
সরে' পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা!
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষার ব্যারিষ্টার!

('মরুশিখা'—১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।)

হেমেন্দ্রকুমার রায় [১৮৮৮-১৯৬৩]

কালাপাহাড়ের উদ্বোধন

কালাপাহাড় ! …ঘুমিয়ে নাকি ? …পাশ ফেরো ভাই,
চোখ খোলো,
স্যাঁৎ-চাপা ঐ আংরাটাতে জ্বালিয়ে আগুন ফের তোলো !
পথ-বিপথে তাল-বেতালে ঝড়-ঝাপটের শাঁখ বাজাও,
লক্ষ যুগের অন্ধকারে রক্ত-শিখার দীপ সাজাও !
মন-বুড়োদের পাঁজরা ছিঁড়ে খেলতে থাকো ডাংগুলি,
বেরিয়ে পড় ধ্বংস-নদে বান-ক্ষ্যাপানো তান তুলি,
বেরিয়ে পড় বেপরোয়া !
পথের তুমি—নও ঘরোয়া !
চণ্ড মরুর উষ্ণ তৃষায় শান্তি-স্বপন আজ ভোলো,
মৃত্যু-সখা, চোখ খোলো !

ভণ্ডগুলোর গণ্ডগোলে আবার গেছে দেশ ছেয়ে,
মানুষগুলো গুবরে-পোকা বাঁচছে গবুর নাদ্ খেয়ে !
বুক-ভরা সব সয়তানি, আর দিচ্ছে মুখে 'বোল হরি',
নিমাই-চেলা কুঁকড়ো খেয়ে নাচছে গেয়ে খোল ধরি,
জাতির পাঁতি তৈরি ক'রে পৈতে-টিকি বর্তমান,
মানবতার কণ্ঠ চেপে ধর্মে দেখায় মর্তমান !
আমরা তবু সব সহি গো
চিত্ত নহে বিদ্রোহী গো,
কাঁদ্‌চে মাতা, কাঁদ্‌চে জায়া, কাঁদ্‌চে ঘরে বোন-মেয়ে,
ভণ্ডামি এই দেশ ছেয়ে।

নব্যগুলো সভ্য হয়ে বাংলা রীতি দ্যায় জ্‌লাঞ্জলি,
কলকাতাতে আনছে তারা লণ্ডনেরি হাল-ফ্যাসান্।
সায়েব সেজেও হায় তবুও সায়েব দেখেই লম্বা হন,
বাচ্চারা সব 'পাপ্পা' ব'লে বাপকে করে সম্ভাষণ !

মঞ্চে চ'ড়ে ইঙ্গ-বোলে হয় স্বদেশী বক্তিমা,
অন্দরেতে চন্দ্রমুখে ফুটছে 'রুজের' রক্তিমা !
দোটানার এই বিষম টানে,
যাচ্ছি কোথায়—কেই বা জানে !
কোন্ দরদী বুঝবে ব্যথা, বুক যে ওদের সব পাষাণ,
দেশকে ধ'রেই দ্যায় ভাসান ।

আজকে আবার নতুন-গড়া জগন্নাথের মন্দিরে,
ধর্ম মোদের কর্ম মোদের মর্ম মোদের বন্দী রে !
আমরা সবাই ঠায় দাঁড়িয়ে,— মৌন শিলার পুত্তলী,
পুরুত মোদের রাখছে তুলে, কিংবা ফেলে উত্তোলি' !
গণ্ডীদেবের রথ চলেছে কাঁপছে সারা দেশখানা,
তার চাকাতে বুক পেতে ঐ জ্যান্ত মানুষ হয় দানা !
জীবের হাতে জড়ের সেবা,
হায়, প্রহসন বুঝবে কেবা ?
মুক্ত প্রাণের ছন্দ জাগায় নেইকো এমন ছন্দী রে,
গণ্ডীদেবের মন্দিরে ।

কালাপাহাড় ! আর একটিবার জাগবে না কি হাঁক তুলে ?
শিকল-দেবের বিকল পুরুত সকল গীতা যাক্ ভুলে !
তাক থেকে ঐ পুতুলগুলোয় হিঁচ্ড়ে টেনে নাক কাটো,
পৈতেগুলো দাও পুড়িয়ে, আবর্জনা সাফ্ ঝাঁটো,
গোবর-গণেশ সমাজপতির দাও ঘামিয়ে সাফ্ মাথা,
একঘেয়ে এই সুর ঘুলিয়ে জাগো হে বীর, খাপ্ছাড়া !
বিপ্লবের তপ্ত স্রোতে,
তৃপ্ত কর রক্ত-ব্রতে,
শক্ত হাতে বাংলা বুকের দাও গো নাগের পাক খুলে,
আকাশ-ভেদী হাঁক তুলে !

দীপ্ত রবির নাটশালায় আসবে তোমার পক্ষে জয়,
অন্ধকারের এই প্রবাহ আর কত দিন চক্ষে সয় ?
পোড়ো জমির জংলো-চারা সাফ্ ক'রে দাও খল-খায়,
তবেই আবার নতুন ক'রে জাগবে সবুজ স্বর্গ তায় !

মিথ্যাচারের হত্যাকারী ! —নও কো তুমি নীচ খুনী,
ফলিয়ে তোলো তরুণ আশা, আবার নতুন বীজ বুনি' !
বদ্ধ জলা যাক্ গে মরে
শুষ্ক মালা যাক্ গে ঝরে
বস্তাপচা সস্তা জীবন মৃত্যু-ঝড়ে হোক্ গে লয়
বিদ্রোহেরি পক্ষে জয়।

[প্রথম প্রকাশ—'বিজলী' সাপ্তাহিক, কলকাতা,—১১ শ্রাবণ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ ; হেমেন্দ্রকুমারের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'যৌবনের গান'-এ সংকলিত।]

নলিনীকান্ত সরকার [জন্ম—১৮৮৯]

দোসরা জুন, উনিশ শ' সাতচল্লিশ

[১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করে এবং শ্রমিক-নেতা ক্লেমেন্ট এটলি প্রধানমন্ত্রী হন। ভারতবাসীকে আত্মকর্তৃত্ব দান এবং এ-দেশে একটি দায়িত্বশীল শাসনপরিষৎ গঠনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এটলির উদ্যোগে ভারতে যে ঐতিহাসিক ক্যাবিনেট মিশন প্রেরিত হয় তার নেতা ছিলেন তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স এবং অন্য দুজন সদস্য ছিলেন স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও এ. ভি. আলেকজাণ্ডার। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ মার্চ মিশন এ-দেশে আসেন ও দীর্ঘ তিন মাস থাকেন। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে ১৬ মে ক্যাবিনেট মিশন তাঁদের প্রস্তাব ঘোষণা করেন। এই প্রস্তাবে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার কথাই ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির কথা জিন্না সাহেব যদিও আগে থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন তবু প্রথমে মিশনের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু পরে তিনি এর প্রচণ্ড বিরোধিতা ক'রে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন্' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিকল্পনা করেন এবং ফলে ১৬ আগস্ট থেকে দেশব্যাপী দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। তখন মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই শাসন-পরিষৎ গঠিত হয়। অবশ্য কয়েক মাস পরেই লীগ শাসন পরিষদে যোগ দেয় এবং লিয়াকৎ আলি খাঁ, গজনফর আলি খাঁ, আই. আই. চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিস্তার এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সদস্য হয়ে আসেন। শাসন পরিষদের কাজে এঁরা নানা ভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করতে থাকেন এবং গণ পরিষদে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেন। এ-সবের পিছনে ব্রিটিশ সরকারের

বিভেদ সৃষ্টির নীতি যে অত্যন্ত সক্রিয় ছিল আজ তা প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী একটি বিবৃতি প্রচার করেন। তাতে বলা হয়, একটি গণ পরিষদ গঠন যদি সম্ভব না হয় তবে একাধিক গণপরিষদকে মেনে নিয়ে অথবা প্রদেশভিত্তিক কর্তৃত্ব দিয়েই তাঁরা ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যেই ভারত ছেড়ে চলে আসবেন। এই সময় বড়লাট ওয়াভেল দেশে ফিরে যান এবং তাঁর জায়গায় আসেন ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেন—ভারতের শেষ বড়লাট। এর পর থেকে ভারত বিভাগের ব্যবস্থাই পাকা হয়। ভাগাভাগির নতুন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ও তার অনুমোদনের জন্যে মাউন্টব্যাটেন নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন ২ জুন ১৯৪৭। এই তারিখটিকে সম্বোধন করেই এই ব্যঙ্গকবিতাটি লেখা। এটি সেই দিনেরই 'যুগান্তর' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের কর্মতৎপরতার জন্যে এই বছরের ১৫ আগস্টেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে—১৯৪৮ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি।]

স্বাগত দোসরা জুন!
তোমার মাঝারে সারা ভারতের নবীন আশার ভ্রূণ।
দিকে দিকে আজ পড়িয়াছে সাড়া—
কেহ তাল ঠুকে, কারো গোঁফে চাড়া,
কেহ নাই ব'সে, সকলেই খাড়া গাহি দুন্—চৌদুন।
স্বাগত দোসরা জুন!

ধরিয়াছি মোরা যোগই যে আর ফেব্রুয়ারির বিশে,
হে দোসরা জুন, তোমারে ধরিতে হারাইয়া যায় দিশে।
পথের দুধারে চলে গোলাগুলি,
ভুঁড়িতে ছুরিতে ঘন কোলাকুলি,
ইহা ছাড়া আছে কার্ফিউ, যদি পান থেকে খসে চুন।
বুঝেছ দোসরা জুন?

তবু রেলপথে চলে দৌড়িয়া, কেহ বা বিমান-রথে,
ঘর-বাড়ি ফেলি' পুত্র-কলত্রে ছুটিয়াছে শতে শতে!
জনপুর আজি শহর দিল্লী,
করিছে সবাই চেল্লাচিল্লি,—
পাকা ঘুনো, রাজনীতিতে যাদের হাড়ে ধরিয়াছে ঘুণ।
হে মোর দোসরা জুন!

আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে করিতেছে খয়-খাব,
না জানি কেমনে বরিবে তোমারে দিল্লীর দরবার !
        কাহারো নেত্রে ঝরিবে কি জল,
        উল্লাসে কেহ গাহিবে গজল,
কেহ বা ভক্তিগদগদচিতে ফুকারিবে রামধুন ?
                জানো কি দোস্‌রা জুন ?

গাঁয়ে-নাহি-মানা-মণ্ডল শ্রীযোগেন্দ্র জুটিয়াছে,
গুরু জিন্নার পোঁ-ধরার সাথে সে যে পোঁ ধরিয়া আছে !
        জুটে কংগ্রেস-প্রদেশ-মন্ত্রী,
        মহাসভা আর সমাজতন্ত্রী ;
কমিউনিস্ট্‌ও জুটেছে—ভারত-ফাটলের মৎকুণ।
                দেখেছ, দোস্‌রা জুন ?

বেড়ালে বেড়ালে অবনিবনাও যেহেতু পিঠা যে মিঠা,
বানরে তাহারা মেনেছে সালিস ভাগ করিবারে পিঠা।
        বানর বিভাগ করিছে গর্বে,
        চ'লে যায় পিঠা কপির গর্ভে,
মোলে যাহার অধিকার সে যে ভোলে হতেছে খুন !
                কেমন, দোস্‌রা জুন ?

এটলীর যাহা নয়নের তারা ক্রিপ্‌সের কৃপানিধি,
যাহারে আলেকজাণ্ডার কোলে সঁপিয়া দিয়াছে বিধি,
        এনেছে মাউণ্টব্যাটেন উহারে
        হে দোস্‌রা জুন, তোমার দুয়ারে,
একটু কপাট ক'রে রেখো ফাঁক, হ'য়ো ভাই, সকরুণ।
                দেখিব, দোস্‌রা জুন !

কোন্ জন কিবা স্বার্থ খুঁজিছে, দেখিতে ইচ্ছা জাগে,
রাবণের চিতা জ্বলিবার আগে কে মজে লঙ্কাভাগে।
        কভু না ত্যজিয়া শয্যা-বিলাস
        কোন্ সে নেপোর দধির পিয়াস,
কোন্ পরগাছা ডগায় উঠিয়া মহীরুহে ভাবে ঊন।
                দেখিব, দোস্‌রা জুন !

আত্মপন্থী ভিন্নপন্থী কোন্ সুর কেবা গাহে,
কাহার কথার উত্তর দিতে কার দিকে কেবা চাহে।
কাহার ছুরিতে কার প্রাণ যায়,
কার ঘুড়ি কাটে কার মাঞ্জায়,
শবের উপরে শব-বর্ষণে খালি হ'লো কার তূণ।
দেখিব, দোস্‌রা জুন!

দেখিতে বাঞ্ছা জহরলালেরে আর মিঞা লিয়াকতে,
দেখিব জনাব জিন্না সাহেবে আল্লার কিয়ামতে।
দেখিব অর্ধনগ্ন মূর্তি
বিদ্রূপে করিছে বাকাস্ফূর্তি,
গজনফরের গজটেক দূরে ব'সে ফিরোজ খাঁ নুন।
দেখিব, দোস্‌রা জুন!

দেখিব সবার মুখভঙ্গীটি ঢাকনা খুলিবে যবে,
খাস বিলাতের রাজ-ঘোটকীর ডিম্ব বাহির হবে।
সাঙ্গ হইবে দরবার-লীলা,
কাচা-কোঁচা সব হয়ে যাবে ঢিলা,
লুঙ্গি উঠিবে মস্তকোপরি খসে যাবে পাৎলুন।
স্বাগত, দোস্‌রা জুন!

ন্যাতাদের চোখে ভ্যাবাচ্যাকা লাগে তোমারে বরিবে কিসে?
বরিবার সাধ রহিল সবার পুন আর্তচিৎকারে।
বিপুলা পৃথ্বী, নিরবধিকাল
সালের ওপর দিয়ে যায় সাল,
কাপুরুষ মোরা গুণাতীত, গুণময়, নির্গুণ।
বিদায়, দোস্‌রা জুন!

['যুগান্তর' পত্রিকা—কলকাতা, ২ জুন, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ।]

ভাবী বিরহ

[কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা প্রথমে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার কথাই ভাবতেন। তাই বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী কথাটার তখন উদ্ভব হয় নি) সুরাওয়ার্দি সাহেবও মনে করতেন বাংলা অবিভক্তই থাকবে। তিনি তাঁর দপ্তরখানাটিকে চাঁদ ও তারা দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। সুরাওয়ার্দি সাহেব তখন 'উজিরে-আজম' এবং তাঁর প্রধান অমাত্যেরা নিজিম পদে 'সালারে আলা' 'সালারে সুবা' নামে আখ্যাত। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় পাঞ্জাবের দুটি অঞ্চল ওয়াজিরাবাদ ও নাজিমাবাদ নানা ইন্ধন যুগিয়েছিল। এই সময় দুজন দশাসই পুলিশ কর্মচারী—দোহা এবং খন্দকার সাহেব—কলকাতার দক্ষিণে এবং উত্তরে দোর্দণ্ডপ্রতাপে শাসনকার্য চালিয়ে যেতেন। কবিতাটি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের ভারত-বিভাগের কথা পাকা হয়ে যাবার সময়েই রচিত।]

চন্দ্রতারাচিহ্নহারা কক্ষ গৃহ অন্ধকার।
নাহি বুঝি রে আজি উজিরে-আজম মসনদ আর!
চেরাগে আর তৈল নাহি,
ঘুচিয়া গেল শাহানশাহী,
থামিয়া গেল শেখানো বুলি চাচাতুয়া ও চন্দনার।
গেল যে থামি কাউন্সিলে
সকল লীগ-কলীগ মিলে
মত্ত যত নৃত্যরত,—নাচানো চারু চন্দ্রহার।
কলুটোলা যে উঠিল টলি
হায় কি হ'লো, কি হ'লো বলি,
কলাবাগানে ধরিল ধুয়া কা হুয়া কা ক্রন্দনার!
সে-ধ্বনি শুনি সকলে কাঁদে
ওয়াজিরা ও নাজিমাবাদে,
কেমনে খানা হইবে আনা কারখানা যে বন্ধদ্বার!
পড়িল চাল, নিভিল চুলা
থানায় কাঁদে শুঙ্গীগুলা
স্কন্ধোপরি লোহার টুপি ছুটিছে দোহা-খন্দকার।
মাথায় হাত এক একটি যে
মধুপ বসি সাম্লাইছে
ফুলের পরে বসিয়া ফুলে লুটেছে মকরন্দ তার।

আপন জনে হতেছে পর
কি হবে ভাবি অতঃপর,
কি তাই হ'লো মিছাই শুধু দ্বন্দ্ব পরে দ্বন্দ্ব হায়।
কত না ফুলে ভরিল মিছা
আসমানেরি ফুলবাগিচা ;
শেষটা কিনা ওষ্ঠাধরে কোস্তা-পচা-গন্ধ-ভার !
একে ও একে ছাড়িয়ে ডেরা,
ভাগিছে ভাই-বেরাদারেরা ;—
সালারে-আলা, সালারে সুবা পালারে গোয়ালন্দ পার।

('শনিবারের চিঠি', কলকাতা—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ ।)

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য [জন্ম-১৮৯০]

ছাত্রের প্রার্থনা

১

আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয় !
তোর জন্যে চোর-চোট্টা সাধ হওয়া যায়।
আয় ডিগ্রী আয় !
তোতার মতো বুলি শিখে, বাঁধা গদে খাচ্ছি লিখে,
তোর দর্শন পাবো নাকি ? তোরেই যে প্রাণ চায় !
নামের শেষে দেখলে তোরে, সবাই আদর করবে মোরে,
হইনে কেন পাঁঠা খাসি—কিই-বা আসে যায় ?
আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয় !

২

তোর লাখা, ভাই, পাবো যখন, ওজন আমার বাড়বে তখন,
খাবে যদি না কাটা যায়, ভারে কাটবো তায় !
মোর কপালে টিপ্ দিয়ে যা, গোঁফ জোড়াতে বেশ দোবো তা,
তোর কৃপাতে দৌলত হোলে কে না তোরে চায় !
আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয় !

৩

জীবন তোরে যাচ্ছি পড়ে, রইছি তবু জ্যান্ত মরে,
তোর তরে, হায়, বাবার গেল অর্থ সমুদায় !
আমার গেল স্বাস্থ্য আশা, গেল চোখের দীপ্তি খাসা,
কৈশোর তো মরেই গেছে, যৌবন যায় যায় !
আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয় !

৪

তোর আশাতে ছাড়বো চাদর, ফুঁকবো চুরুট, বাড়বে কদর,
সব ধনীরা ধরবে ধান্না, বস্‌বো কেদারায় !
মাস্টারীটা পেলে, ভায়া, দিনে দিনে বাড়বে পায়া,
চরণ-চাটা শিক্ষা দোবো, কাজ কি ব্যবসায় ?
আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয় !

৫

ব্যবসা করবে মাড়োয়ারী, আমরা কি তা করতে পারি ?
কলম-পেষা জাতির ছেলে কলম পিষে খায় !
হোক না তারা লক্ষপতি, চাকরি মোদের পরম গতি,
বাঙালীদের পক্ষে শুধুই চাকরি শোভা পায় !
আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয় !

৬

ধর্মের ধার ধারবো কেন ? নাস্তিকতাই ধর্ম জেনো ;
ডিগ্রীতে, ভাই, টাকা আসে, ডিগ্রী কেনা চায় !
ডিগ্রী বড়ই চমৎকার, ডিগ্রীধারী দাগা-ষাঁড় !
চরে বেড়ায় ডিগ্রী নিয়ে মস্ত দুনিয়ায় !
আয় ডিগ্রী আয় ! আয় উপাধি আয় !

['হাসির হর্রা' কাব্যগ্রন্থের (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) 'রঙ্গ-ইঙ্গিত' অংশের কবিতা ।]

গান

কোন্ দেশে

(বাউল সুর)

১

কোন্ দেশেতে রাজা-গজা
সকল দেশের চাইতে অচল !
কোন্ দেশেতে জন্ম নিয়েই
সদ্যোজাত তুলছে পটল !
কোথায় শুনি প্রেমের বুলি
কচি খোকার মুখে রে !
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

২

কোথায় ডাকে বৌকে 'মাগী',
কেউ বা রাখে বুকে মাথে !
কোথায় 'বাবু' খেটেই কাবু,
পিষছে কলম দিনে রাতে !
নারীরা কোথা ভোগের জিনিস,
'প্রভুরা' মজা মারছে রে !
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

৩

কোন্ জাতি আত্মঘাতি
কথায় কথায় জাতি যায় !
কোথায় ভিটায় ঘুঘু চরে,
দেখছি ভীষণ কন্যাদায় !
মদ-মাতাল আর মাগীখোরের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে !
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে !

৪

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা
কেবল করি গলাবাজি !
কোন্ দেশের মানুষগুলো
মানৃছে শুধুই পুঁথুং পাঁজি !
মোদের কুল-কুলাঙ্গারের
বংশবৃদ্ধি কোথা রে !
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে !

গোলামের জাতীয় সঙ্গীত

সুর -'আমার মাথা নত করে দাও হে'—ইত্যাদি

আমার মাথা পিষে দাও হে তোমার
সবুট চরণ তলে !
বাঁচার অহঙ্কার হে আমার
দাবাও সকল ছলে !
নিজেরে খাওয়াতে শুধু নুন ভাত,
নিজেরি কপালে করি করাঘাত
আপনারে শুধু ঘানিতে ঘুরায়ে
ঘুরে মরি পলে পলে !
বাঁচার অহঙ্কার হে আমার
দাবাও সকল ছলে !

আমারে না যেন ভাবিও মানুষ
আমার দেশের মাঝে !
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
যখন যে ভাবে সাজে !

যাচি হে তোমার চরম শাস্তি,
জগতে আমার আর নাস্তি,
আমারে যমের বাড়ীতে পাঠাও
তোমার বুটের বলে ।
বাঁচার অহঙ্কার হে আমার
দাবাও সকল ছলে !

কুলীর গান

সুর—'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি'—ইত্যাদি

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার বুটের ধ্বনি,
পীঠে ফাটে ফাটে ফাটে !
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে ফাটে ফাটে ফাটে !

গেয়েছি গান যখন যত,
চোখের জলে ধোবার মতো,
সকল সুরে বেজেছে, হায়,
কি রোদনই
সে যে ফাটে ফাটে ফাটে !

কত দিবস সকাল সাঁঝে দুপুর বেলা
সে যে ফাটে ফাটে ফাটে !
কত বেদন দিচ্ছে বুকে ভীষণ ঠেলা
সে যে ফাটে ফাটে ফাটে !

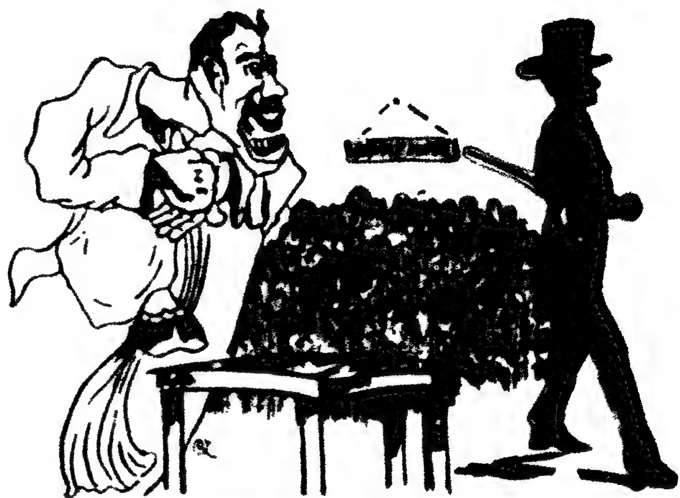
দুখের পরে পরম দুখে,
রাঙা চরণ রাখি বুকে
সুখে পটল তুলিয়ে সে আর
'কালা'-র প্রাণ !
সে যে ফাটে ফাটে ফাটে !



শিল্পী শ্রীচঞ্চল বন্দোপাধ্যায়

"জোর যা'র মুলুক তার"

'বিজলী' ১০ আশ্বিন, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ



"ছায়া মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা একবার প্রতিবাদ করিব, দুইবার প্রতিবাদ করিব, তিনবারের বার আর করিব না।"

'বিজলী' ৬ ভাদ্র, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (ঘন ঘন করতালি)

চৌষট্-হাজারী

সুর—'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণি' ইত্যাদি।

[এই ব্যঙ্গ-সঙ্গীতটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে লেখা। এই সময় অর্থ আর মন্ত্রীত্বের আকর্ষণে প্রকৃত দেশসেবার ক্ষেত্র থেকে সুরেন্দ্রনাথ অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিলেন। স্মরণীয়—ইংরেজ সরকারের মন্ত্রী হিসাবে তিনি তখন বেতন পেতেন বছরে চৌষট্টি হাজার টাকা।]

তুমি কেমন করে মান কর হে 'ন্যাতা'!
হিয়ায় জাগে ব্যথা, বড়ই ব্যথা!
গলার আওয়াজ ভুবন ফেলে ছেয়ে
গলার জোরে মন্ত্রী হলে যেয়ে,
বেড়াও শুধু মোদের খেয়ে-দেয়ে
পড়িয়া রয় নারীর ছেঁড়া কাঁথা!

মনে করি অগ্নি-সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই!
কইতে তো চাই, কইতে কথা বাধে,
প্রাণভয়ে যে পরাণ আমার কাঁদে!
মোদের তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে!
চৌদিকে আজ মানুষ স্যাং-স্যাতা!

['হাসির হররা' কাব্যগ্রন্থের (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) 'ব্যঙ্গ-সঙ্গীত' অংশের চারটি গান।]

কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯]

ভূত ভাগানোর গান

১

ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে
আজ নাচ্ বুড়ী নাচায় বাবা উঠ্‌তে বস্‌তে শুতে !
ও ভূত সেই দেখেছে মন্দিরে তোর
নাই দেবতা নাচছে ইতর
আর মন্ত্র শুধু তন্ত্র-বিকার অমনি ভূতের পুতে
তোর ভগবানকে ভূত বানালো ঘানি-চক্রে জুতে ।

২

ও ভূত সেই জেনেছে তোদের ওঝা,
আজ নকলের বইছে বোঝা,
ওরে অমনি সোজা তাদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে
আজ ভূত ভাগানোর মজা দেখায় বোম্-ভোলা বদ্যিতে ।

৩

ও ভূত সর্ষে-পড়া অনেক ধুনো
মেখে শুনে হল ঝুনো,
তাই ভূতের-ধুনো করছে ওই সই মরিস্ ফুঁকে ।
ও ভূত নাচছে যে তোদের নাকের ডগায় পারিস্ নে তুই ছুঁতে ।

৪

আগে বেকোনিক তোদের ওঝা,
তেরা গোঁজা মিলের মন্ত্রজো
শিখলি শুধু চক্ষু বোজা,
কানায় বোঝা কুঁজোর যাচ্ছে ছুঁতে,
তাই আপনাকে তুই হেলা করে ডাকিস্ স্বর্গ-দূতে ।

ওরে জীবন-হারা ভূতে-পাওয়া !
ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া—
সে কি সোজা ? ভূত কি ভাগে ফুঁক-মন্তর ফুঁতে ?
তোর ফাঁকির কিছু এড়িয়ে মরবি কূলহারা কিছুতে।

৬

ওরে ভূত তো ভূত, ঐ মারের চোটে
ভূতের বাবাও উধাও ছোটে,
ভূতের বাপ, ঐ ভয়টাকে মার ভূত যাবে তোর ছুটে,
তখন ভূতে-পাওয়া এই দেশই তোর ভরবে দেবতা-দূতে।

['বিষের বাঁশী'—২য় মুদ্রণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ : প্রথম প্রকাশ ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।]

সুপার (জেলের) বন্দনা

[গান]

[১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হলে তিনি পুলিশের কোপ-কটাক্ষে পড়েন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী হয়। কবি কুমিল্লায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। কিন্তু গ্রেপ্তার এড়াতে পারেন না। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী রাজদ্রোহের অপরাধে কবির এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি সেদিন যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। বাঙালী কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে নজরুলই প্রথম সাহিত্যিক রাজবন্দী—সাহিত্যসৃষ্টির অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন। কবিকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে হুগলী জেলে এনে রাখা হয়। সেখানে আরো কয়েকজন রাজবন্দী ছিলেন। তখন বন্দীদের কোনো শ্রেণী বিভাগ না থাকায় সকলকেই সাধারণ কয়েদী রূপে রাখা হয়েছিল। রাজনৈতিক কর্মীরা 'স্পেশাল ক্লাস'-এর সুযোগ কমই পেতেন। কয়েদীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চলতো এবং খাদ্য হিসাবে দেওয়া হত খুদ-কুঁড়ো সিদ্ধ দুর্গন্ধময় 'লাপসী'। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রে নজরুল অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তখন তাঁর হাতে-পায়ে কড়া ও বেড়ি পরিয়ে তাঁকে একটি আলাদা সেলে রাখা হয়। এতেও ইংরেজ সরকার

কবির তেজ ও উৎসাহকে দমন করতে পারে নি। তিনি সুখে-দুখে নানা রকম ব্যঙ্গসংগীত রচনা ক'রে সুর দিয়ে গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের "তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে" গানের এই প্যারোডিটি এই ভাবেই হুগলী জেলের মধ্যে রচিত হয়। পরে ছাপার সময় গানটির সঙ্গে এই ফুট-নোটটি কবি যুক্ত করে দিয়েছিলেন: "হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল প্রকার জুলুম আমাদের ওপর দিয়ে পরখ ক'রে দেখা হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্তিমান 'জুলুম' বড়কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে আমরা অভিনন্দন করতাম।"]

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারি ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে॥
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার-কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল-প্রণয়-ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে॥
আ-কাঁড়া চালের অন্ন লবণ
করেছ আমার রসনা-লোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লাপসী-শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে॥
ধর ধর খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা স-গুষ্টি
ওল-ছোলা দেহ ধবল-কুষ্ঠি[১]
তুমি ধন্য ধন্য হে॥

['ভাঙার গান'— ২য় মুদ্রণ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।
প্রথম প্রকাশ—১৩৩১ বঙ্গাব্দ; সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।]

টীকা—

১ 'ওল-ছোলা দেহ ধবল-কুষ্ঠি'—চাঁচা-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ রোগীর মতো সাদা-চামড়া—পুলিশ সুপার।

সাইমন্ কমিশনের রিপোর্ট

[গান]

[১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় বিধানের ৮৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল দশ বছরের মধ্যে ভারতের শাসনতন্ত্রে আরো কিছু পরিবর্তন সাধনের জন্যে একটি বিশেষ কমিশন তৈরী করা হবে। সেই অনুযায়ী ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্যর্ জন সাইমনের নেতৃত্বে বৃটিশ সরকার একটি কমিশন গঠন করেন। বিশেষ করে দুটি কারণে সে দিন এই কমিশন ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষিয়ে দিয়ে আমাদের নেতাদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। প্রথমত, এতে একজনও ভারতীয় সভ্য ছিলেন না এবং দ্বিতীয়ত, শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে ভারতবাসী এতদিনে স্বায়ত্ত-শাসন লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে কিনা সে বিষয়েও তদন্তের ভার ছিল এই কমিশনের ওপর। একমাস পরেই মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে এই কমিশন বর্জনের জন্যে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সাইমন্ কমিশন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ফেব্রুয়ারী ভারতে আসেন এবং মার্চ মাসের শেষেই ফিরে যান। কিন্তু কয়েক মাস পরেই আবার আসেন। ভারতের সর্বত্র এই কমিশনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। শুধু জনসাধারণ নয়, নেতাদের মধ্যেও অনেকে সে দিন পুলিশের লাঠির আঘাতে জখম হয়েছিলেন। লোকে তাই এর নাম দিয়েছিল 'লাঠি কমিশন'।]

[প্রথম ভাগ]

ভারতের যাহা দেখিলেন

কোরাস্ :—

কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে

রিপোর্ট লেখেন সাইমন্—

ছুটোপুটি ক'রে ছুটোছুটি করে

বুড়োবুড়ী, কাজে নাই মন !

'ম্যাদা' দল আর 'উদো' দল পায়ে

হস্ত বুলায় হর্দম,

পুচ্‌কে দলের ফচ্‌কে ছোঁড়ারা

ছিটাইছে বটে কর্দম !

ভারতের চেয়ে ভক্তই বেশী

আহাহা ভক্ত বেঁচে থাক !

আলোচাল খেয়ে, কাঁচকলা খেয়ে
নিশ্চয় মনে এঁটে বাঁধ ॥
আসিতে ভারতে সার্বিক লইয়া
আসিল ফকির খোকরা,
পিছন হইতে ঠোক্কর টাকে
চেপ্টো গোটা কম খোকরা।
ছেলে না দেখিনু, ছেলের চাইতে
পিলে বড়, অধিকন্তু—
বুড়ো যে 'ভু' দেখিনু জীবনে
প্রথম দু'পেয়ে জন্তু ॥
মাথা নাই হেথা, নাইক হৃদয়,
শুধু পেট আর পিঠ সার,
এই 'পিঠে' খেয়ে কেমনে হজম
করে, করে নাকো চিৎকার।
দু'টো হাত শুধু চিৎ করে রাখে
শূন্যের পানে তুলিয়া,
বিপদে শ্রীপদ ভরসা, তাহাও
শ্রীপদে গিয়াছে ফুলিয়া ॥
মাড়োয়ারী আর 'মালোয়ারী জ্বর'
এদের পরম মিত,
মনুষ্যত্বের একেবারে মেরে
রাখিতে দেশ পবিত্র।
ইহাদের ছবি বন্ধু মোদের
"গুড, গুড জেন্টলম্যান,"
কচুরি পানায় ডোবা ও খানায়
এঁর কৃপা করে ডান্ ডান্ ॥
এ দেশের নারী বেজায় আনাড়ী,
পুরুষের হাতে তবলা,
তবলাতে চাঁটি মারিলে সে কাঁদে—
ইহারা কাঁদে না, অবলা!
শাড়ী-শাড়ী-মোড়া চকলেট ওরা
বন্দী হেরেম-বাগে

বাহির করিলে খেয়ে নেবে কেউ,
কাজেই বাক্সে থাক সে ॥

ইস্কুলে, প্রেমে, জ্বরে প'ড়ে প'ড়ে
জীবন কাটায় ছেলেরা ;
মাঝে মাঝে করে প্রাণ্ড-শিষ্ট
শান্ত সেদিন ছেলেরা।
চোখের চাইতে চশমাই বেশী,
ভাগ্যিস্ ওরা অন্ধ,
নৈলে কখন টানিয়া ধরিত
আমাদের গলা বন্ধ ॥

আমাদের দেখাদেখি কেহ কেহ
করিছে ক্লাবের মেম্-বার,
স্কার্ট পরে চাষারা, বাবুরা
বিবি লয়ে যায় চেম্বার !
বিলিতি দাওয়াই ধরিতেছে ক্রমে,
আর বাকী নাই বেশী দিন,
গুড্‌বয় হয়ে গিলিছে আফিম,
হুইস্কি ব্রাণ্ডি কুইনিন ॥

কাফ্রি চেহারা, ইংরাজি দাঁত,
তাই বাঁধে পিছে কাছাতে ;
ভীষণ বন্ধু চাষ করে ওরা
অস্ত্র-আইন বাঁচাতে !
চাচা-ভাইপোতে মিল নাই সেথা
আড়াআড়ি ঠিক দাঁড়িতে,
যুদ্ধ বাধাই উহাদেরই দিয়ে,
ধরিয়া আনাই ফাঁড়িতে ॥

উহাদের মতো কেলে রং সব
গাছপালা জল আকাশের,
উহাদের গাই মোদের গাই-এর
মতো সাদা দুধ দেয় ফের।

কালো চামড়ার ভিতরে ওদের
আমাদেরই মতো রক্ত,
এ যদি না হ'ত— শাসন হ'ত
ও-দেশে মোদের শক্ত!

(দ্বিতীয় ভাগ)

ভারতকে যাহা দেখাইলেন

কোরাস্ :—

"যীশুখ্রীষ্টের নাই সে ইচ্ছা,
কি করিব বল্ আমরা।
চাওয়ার অধিক দিয়া ফেলিয়াছি
ভারতে বিলিতি আমড়া॥

চামড়া ওদের আমাদের মতো
কিছুতেই নহে হইবার,
হোয়াইট্-ওয়াশ যা করিয়াছি—তাই
দেখিতেছি নহে রইবার।

আমাদের মতো যারা নয় তারা
অধীন র'বে, কি ক'রে বল্
সাদাদের মতো কালা অসভ্য
হইবে স্বাধীন ? হরিবল্!

আঁঠি ও চামড়া বিলিতি আমড়া
মণ্টেগু দিল চুষিতে,
শাঁস নাই ব'লে কাঁদিল, দিলাম
বিলিতি কুমড়ো চুষিতে।

তাহাতেও যারা খুশী নয়, এত
কুষি খেয়ে ভরে নাকো পেট,
ঘুষি বরাদ্দ তাহাদের তরে,
ঘুঁটি ধরে কর মাথা হেঁট॥

পুলিশের লাঠি আরো বড়ো হোক,
আরো যেন তাতে থাকে গিঁট,
হস্তেরে ফেল অস্ত্র-আইনে,
ঘর হ'তে তোলা হোক ইঁট !
কাগজের শুধু হইয়াছে নোট,
কাগজের হোক ধুতিও,
মাথা কেটে দাও, কেটে দাও হাত
থাকে নাকো যেন টুঁটিও ॥
যতটুকু দাঁড় ছাড়িয়াছ, তাহা
গুটাইয়া লও পুনরায়,
একবার যদি বেড়া ভাঙে, তবে
আরবার ধরা হবে দায় !
আরো প্রশস্ত ক'রে দাও পিঠ
ধুমসু-পেটা করিয়া,
টিকি ও দাড়ির চাষ কর, লহ
নখর দন্ত হরিয়া ॥
ওদেশের জলে ম্যালেরিয়া-বিষ,
উহারা বিলিতি জল খাক্ ।
গুলি খেতে দাও তাদেরে, ওদের
চাঁচায় যে একদল কাক ॥
পা কেটে ওদের ঠেকো করে দাও,
উহাদের সাথে ছুটিতে
হার মেনে যায় এরোপ্লেন, পায়ে
গুলি পারে নাকো ফুটিতে !
সিরীঞ্জ্ লইয়া আরো ফাঁপাইয়া
দাও প্লীহা আর যকৃৎ ।
ঢাক কিনে দাও হিঁদুরে, মসল-
মানে বল, কর বক্রিদ !
ভাতে নাই কিছু ভিটামিন্, ওতে
মন্দ হোক, ওরা খাক্ ফ্যান,
এ স্বাস্থ্যে ভাত বড় ক্ষতিকর
খুব জোর দুটো শাক দেন ।

অতিশয় বেশী কথা ক'রে ক'রে
বাড়াতেছে প্যালপিটেশন্,
গ্যাগ্ পরাইতে কর সদয়
ডাক্তারে ইন্‌জিক্‌শেন্ ।
মা ভগবতীর সার উহাদের
জেলে আরো দাও পুরিয়া,
যদি থাকে মেরুদণ্ড কারুর
দাও তা ভাঙিয়া চুরিয়া ॥
বোমা মেরে মেরে পায় নাকো খুঁজে
আজও ওদের 'ক' অক্ষর,
এ মেষ কেমনে সভা ষাঁড়ের
সহিত হানিবে টক্কর ?
পায়ে ও গলায় ছাড়া ইহাদের
কোনো সে অঙ্গে বল নাই,
বারাম মাফিক ওষুধ দিলাম
দিলাম কিন্তু ফল নাই ॥"

('চন্দ্রবিন্দু' ২য় মুদ্রণ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। প্রথম প্রকাশের পর সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।)

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্

[গান]

(সাইমন কমিশন্ বর্জন করার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দিল্লীতে এক সর্বদল সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটিকেই নতুন শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হয়। স্বর্গীয় সার্ তেজবাহাদুর সপ্রু, সৈয়দ কোরেশি প্রভৃতির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুও এই কমিটির সদস্য ছিলেন। পরে এই কমিটিকে 'নেহরু কমিটি' এবং এর রিপোর্টকে 'নেহরু রিপোর্ট' বলা হত। এই বছরেই আগষ্ট মাসে লক্ষ্ণৌএ আবার সর্বদল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'নেহরু কমিটি' ইংরেজ রাজমুকুটের প্রতি আনুগত্যকে স্বীকার করে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্'-এর অনুরূপ নতুন

শাসনতন্ত্র রচনা করে দেন। সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু প্রভৃতি কয়েকজন এই শাসনতন্ত্রের প্রতি সমর্থন জানাতে পারেন নি। তাঁরা ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলকাতায়, এবং গান্ধীজীর চেষ্টায় নেহ্‌রু কমিটির রিপোর্টই গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতের এই ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্-কে স্বীকার না করেন তাহলে কংগ্রেস আবার নতুন করে আন্দোলন শুরু করবে। ১৯২৯-এর ২৬ অক্টোবর বড়লাট লর্ড আরউইন বিলেত থেকে ঘুরে এসেই বলেছিলেন ভারতের ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্ এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্যে লণ্ডনে একটা সম্মেলন আহ্বান করা হবে। বড়লাটের বক্তৃতা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মতিলাল নেহ্‌রু, গান্ধীজী, মহম্মদ আলী জিন্না, মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি নেতারা আনন্দিত হয়ে একটি বিবৃতি দেন। অবশ্য কয়েকজন নেতা সেদিনও বলেছিলেন—ভারতবাসী ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্-এর জন্যে সংগ্রাম করছে না, করছে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে। তাঁরা মনে করতেন ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্ পেলেও ভারতবাসীর কোনো মঙ্গল হবে না। প্রসঙ্গত স্মরণীয় পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক সুভাষচন্দ্র এই সময় কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। কিছু দিন পরেই তদানীন্তন ভারতসচিব ওয়েজউড বেনের কথায় ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছার স্বরূপটি আমাদের নেতাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, এবং ১৯২৯-এর বিখ্যাত লাহোর অধিবেশনে 'নেহ্‌রু রিপোর্ট' অর্থাৎ ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস-এর প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যেই নবোদ্যমে সংগ্রাম শুরু করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ঠিক হয় প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস (এখনকার প্রজাতন্ত্র দিবস) পালন করা হবে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল চিরকালই ছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক। কবিতাটি নেতাদের মোহভঙ্গের আগেই লেখা, অর্থাৎ সেই সময়, যখন তাঁরা ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্ পাবার আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন।।

কোরাস্ :—

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা
ব'সে কেন অম্নি রে।
ঢেঁড়া তোলে লাগাও চাঁটি
মা হবেন আজ ডোম্নী রে।
রাজা শুধু রাজাই রবেন।
গঙ্গার পারে নির্বাসন,
রাজ্য নেবে দুভাই মিলে
দুর্যোধন আর দুশ্শাসন!

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র র'বে
সিংহাসনে মাত্র নাম !
তোহফা যাবে, রইবে শুধু
বৌটক্কা খানিক গাত্র ঘাম ॥

অনেক-কিছু সয়ে গেছে
গন্ডটা আর সইবে না ?
কি ক'স ? গলা-কন্ঠা ? এও
দু দিন বাদে রইবে না !
কলসি-কানার প্রহার খেয়েও
প্রভু কেয়সা প্রেম বিলায় ।
গৌর ব'লে "প্রেমসে" নাচে
জগাই মাধাই দেখবি আয় ॥

রইত ত কেউ রাজা হেথায়,
না হয় সেথাই রইল কেউ,
আচ্ছা ফাসাদ যাহোক ! তবু
বাঘের পিছে লাগাবি ফেউ ?
ঠুঁটো হলেও হাত পেলি ত !
ছিলি যে একদম বে-হাত !
একেবারেই ঠ্যাং ছিল না,
পেলি ত এক ঠ্যাং নেহাৎ !
ঢেঁকের চাল কাঁড়াই হোক—আর
ধাকাড়া, তাই খোলায় ভর ।
ওই চিবিয়ে জল খেয়ে থাক !
ফেনও পাবি অতঃপর ॥

ধৈর্য ধরে থাকে বেড়াল
তাই ত শেষে পায় কাঁটা,
পাত হতে সে মাছ তুলে নেয় ?
অমনি সে যে খায় ঝাঁটা ॥
অবশ্য একার নয় ত কানুন—
বিশ্ব-আতঙ্ক, পাঁঠিস্থান ।

পারতপক্ষে মারতে কসুর
করেনি কেউ ক্রুপ পাঠান !
চিরটাকাল বনের মোল্লা
লোমশ-মুনিই ছিলাম দেখ,
আহার ছিল শাক পাতা আর
ভাবের গাঁজা ছিলিম টেক !

আজ তবু কেক্ বিস্কুট খাস্,
হয়েও গেলি প্রায় বাঙ্গাই !
গান বাজাই আর কানাডা আর
অষ্ট্রেলিয়ার ভায়রা ভাই !
ধুচ্‌নি মাথায় হাতে ধামা
দেখে মোদের রসিক রাজ—
ডোমের জাতি ভেবে দিলেন
ডোম্‌নী ক'রে মাতায় আজ ॥
বন্দিনী মা ছিলেন আহা,
আজ দিয়েছে মুক্তি রে !
বাজাও ধামা মামার নামে,
রক্ত ঢালো বুক চিরে !
এবার থেকে ধামাধারী বল—দ দল,
ভাব্‌না কি ?
দিব্য খাবে ডুবিয়ে নুলো
পাত্তনা নাদায় জাব মাখি' !
হাতীর পিছে নেংচে চলে
ব্যাং-ছা এবং খল্‌সে রে !
দোহাই দাদা চাল্‌স্ নে আর,
চোখ যে গেল ঝল্‌সে রে !
"মাভৈঃ ! এবার স্বাধীন হনু !"
যেই বলেছি, পৃষ্ঠে ঠাস্ !
পড়্‌ল মনে পীঠস্থান এ,
ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্ !

['চন্দ্রবিন্দু'—২য় মুদ্রণ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। প্রথম প্রকাশ— ? সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।]

তৌবা

[গান]

দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের,
রাজা আংরেজ হারাম-খোর
ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশী,
হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর।
আর মেয়েরা ওদের মদ্দের সাথে
রাজপথে করে গলাগলি,
আরে শুধু তাই নয়, নাচে গলা ধ'রে
ব্যাণ্ড বাজায়ে দলাদলী ॥
কোরাস্ ঃ—আরে তোবা! আরে তোবা!!

আরে যাবে কোথা মিঞা? চৌদিকে ঘিরে
টিকি বেঁধে শিরে কাফের হায়,
খাই আমরা হারাম সুদ? আরে যাও
ওরা যে তেমনি কাঁকড়া খায়!
দ্যাখো ষাঁড়-পোড়া খেলে হাড় মোটা হয়,
সোজা কথাটা কি বুঝিলে ভাই!
আর খাসি নাহি ক'রে বোকা পাঁঠা ধরে
কেটে খায়, করে নাকো জবাই ॥
কোরাস্ ঃ—আরে তোবা! আরে তোবা!!

দ্যাখো মেয়েরা ওদের বোরখা না দিয়ে
রেল ও জাহাজে চড়িয়া যায়,
মোদের বোরখা দেখিলে ছেলেরা ওদের
জুজু বুড়ী বলে ভিরমি খায়।
আরে ইজ্জৎ শুধু নাকে ও মোদের
হক্কায় নয় মরে শতক,
ওরে উহাদের মতো বেভুলে বিবিরা
যদি কেউ দেখে হয় "আশক"!
কোরাস্ ঃ—আরে তোবা! আরে তোবা!!

আরে আমাদের মতো দাড়ি কৈ ওদের ?
লাগিলে যুদ্ধ নাড়বে কি ?
আর উহাদের মতো কাছা কোঁচা নাই,
ধরিলে মোদের ফাড়বে কি ?
ছার অস্ত্র লইয়া কি হবে, আমরা
বস্ত্র যা পরি জান খানিক
তাতে তোবা তোবা করি যদি, যাবে
কামানের গোলা আটকে ঠিক ॥
কোরাস্ :—সোব্‌হান আল্লা ! সোব্‌হান আল্লা !!

দ্যাখো তুর্কিরা বটে ছাঁটিয়া ফেলেছে
তুর্কি নূর ও মাথার ফেজ,
আর "দীন-ই-ইস্‌লাম" ছেড়ে দিয়ে শুধু
তলোয়ারে তারা দিতেছে তেজ !
আরে বাপ দাদা ক'রে গিয়েছে লড়াই,
আমরা খামকা কেন লড়ি !
দেহে ইস্‌লামী জোশ আনাগোনা করে
"ভুহি জানামা" যবে পড়ি ॥
কোরাস্ :—সোব্‌হান আল্লা ! সোব্‌হান আল্লা !!

মোরা মসজিদে বসি' নামাজ পড়ি যে,
রক্ষা কি আছে বিধর্মীর ?
ওরা "কাফুরের মতো যাইবে ফুরায়ে"
অভিশাপ যদি হানেন পীর !
দ্যাখো পায়জামা চেপে রেখেছি আজিও
আমাদের এই পায়ের জোর,
আরে খোদাই যদি পেছে হয় দিব
মক্কার পানে সরল দৌড় ॥
কোরাস্ :—মাশা আল্লা ! ইনশা আল্লা !!

জানো দুনিয়ায় মোরা যত পাব দুখ,
বেহেশ্‌তে পাব ততই সুখ,
আর মেরে যদি হাত-চুলকানি মেটে
দে বাবা, তোদেরি আশা মিটুক !

সবে   পশ্চাৎ দিয়ে কাবির জবাই,
আসুন "মেহেদী", থাম্ দুদিন !
বাবা.   মুষল লইয়া কুষল পুছিতে
আসিছে কাবুলী মুসলেমীন ॥
কোরাস্ ঃ আল্লাহু আকবর ! আল্লাহু আকবর !!

('চন্দ্রবিন্দু'—২য় মুদ্রণ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ ;
প্রথম প্রকাশ—? সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ।)

প্যাক্ট্

[গান]

কোরাস ঃ—

বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আসনাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥

আঁটসাঁট ক'রে গাঁটছড়া বাঁধা হল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো ? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে !
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্কা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে ॥

বুকে বুকে মিল হল নাকো, মিল হল পিঠে পিঠে ? তাই সই !
মিঞা কন, 'কোথা দাদা মোর ?' আর বাবু কন, 'মিঞা ভাই কই ?'
বাবু দেন মেখে দাড়িতে 'খেজাব', মিঞা চৈতনে তেল,
চার চোখে করে আড়-চোখাচোখি, কি মধু মিলন হইল !
বাবু কন, 'ভাই তোমারে ছুঁইতেও নিষিদ্ধ কুঁকড়ো !'
মিঞা কন, 'মিল আরো জমে দাদা, যদি দাও দুটো টুকরো ।
মোদের মুর্গী হল রামপাখী, দাদা, তাও হল শুদ্ধি ?
বাদশাহী গেছে, মসীও গেল, আর কার জোরে যুদ্ধি ।'

বাবু কন 'পরি শুদ্ধি বি-কচ্ছ তোমাদের শিশু ছুন্নতে ।'
মিঞা কন, 'খেয়ে রাখি চৈতনী খাওয়া সেই সে খুশীতে !
আমাদের কত মিঞা ভাই করে বাস তব বারাণসীতে,
(আর) বাত হলে ভাই ভাত খাই নাকো আজো তাই একাদশীতে ।'

বাবু কন, 'হায়! চটিকা ছাড়িয়া সোলিমী নাগ্‌রা ধরেছি।'
মিঞা কন, 'গরু জবাই-এর পাপ হতে তাই দাদা তরেছি।'
বাবু কন, 'এত ছাড়িলেই যদি, ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা!'
মিঞা কন, 'দাদা মুর্গী তো নাই, কি দিয়া খাইব পরটা!'

বাবু কন, 'গরু কোরবানী করা ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,
(তোরে) সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে মার মন্দিরে নিয়া যাই।'
মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞার ঘরে নাহি লও হরিনাম,
বলদের সাথে ছাড়িব তোমারে যাহা হয় হবে পরিণাম!'

'আয়া-রারা-রায়া' সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা,
শম্ভু ছুটিল বস্ত্র তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল ছর্‌রা।
লাগিল হেঁচকা হেঁইয়ো হাঁইয়ো টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি নব প্যাক্টের পুণ্যে!

বদ্‌না গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি রোল উঠিল 'হা হন্ত।'
উর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল হাসে ছিরকুটি' দন্ত!
মস্‌জিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু!
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা—করুণ চন্দ্রবিন্দু।

['চন্দ্রবিন্দু'—২য় মুদ্রণ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।
প্রথম প্রকাশ—? সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।]

শ্রীচরণ ভরসা

[গান]

সোহিনী — একতালা

কোরাস্‌ঃ—

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

গর্বের শির খর্ব মোদের ১ চরণ তেমনি লম্বা!
শৈশব হ'তে আমরণ চলি সবারে দেখায়ে রম্ভা!

সার্জেন্ট যবে আর্জেন্ট-মার হাতে ক'রে আসে তাড়াতে,
না হয়ে মুগ্ধ পদ-প্রবুদ্ধ সম্মুখে দিই বাড়ায়ে॥

কোরাস :—

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা!
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

বাপ্ কোলা ব্যাং, রবারের ঠ্যাং প্রয়োজন মতো বাড়ে গো,
সম্মানে ঠ্যাঙাড়ে বনে ও বাদাড়ে পগারে পুকুর-পাড়ে গো!
লম্ফিতে চকিতে লঙ্ঘিয়া যায় গিরি নদী বন সিন্ধু,
এই এক পথে মিলিয়াছি মোরা, সব মুসলিম হিন্দু॥

কোরাস :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

কাঁদিতেছে নাকি বিশ্ব, আমরা রণে পশ্চাতে হেঁটে যাই?
পশ্চাৎ দিকে ছুটে কেউ? — হেসে মরিব কি দম ফেটে ভাই!
ছুটি যবে মোরা সুমুখেই ছুটি, পশ্চাতে পানে হেরি না!
সামনে জোটেরে পিছু হটো বলো — বাঁচি যাও আর দেরী না॥

কোরাস :—

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা।

আমাদের পিছে ছুটেছে ছুটিতে মৃত্যু পড়িবে হাঁপায়ে,
কিন্তু বারবার যে পড়িবে যমের, জীবন তখন বাঁ পায়ে!
মোরা দেব-জাতি ছিনু যে একদা, আজো তার স্মৃতি চরণে,
ছুটি না তো যেন উড়ে চলি নভে, থাকে না ক স্মৃতি শরণে॥

কোরাস :

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

বাপ-পিতামোর প্রদর্শিত এ পথ মহাজন-দিষ্ট,
গোস্বামী মতে শরাহেও বাবা এ পথে মিলিবে ইষ্ট,
মরে যদি যাও তাহলে তো তুমি একদম গেলে মরিয়াই।
চরণের জোরে মরণ এড়াও, বাঁচিবে চরণ ধরিয়াই।

কোরাস্ ঃ—

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

['চন্দ্রবিন্দু'— ২য় মুদ্রণ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ। প্রথম প্রকাশ—১ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।]

'দে গরুর গা ধুইয়ে'

[গান]

কোরাস্ ঃ- দে গরুর গা ধুইয়ে।

উল্টে গেল বিধির বিধি আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করে, মদ্দ করেন চড়ুই-ভাতি।
পলান পিতা টিকেট ক'রে—
খুকী তাঁহার পিকেট্ করে!
গিন্নি কাটেন চরকা, কাটেন কর্তা সময় গাই ধুইয়ে।

কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে!

চর্মকার আর মেথর-চাঁড়াল ধর্মঘটের কর্মগুরু!
পুলিশ শুধু করছে পরখ, কার কতটা চর্ম পুরু।
চাটুয্যেরা রাখছে দাড়ি,
মিঞারা যান নাপিত-বাড়ি!
বোট্‌কা-গন্ধ ভোজপুরী কয় বাঙালিকে— 'মৎ ছুঁইয়ো'।

কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে।

মাজায় বেঁধে পৈতে বামুন রান্না করে কার না বাড়ী,
গা ছুঁলে তার লোম ফেলে না, ঘর ছুঁলে তার ফেলে হাঁড়ি।
মেয়েরা যান মিটিং হেদোর,
পুরুষ বলে, 'বাপ্‌রে দে দোর।'
ছেলেরা খায় লপ্‌সি-বুড়ো, বুড়োর পড়ে ধান চুইয়ে!!

কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে!

ভয়ে মিঞা ছাড়্‌ল টুপি, আঁট্‌ল কষে গোপাল-কাছা
হিন্দু সাজে গান্ধী-ক্যাপে, লুঙ্গি পরে ফুঙ্গী চাচা ।
দেখ্‌লে পুলিশ গুঁতোয় ষাঁড়ে !
পুলিশ লুকায় বাঁশের ঝাড়ে !
খাঁদা বাদুড় রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর কান খুইয়ে !

কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে !

খঞ্জ নেতা গঞ্জনা দেয়, 'চল্‌তে নারে দেশ যে সাথে ।'
টেকো বলে, 'টাক ভালো হয় আমার তেলে, লাগাও মাথে !'
'কি গানই গায়,' বলছে কালা,
কানা কয়, 'কি নাচছে বালা,'
কুঁজো বলে, 'সোজা হ'য়ে শুতে যে সাধ, দে শুইয়ে !'

কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে !

সস্তা দরে দস্তামোড়া আসছে স্বরাজ বস্তা-পচা,
কেউ বলে না 'এই যে দোহি' আসলে 'ফুক দোহি'র খোঁচা ।
গুণীরা খায় বেগুন-পোড়া
বেগুন চড়ে গাড়ী ঘোড়া,
ল্যাংড়া হাসে তেংড়ো দেখে ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং খুইয়ে ।

কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে !

('চন্দ্রবিন্দু' — ২য় মুদ্রণ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ । প্রথম প্রকাশ— ? সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)

বাঙালী বাবু

[গান]

নখ-দন্ত-বিহীন চাকুরী অধীন আমরা বাঙালী বাবু
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া,
(বুকে) কাশি লয়ে সদা কাবু ॥

চিলেঢালা কাছা কোঁচা সামলায়ে
ভুঁড়ি বয়ে ছুটি নির্টাপটে পায়ে,
আপিসে আসিয়া কলম পিশিয়া
ঘরে এসে খাই সাবু ॥

রবিবার ছুটি আছে ব'লে ভাই
বাবা ব'লে চিনে ছেলে পিলে তাই,
নাকে শাঁক বেঁধে সেদিন ঘুমাই,
(নয়) ঘরে বসে খেলি গ্রাবু ॥

হাঁচি টিকটিকি সিদ্ধি মানিয়া
পরাণ-পাখীরে রেখেছি ধরিয়া,
(দেখে) ব্যাঙের ছাতারে উঠি চমকিয়া
ভয় হয় বুঝি তাঁবু ॥

এগজামিনের লাঠি ধরে ধরে
দাঁড়াই আসিয়া আপিসের দোরে,
মাইনে যা পাই তাই দিয়ে খাই
কলমী আর অলাবু ॥

গোলামের কুঁড়ি ঝোঁটায় এ বোঝা
নামায়ে কোমরে হ'তে দাও সোজা
বাতে আর হাড়-হাবাতে ধরেছে—
বাপ্‌পুরে কনে যাবু ॥

('গীতি শতদল'—২য় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।)

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)—[জন্ম—১৮৯৯]

ভাবী মন্ত্রীর অবশ্যম্ভাবী বক্তৃতা

১

তোমাদের ভালোবাসি ভাই
বারংবার বলেছিনু তাই
যেন বেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিও না গোল্লা অভিমুখে।
ক্ষণেক দাঁড়াও দেখি রুখে
হে ভ্রান্ত স্বদেশবাসি, বারেক শ্রবণ করো হিত কথাগুলি।
চাল্লিশ কোটি বৃদ্ধাঙ্গুলি
আন্দোলিয়া
সেই গোল্লা অভিমুখে পুনর্বার চলিলে ছুটিয়া।

২

তোমাদের ভালোবাসি ভাই
নব রসে মাতি তাই
স্মরিয়া শ্রীহরি
ভাসালাম তরী
নব-পরিকল্পনার স্রোতে,
গান্ধিজীরে নমি দূর হতে!
এ কৃষি-প্রধান দেশে হয়তো বা হবে উপকার
ইহা ছাড়া গতি কিবা আর।
অতীত পতিত হতমান
গোল্লা-অভিমুখী বর্তমান।
এই সব আঁচে
ভিয়ান ওতরায় যদি, ভবিষ্যৎ বাঁচে।
একমাত্র আশা ভবিষ্যৎ
সুতরাং নাহি অন্য পথ।

৩

তোমাদের ভালোবাসি ভাই।
সেরেফ কর্তব্য-বোধে ইচ্ছা করে তাই
শুধু চাবকাই,
থামে বেঁধে
মুখে ছাতু গেদে
চোখে লঙ্কা গুঁজে
রক্তে পুঁজে
করাইয়া স্নান ;
করি খান খান
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকের,
কুড়াইয়া সেগুলিরে ফের
তাল করে খুঁড়ি,
হস্ত পদ বক্ষ ভুঁড়ি মুড়ি
করি কুঁচি কুঁচি,
উচ্চ নীচ অব্রাহ্মণ-মুচি
সনাতন, আধুনিক
শ্রমিক, ধনিক,
চাকুরে, বণিক,
নাহি করি ভেদাভেদ নাহি রাখি সীমা
বিলকুল করে ফেলি কিমা।
বিরাট ভারতবক্ষ তারপর করিয়া কর্ষণ
সেই কিমা চতুর্দিকে করে দি বর্ষণ।
সাফ হয়ে যাবে আবর্জনা
চুকিবে যন্ত্রণা,
তাহা ছাড়া হবে সার
চমৎকার।
হবে ভুট্টা হবে ছোলা যব গম ধান
সুখে রবে তদবধি ভারত-সন্তান।

('বনফুলের ব্যঙ্গকবিতা'—গ্রন্থে সংকলিত, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।)

পরিশিষ্ট

[সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেনের তিনটি বিখ্যাত গানের প্যারডি। গীতিকারের নাম অজ্ঞাত।]

এক

প্রসাদী সুর — তাল বেতালা

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমার ঐ লোভেতেই লাগাড়িদার ॥
চাপরাস চাকরী সবাই লুটে, ওতো আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা সে তো অনেক ধনের অধিকারী ॥
তেলা মাথায় তেল কেন আর আমি যে নিত্য অভাবে মরি।
আমার নাইকো বাড়ী নাইকো গাড়ী নাইকো কোনো জমিদারী ॥
বিনা পয়সায় আর কত কাল দেশের জন্য কাঁদতে পারি ॥
যদি দেশবন্ধুর দাবা হয় তবে বটে আমি তারি।
যদি ভবানন্দের দাদা হব তবে তো মা পেতে পারি ॥
কবি বলে এমন ধারার বালাই লয়ে আমি মরি।
কারণ ও ধারা ধরে কত মিঞার টাকার সিন্দুক হল ভারি ॥

(সাপ্তাহিক 'বঙ্গদর্পণ' ৯ কার্তিক ১৩০২ বঙ্গাব্দ)

দুই

প্রসাদী সুর — তাল সুরতাল

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখঢাকা বলদের মত ॥
চাকুরীর গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায় কলেজী-বিদ্যার অনুগত ॥
বি. এ. এম্ এ পাশ করিলাম লোকে ভাবে বিদ্যে কত।
কিন্তু সে বিদ্যা অবিদ্যা মাত্র করে কেবল বুদ্ধি হত ॥
যা বলি সব পরের কথা কপ্‌চাই কেবল তোতার মত।
একবার খুলে দে মা পাঠের ঠুলি দেখি পথ মনের মত ॥

শুধু বিয়ের বাজারে পাশের মূল্য অনেক যা কেবল পড়তো ।
কবি বলে কেটে দে মা পাশের মোহ আর খেতে নারি পরের জুতো ॥

[সাপ্তাহিক 'বঙ্গদর্শন'— ১৬ কার্তিক ১৩০২ বঙ্গাব্দ ।]

তিন

প্রসাদী সুর — তাল ঝাঁপতাল

মন রে ধামা ধরতে জানো না ।
এমন হাত দুখানা তৈল পড়ে ধরতে পারলে পেতে সোনা ॥
তেল মাখিয়ে বাগিয়ে ধর বাধাবিঘ্নের ভয় রবে না ।
কত হাড়-হাবাতে এই তেলের জোরে করে গেল বালাখানা ॥
বিদ্যাবুদ্ধি যতই থাকুক ধামার কাছে কেউ লাগে না ।
বড় হবার অমোঘ ঔষধ, হাতে হাতে ফল যায় গো জানা ॥
ধামা নির্গুণে সগুণ করে মুচি-মিস্ত্রী ভেদ রাখে না ।
তার প্রভাবে প্রতিভা যায় গড়াগড়ি, মর্কটে করে মুন্সিয়ানা ॥

[সাপ্তাহিক 'বঙ্গদর্শন' - ২০ কার্তিক, ১৩০২ বঙ্গাব্দ ।]